মুক্তবাসিনী-২

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব

2013 - 1434

IslamHouse.com

متبرجات متحررات (الجزء الثاني)

« باللغة البنغالية »

أبو بكر سراجي

مراجعة: علي حسن طيب

2013 - 1434

IslamHouse.com

মুক্তবাসিনী-২

ভূমিকা : পাঠকের আদালতে হাজিরা নিবেদন

কুরআনে নারীকে পুরুষের লেবাস বলা হয়েছে :

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

‘তারা তোমাদের লেবাস তোমরাও তাদের লেবাস।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৭}

মানুষ যেমনিভাবে লেবাসের মধ্যে আশ্রয় নেয় তেমনি নারীদের মধ্যে পুরুষেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আশ্রয় খোঁজে। তাকে আশ্রয় খুঁজতে হয়। বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা নারীর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যার কারণে পুরুষরা তাদেরকে আশ্রয়স্থল বানাতে বাধ্য হয়। কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছ-

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم: ٢١]

‘আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল কওমের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত : ২১}

অর্থাৎ তোমরা যেন তাদের কাছে আশ্রয় খুঁজে পাও, প্রশান্তি পাও।

নারীজাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্যতম হলো সংসার আগলে রাখা। কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করা ঘর্মাক্ত স্বামীর সান্ত্বনা ও আশ্রয়স্থল হওয়া। একজন নারীর জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পুরুষজাতির আশ্রয় ও সান্ত্বনাস্থল বলে অভিহিত করেছেন?

কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্মান মনঃপুত না হওয়ায় তারা সম্মান খুঁজে ফিরছে রাস্তা-ঘাটে, অফিস-আদালতে, মার্কেটে -বাজারে, পদ-পদবীতে, সংসদে-মন্ত্রীত্বে! ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। তারা নিজেরা আশ্রয় হারিয়েছে এবং আশ্রয়স্থল হওয়ার মর্যাদাও খুইয়ে বসেছে। কবির ভাষায়- হে পথিক! তুমি তো ভাবছ কা‘বায় যাচ্ছো, কিন্তু তুমি তো ধরেছো খোরাসানের পথ!

পর্দা ও সংযত জীবনাচার নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন আঙ্গিকে কিংবা নিজের মতো করে বুঝিয়ে যাচ্ছেন, সতর্ক করছেন। কেউ সতর্ক হচ্ছেন, কেউ হচ্ছেন না। কেউ সমাজের গড্ডালিকার বাঁধন ছিন্ন করতে পারছেন, আবার কেউ পারছেন না। আবার কেউ কেউ সমাজের দূরের কেউ নন, একান্তই আপনজন দ্বারাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। আমার ধারণা, সবচেয়ে বেশি হোঁচট ও চোট খান সম্ভবত এই শ্রেণীর লোকেরা। তারা হয়ত কল্পনাই করতে পারেন না যে, আপনজন হয়ে মানুষ কীভাবে তার চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়! তাই বিষাদগ্রস্ত হয়ে তারা মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েন। কিন্তু আমি তাদেরকে খুব বেশি করে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনিই সম্ভবত অন্যের তুলনায় সবচেয়ে

সাবলীল পথে আছেন! অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ, হতে পারেন। কেননা, আপনজন দ্বারাই দ্বীনের পথে বাধাগ্রস্থ হওয়াই যে আমাদের প্রিয় নবীর সুন্নাত! আপনি কেন সেই ইতিহাস পড়েন নি কিংবা পড়লেও স্মরণ করেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে এক হৃদয়স্পর্ষী ভাষণ পেশ করলেন, ভাষণে এ কথাও বললেন যে, হে মক্কাবাসী! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে উপঢৌকন নিয়ে এসেছি সম্ভবত পৃথিবীর কোনো মানুষ তার জাতি ও কওমের জন্য এর চেয়ে ভালো উপঢৌকন নিয়ে আসে নি।' তখন সর্বপ্রথম কে তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল জানেন? আপন চাচা আবু লাহাব! শুধু বিরুদ্ধাচারণই নয়, সে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় হুমকি দিয়ে বলেছিল-

فقال أبو لهب تبّاً لك سائر الأيام ألهذا؟

'তোমার ধ্বংস হোক, এজন্যই বুঝি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো?' [তাফসীরে তাবারী : ১৯/৪০৭]

মুফাসসিরীনে কিরাম আরো লিখেন-

ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه حجراً ليرمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

একথা বলার সাথে সাথে সে হাতে পাথর নিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য। [রূহুল মা'আনী : ১৫/৪৯৭]

এবার তুমিই বলো। দ্বীনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন চাচা যদি পাথর ছুঁড়তে পারে তবে তোমার আপনজন তোমার প্রতি কথার বাণটুকুও ছুঁড়তে পারে না, আর তুমি সেই নবীর উম্মত হয়ে এতটুকু বরদাশত করতে পারবে না?

আচ্ছা, বরদাশত না করে কোথায় যাবে? পাপের পথে? অন্যরা যে পথে চলে সেই পথে? দেখো, তুমি ভালো পথে চলতে গিয়ে বাধাগ্রস্থ হচ্ছো বলে বিষিয়ে উঠছো? কিন্তু মনে রেখো, ভালো পথে বাধা থাকলেও তাতে গৌরব ও আত্মমর্যাদা আছে। কিন্তু খারাপ পথ যে কণ্টকমুক্ত তা কে বলল? সে পথে যে নিন্দা, তিরস্কার আর ঘেন্নার পাহাড় রয়েছে! তুমি যে পথেই যাও না কেন, বাধা আসবেই। তাই ভালো পথেই চলো না! তুমি কি মনে করো, আজ যারা তোমার আপন হয়ে তোমার ভালো কাজ খারাপ চোখে দেখছে, তাদের মন রক্ষা করতে গিয়ে খারাপ কাজ করলে তারা তা ভালো চোখে দেখবে? মনে রেখো পথ কোনোটাই মসৃণ নয়। পর্দা আর রক্ষণশীলতার মরুময় কাঁটা বিছানো পথে চলতে গিয়ে পায়ে ফোসকা পড়ার আশঙ্কা থাকলেও পরে গোলাপ পাওয়ার আশা আছে। কিন্তু বেপর্দার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে গেলে সেখানে কী আছে? সেখানে আছে সলিল সমাধির আশঙ্কা। অতএব তুমিই তোমার পথ স্থির করে নাও।

মনে রেখো, যে ভালোবাসার ভিত্তি ঈমানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। এতো ভালোবাসার অভিনয়,

কৃত্রিম ভালোবাসা। এ ধরনের ভালোবাসার দাবিদাররা ভালোবাসাকে ঢাল বানিয়ে তোমার কাছে ঘেঁষবে আর বর্শা হয়ে তোমাকে বিদ্ধ করবে। মনে রেখো, নারীবাদীরা যে তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে তোমার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করছে তাদের এই ভালোবাসা ঈমানের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ নয়। তাই তারা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, জীবন দুশমন। অতএব, ওদের কথায় তুমি ধ্বংসের পথে নেমো না।

মুক্তবাসিনী-১'র পর 'মুক্তবাসিনী-২'র উপহার। আসলে উপহার বললে উপহাস করা হবে। যে বইয়ে হাজারও নারীর হৃদয়বিদারক আর মর্মান্তিক কাহিনী বিধৃত হয়েছে সে বইকে উপহার আখ্যায়িত না করে 'নিষ্ঠুর উপহাস আখ্যান' আখ্যায়িত করাই শ্রেয় নয় কি! কিন্তু তারপরেও আমি এটাকে উপহার নামেই আখ্যায়িত করলাম এই আশায় যে নারী জাতি তার আপন পথে ফিরে আসবে। নারী জাতি যদি এর মাধ্যমে তার আসল ঠিকানা খুঁজে পায় তবে এরচেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? এবং যার মাধ্যমে পাবে তার চেয়ে বড় উপহারই বা কী হতে পারে?

মুক্তবাসিনীর পাঠকরা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। অনেক জায়গা থেকে ফোন করে উৎসাহিত করেছেন। ভিন্নমাত্রার একটা কাজ ও পদক্ষেপ বলে সামনে চলার সাহস যুগিয়েছেন। বস্তুত পাঠকরা লেখকের প্রাণ। তাদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণাই লেখকদেরকে সামনে চলতে সাহায্য করে এবং পাঠকদের আগ্রহ, অনুপ্রেরণা না থাকলে লেখকসত্তার অপমৃত্যু ঘটে। পাঠকগণ

অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার সেই লেখকসত্তায় প্রাণসঞ্চার করেছেন। তাই আমি সবশ্রেণীর পাঠকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি মনে করি তাদের এই অনুপ্রেরণারই ফসল 'মুক্তবাসিনী-২' বইটি। অতএব, চেনা-অচেনা সব পাঠকের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

বইটিতে আমি তুলে ধরলাম বেপর্দার বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার কথা। আসলে আমি এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি যে, এই বইটি কি সত্যি সত্যি কারো উপকারে আসছে! হীতে বিপরীত হচ্ছে না তো! কথা দিলাম, পাঠকের কাছে যদি পর্দার বিড়ম্বনার চেয়ে বেপর্দার লাঞ্ছনা মর্মান্তিক না ঠেকে এবং আমার এই প্রচেষ্টা সুফল বয়ে আনছে না বলে প্রমাণিত হয় তবে এ ব্যাপারে আর কখনও কলম ধরব না। সকলের ইহকালীন ও পরকালীন কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুলক্রুটি ক্ষমা করুন। আমীন।

আরজগুজার

আবু বকর সিরাজী
abubakarsiraji@gmail.com
মোবাইল : ০১৭৩৬৬১৬৫৯০

বিষয়সূচি

হিজাবের ব্যাপারে শিক্ষকরা কেন খড়গহস্ত ....

ভাঙছে ঘর..

ধর্ষিত সভ্যতা, লাঞ্ছিত মানবতা ....

হন্তারকের অভিষেক...

ভুলটা আসলে কোথায়?...

সেই চঞ্চল মেয়েটি..

মানবতার রুদ্ধদুয়ার!...

মুক্তবাসের দেনা শোধ...

হৃদয় ভাঙার গল্প..

ভালোবাসা দিবসের পাপ..

বিবর্তনে বিপর্যয় ....

বদলে দেয়ার স্লোগানের অন্তরালে ....

শতবঞ্চনায় তপ্তপ্রাণ

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

'হে মানবমণ্ডলি! তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসমুখে নিক্ষেপ করো না।' {সূরা আল-বাকারা, ১৯৫}

বান্দার প্রতি আল্লাহর এ এক পরম করুণা মেশানো আদেশ। সুদ খেয়ো না, মদ পান করো না, ব্যভিচার করো না- এ জাতীয় আদেশ পালনে বান্দার মন সরতে চায় না। কিন্তু এটি সে ধরনের কোনো আদেশ নয়। নিজেকে বাঁচানোর আদেশ। কিন্তু এমন দরদমাখা আদেশও কি আমরা সহজভাবে মেনে নিতে পারছি? আমরা কি নানাভাবে নিজেদের মৃত্যুর ফাঁদ নিজেরাই রচনা করছি না? একটিমাত্র প্রাণকে পিষ্ট করতে তৈরি করছি না হাজারো ভ্রষ্টতা?

বিশেষ করে আমাদের নারী সমাজের কথাই ধরুন। সরলতা নারীর সুন্দরতম অলঙ্কার। কিন্তু এটাকে সংযত ও নিরাপদে রাখতে হবে। কেননা, এই সুন্দরতম অলঙ্কারের প্রতিই যে পুরুষের লোভের সুতীক্ষ্ম নজর! তারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে এই অলঙ্কারগাত্রে। একটা সরল-কোমল নারীকে সম্ভ্রমের দেউলিয়া বণিক বানিয়ে পথের ভিখারী করে তবেই ছাড়বে।

আমার কথার সত্যতা দেখুন নিম্নের ঘটনায় :

ঢাকার পার্কগুলোর সিমেন্টের তৈরি ছোট্ট ছোট্ট বেঞ্চগুলো হাজারও প্রেমকাব্যের রাজস্বাক্ষী। নগর পরিকল্পনাকারীগণ জনবহুল নগরীর

গাড়ি ও মানুষের উৎক্ষিপ্ত শ্বাসের লু হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য হয়ত প্রকৃতির কোলে এই বেঞ্চগুলো নির্মাণ করে থাকবেন। কিন্তু আজ যদি তারা এগুলোর আত্মার ডাক শুনতে চেষ্টা করতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাদের ভুল ভাঙত। কেননা, নিষ্প্রাণ, ভাষাহীন এসব বেঞ্চের ওপর যে সব প্রেমগল্প রচিত হচ্ছে তার অধিকাংশ উপসংহারই যে নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক! কাব্যের শেষ ছন্দগুলো হচ্ছে এলোমেলো, ধোঁয়াটে।

তাই হে নগরপিতাগণ! তোমরা এগুলো ভেঙে দাও। মনে রেখো, শুধু গড়াতেই আনন্দ নয়, কখনও ভাঙাতেও আনন্দ আছে। সুরম্য বিশতলা বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য যে পুরোনো জীর্ণ বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হয় সেই ভাঙার আনন্দ কিন্তু কোনো অংশেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আনন্দের চেয়ে কম নয়! অতএব, পাপের আখড়াগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে যদি এসব বেঞ্চ ভেঙে দেয়া হয় তাহলে তারা এতে মোটেই নারাজ হবে না। এমনিভাবে অনৈতিকতার পাঠশালা এসব পার্কগুলের সদর ও চোরা দরজা দুটোই বন্ধ করে দিতে হবে। অন্যথায় একের পর এক ঘটতে থাকবে হাজারও অপ্রীতিকর ঘটনা। এবার আসি মূল কথায় :

ডেইজি। এমনি এক পাঠশালার দুঃসহ সনদ পাওয়া শিক্ষার্থীনী। কোনো এক পার্কের একটা বেঞ্চের মাত্র তিন ঘণ্টার একটি প্রেমপাঠ্য তাকে আজ তাড়িয়ে বেড়ায় অহর্নিশ। রুলিন নামের এক ব্যক্তি মাত্র তিন ঘণ্টার সবকে তাকে পটিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে

নিয়ে গেছেন বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার তিমিরসম আঁধারে। তার অনুগত সেই শিক্ষার্থীনী আজ ঝড়ে বিধ্বস্ত নীড়হারা পাখির চেয়েও বেশি অসহায়।

রুলিন নাট্যব্যক্তিত্ব। বাক্যের চাণক্যে তারা দর্শকদের মুগ্ধ করেন। বাহবা কুড়ান। তাদের জন্য কাউকে পটানো বা হাত করা কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নয়। তাই কোনো একদিনের রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলে নাটকের সব অভিজ্ঞতা, অভিনয়ের পারঙ্গমতা ব্যয় করেছিলেন ডেইজিকে পটানোর কাজে। কোমল ডেইজির মন সেদিন মোমের চেয়েও বেশি গলে গিয়েছিল। রুলিনের সে দিনের সেই চাণক্যে ডেইজি ভুলেই গেলেন যে, বস্তুর পিঠ একটা নয়, আরেকটা আছে এবং সেই পিঠটা এমন সুন্দর নাও হতে পারে।

তাই হাজারও কোমলমতি নারীর মতোই তিনিও নীরবসাক্ষী বেঞ্চগুলোকে সাক্ষ্য বানিয়ে রুলিনকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে তিনি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। তার পরিবারের লোকেরা সাফ জানিয়ে দিলেন এই বিয়েতে তাদের মত নেই। কিন্তু ডেইজি রুলিনের চাতুর্য মেশানো বাক্যে পরম মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। তাই তার পক্ষে রুলিন ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা করাও সম্ভব হলো না। ফলে এক সময় পাথর গলতে লাগল। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর জেদকে পরিবারের লোকেরা শ্রদ্ধা না করলেও এড়িয়ে যেতে তো আর পারে না। পাছে আবার...

তাই ডেইজির জিদে ভবিষ্যতের ওপর বর্তমান জয়ী হলো এবং বাস্তবতার ওপর আবেগ প্রবল হলো। একদিন ঠিক ঠিক লালশাড়ি পরে ডেইজি পরিবারের অব্যক্ত স্বীকারোক্তি নিয়ে রুলিনের ঘর করতে রওয়ানা হলেন।

মুদ্রার অপর পিঠটা দেখতে সময় নিতে হলো না ডেইজির। যে বাসর রজনীর জন্য একজন নারীর সব আবেগ তোলা থাকে সেই বাসর রজনীতেই তিনি অদ্ভুত অপরিচিত ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। বিয়ের লালশাড়িটা এখনও খোলাই হয়নি, এরই মধ্যে তার মনটাও শাড়িটার মতো রক্তক্ষরণে লালবর্ণ হয়ে উঠল। রুলিন তাকে রাহুল সম্পর্কে বাড়াবাড়ি না করতে এবং ছেলেটিকে নিজ সন্তানের মতো করে দেখার আদেশ করলেন।

এমনি এক মধুররাত্রিতে কোনো নববধূ যদি এমন অবাঞ্ছিত আদেশ পান তাহলে তার মন ভাঙবে না তো সিমেন্টের ফ্লোরে পড়ে কাঁচের জগ ভাঙবে? কে এই রাহুল? কী তার পরিচয়? স্বামী কি তাহলে তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর গর্ভের সাথে প্রতারণা করেছেন? এমন অনেকগুলো প্রশ্ন ও অজানা আশঙ্কা ডেইজির বাসর রাতের সুখ পাখিটার ডানা দুটি গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পরেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন ডেইজি। স্বামী রুলিন বেশকিছু দিন হলো চট্টগ্রামে আছেন। বর্তমানে এটাই তার কর্মক্ষেত্র। তাই তিনি স্ত্রীকে নিজের কাছে চিটাগাং নিয়ে যেতে চাইলেন। মা ও শাশুড়ির মৃদু আপত্তি মিইয়ে গেল রুলিন-ডেইজির দাম্পত্য অধিকারের প্রবল ঝাপটায়।

ডেইজিকে যে ঘরে তুললেন রুলিন সেই ঘরে একজন অপরিচিত মহিলা তাকে অভ্যার্থনা জানালেন। মহিলার সাথে একটি ছেলে। কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলেন এই ছেলেটাই সেই রাহুল! তিনি দেখলেন, রুলিন রাহুলের মা বীনাকে ভাবি বলে ডাকে। রাহুল এবং তার মায়ের প্রকৃত পরিচয়টা তখন পর্যন্ত আড়ালেই থেকে গেল।

তবে মাত্র তিন ঘণ্টার প্রেমপাঠ্যে বিয়ের পিঁড়িতে উত্তীর্ণ 'মেধাবী' ডেইজির একের পর এক ভুল ভাঙতে থাকল। তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো খুব দ্রুতই সংঘটিত হচ্ছিল। রাতে শোবার সময় তিনি এমন অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন, জাত্যাভিমানী কোনো পশ্চিমা নারীও এমন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াতে সাহস করবে না। দারিদ্রক্লিষ্ট ঢাকার কোনো বস্তিবাড়িতেও যদি বাসররজনী যাপিত হয় তবে সেখানেও লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধের একটা দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। এক কুঠুরি একাধিক মানুষের মাথা গোজার ঠাঁই- এমন ঘরেও বাসর রজনী পালন করা হলে অন্তত একটি মোটা কাঁথা দিয়ে দম্পতিকে আলাদা করে দেয়া হয়। কিন্তু রুলিনরা কেবল দারিদ্রক্লিষ্ট এসব মানুষের কষ্ট নিয়ে নাটকই রচনা করেন, এদের ভালো গুণগুলো নেয়ার সুযোগ পান না বললেই চলে। তারা নাটকে অভিনয়ে মানুষকে কেবল বাইরের সাদা চামড়াটা দেখান। আসল চেহারাটা প্রকাশ পায় স্ত্রী আর আপনজনদের কাছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

« خِيارُكُمْ خِيارُكُمْ لِنِسائِهِمْ ».

‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।’ [ইবন মাজা : ১৯৭৮]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ».

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম। [তিরমিযী : ১৯৭৭; বাইহাকী, সুনান : ১৬১১৭]

যাহোক, নববধূ ডেইজির জন্য শোবার ব্যবস্থা করা হলো। লম্বা খাট। চারটে বালিশ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এটাকে তিনি রাহুলের মায়ের আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা হিসেবে অনুবাদ করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তার অনুবাদে অসঙ্গতি দেখা দিল। তিনি জানতে পারলেন, এক খাটে চারজনের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে! রুলিন, ডেইজি, বীনা এবং রাহুল!

ঘৃণায় প্রতিবাদের ভাষাটাও হারিয়ে ফেললেন ডেইজি। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু এতটুকু বলতে পারলেন- ‘এ হতে পারে না।’ কিন্তু নিরুত্তাপ ও ভাবলেশহীনকণ্ঠে রুলিন বললেন, এতে অস্বাভাবিকতার কী আছে? উনি আমার ভাবি হন তাই আমরা সবাই এক খাটে রাত কাটালাম, অপরিচিত তো আর কেউ না! রুলিনের দৃষ্টিতে যা স্বাভাবিক, তা ডেইজির রুচল না। তিনি বালিশে মুখ গুঁজে পাশ ফিরে কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেয়ার কসরত করলেন।

প্রভাতের আলো যখন শয্যাবাসীদের চোখ থেকে ঘুমের পর্দা সরিয়ে দিল তখন চোখ খুললেন ডেইজি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখটা পড়ল গিয়ে ঘুমন্ত স্বামীর ওপর। তিনি ভাবীকে জড়িয়ে...

এর কয়েকদিন পর। আজ শবে কদর। বাঙালী মেয়েরা হাজার হলেও ধর্মভীরু। অন্তত বিশেষ দিনগুলোতে। পূর্ণ উদ্যমে শবে কদর পালন করার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন ডেইজি। আয়োজন করতে চাইলেন রুটি-গোশতেরও। রুলিন প্রথম অংশে সহযোগিতা করলেও দ্বিতীয় অংশে বাঁধ সাধলেন। দম্ভোক্তি করে আল্লাহ-আল্লাহর অস্তিত্ব নেই বলে সালাত-সিয়াম পালন করা বেকার বলে মন্তব্য করলেন। স্বামীর চারিত্রিক অধপতনের সাথে সাথে বিশ্বাসের এই শূন্যতা দেখে আরো ঘাবড়ে গেলেন ডেইজি। ভবিষ্যত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা ভাবতে হলো তাকে এখনই।

তবু হাতেপায়ে ঘোরাতে লাগলেন নতুন সংসারের চাকাটা। এর কয়েকদিন পর আবার মাথায় বজ্রপাত ঘটল তার। রুলিন-ভাবীর মাখামাখিটার মাহাত্ম্য বুঝে আসল তার। তিনি জানতে পারলেন, রাহুল মূলত তাদের অবৈধ মাখামাখিরই ফসল। বীনার স্বামী মানিক (ছদ্মনাম) এ ক্ষেত্রে নীরবদর্শক। সামাজিকতার স্রোতে নিজের নাকটাকে কোনো মত উঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সবকিছু নীরবে হজম করে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু ডেইজি তার স্বামীত্বের সম্ভ্রমবোধে প্রবলবেগে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। বললেন, আপনি কেমন স্বামী

যে, অন্য পুরুষ আপনার স্ত্রীর গর্ভে ঔরস রাখে আর আপনি তা নীরবে হজম করেন?

কথাটায় মানিকের পুরুষসত্তা জেগে উঠল। তিনি নাট্য সংঘ থেকে তিন দিনের মধ্যে এবং চিটাগাং থেকে পনেরদিনের মধ্যে রুলিনকে বিতাড়িত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি ছিলেন প্রভাবশালী লোক। যা সংকল্প তাই করে দেখালেন তিনি। এতে ডেইজির ওপর মারাত্মক ক্ষিপ্ত হলেন রুলিন। সুখ-সন্তরণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করার দায়ে স্ত্রীকেই এক নম্বর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি।

ঢাকায় ফিরে এলেন রুলিন। সাথে ডেইজিও। বীনা হাত ছাড়া হওয়ায় এবার নতুন শিকার ধরার কাজে নেমে পড়লেন রুলিন। প্রবৃত্তির আহ্লাদ পূর্ণ করা তো আছেই, সেই সাথে আরও আছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপার! রুলিনের জন্য কাজটা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এবার যাকে ধরবেন সেও তো ওই ডেইজিরই স্বজাত! তাকেও অভিনয় আর মুগ্ধতার জালে ফেলে শিকার করা সময়ের ব্যাপারমাত্র! তাই হলো। এবার তিনি শিকার করলেন দ্বীপান্বিতা নামের এক নাট্যকর্মীকে।

রুলিন পশ্চিমা সভ্যতার সীমাও ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমারা সবকিছু প্রকাশ্যে করলেও অন্তত পরকীয়াটা গোপনে করে। কিন্তু রুলিন তা করতেন না। স্ত্রীর সামনে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এ কাজটি করতে হয়ত বেশি আনন্দ পেতেন তিনি। বীনার বেলায়ই সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবার দ্বীপান্বিতাকে নিয়ে

শুরু হলো এই অভিজ্ঞতা। রুলিন দ্বীপান্বিতাকে নিয়ে ডেইজির বিছানায় শয্যা যাপন করতেন! কে আছে এমন নারী, যে নিজ বিছানায় স্বামীর অবৈধ প্রণয়িনীকে দেখেও তার মন কাঁদবে না? তাই তিনি কখনও কাঁদেন আবার কখনও প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গেলেই জোটে অত্যাচার। সেই পরনারীর সামনেই স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন রুলিন। অবলা নারীর শরীরে আঘাত করে করে নিজের পৌরুষ দেখান তিনি। এভাবে রক্তাক্ত হয় ডেইজির মন। পরনারীর কাছে পরাস্ত হওয়ার শোক তাকে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে।

হাজারও মন্দের এতটুকু ভালো এখানে যে, আমাদের দেশে এখনও সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি, যেখানে রুলিনদের মতো নারীপাগলরা যা খুশি তাই করতে পারবেন। কখনও কখনও তাদের সামনে এমন দেয়ালও পড়ে যা অতিক্রম করা সেকান্দারের দেয়াল অতিক্রম করার মতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই তারা এদেশে বেশ অস্বস্তিতে পড়েন মাঝে মধ্যে।

রুলিন শুটিং করতে নেপাল গেছেন- ডেইজি তাই জানেন এবং তাকে তাই জানানো হয়েছে। কিন্তু সরল ডেইজির মন অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতায় চতুর হতে শুরু করেছে। চুন খাওয়া জিহ্বা এখন দই দেখলেও ডরায়! তাই চুপটি মেরে বসে থাকলেন না। অনুসন্ধান করলেন এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, আসলে শুটিং নয়; দ্বীপান্বিতাকে নিয়ে থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন করতে নেপাল গেছেন রুলিন।

মুক্তবাসের অনাবিল স্বাদ আস্বাদন করে দেশে ফিরে এলেন রুলিন। স্ত্রীর বুক চিড়ে পরকীয়ার চর্চা করে যেতে থাকলেন অবলীলায়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কতভাবে যে মার খেয়েছেন ডেইজি- তার হিসেব একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রাখেন না।

এভাবে কেটে যায় আরও কয়েকদিন। এবার দ্বীপান্বিতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পালা। তাই তাকে ছেড়ে নতুন শিকারের সন্ধানে জাল নিয়ে নামেন রুলিন। রুলিন হলেন ঐসব সৌভাগ্যবান 'শিকারী', যারা মরাগাঙে জাল ফেললেও জালে মাছ জড়িয়ে যায়। এবারের শিকারের নাম হাসনা। দ্বীপান্বিতাকে ছাড়ানো গেল বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই একটা কলজে ছেঁচা আর্তনাদ বের হলো ডেইজির বুক ফেড়ে। স্বামীর পরকীয়ার আঘাতে আঘাতে নিঃশেষ হয়ে আসে তার চলৎশক্তি। একদিন তিনি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন- আচ্ছা, বলো তো, তুমি এসব করে বেড়াচ্ছো কেন?

রুলিন সেদিন যে জবাব দিয়েছিলেন তা শোনার পর ডেইজি আর কখনও নিজেকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন করেন নি। রুলিন জবাবে বলেছিলেন- 'এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ!'

হাসনাকে নিয়ে একটু বেশিই মেতে ওঠেন রুলিন। তাকে নিয়ে রাত কাটাতে শুরু করেন হোটেলে-বারে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতিবাদ আর মানুষের চোখ-ইশারা সমালোচনায় এক পর্যায়ে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি। লুকোচুরির ইতি টানতে মিরপুরের ইব্রাহীমপুর এলাকায়

একটা বাসা ভাড়া নেন এবং সেখানে তারা স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে বসবাস করতে থাকেন।

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। প্রবাদটা নিরঙ্কুশ সত্য প্রমাণিত হলো রুলিন-হাসনাদের বেলায়। যে বাড়িটায় তারা বসবাস করা শুরু করলেন তার নিচতলায় বাস করতেন ডেইজির এক আত্মীয়। একদিন হাসনাকে সাথে নিয়ে প্রবল হাস্যরসে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিলেন রুলিন। হঠাৎ তার হাস্যরসে ছেদ টেনে দিলেন মধ্যবয়সী এক মহিলা। আচানক প্রশ্ন করে মহিলা বললেন, এই যে বাবা! কোথায় যাও, সাথের মেয়েটি কে?

অপরিচিত একজন নারীর সামনে যে কোনো পরিচয়ই দেয়া যায়। সেটা মনে করেই রুলিন হাসনাকে তার স্ত্রীর পরিচয়ে ভূষিত করলেন। কিন্তু স্বল্প বিলম্বে সেখানে আরেকজন মহিলা হাজির হলেন। তিনি কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললেন, আরে রুলিন ভাই যে! তা এই মহিলাকে তো চিনলাম না?

এই দ্বিতীয় মহিলাকে চিনতেন রুলিন। তাই তার সামনে হাসনাকে স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত করা সম্ভব হলো না বলে দ্রুত কেটে পড়লেন সেখান থেকে।

ডেইজির দুটি পুত্রসন্তান। অনিন্দ্য (১৪) এবং বাবুন (৪)। বাবুন শিশুটির মানসিকতায় ভর করে আছে পৃথিবীর তাবৎ পিতৃবিদ্বেষ। চার বছরের একটি শিশু জগত দেখার আগেই দেখে ফেলেছে সকাল-বিকেল মায়ের নির্যাতিত হওয়ার সকরুণ দৃশ্য। দেখেছে

অনৈতিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যেয়ে মায়ের মার খাওয়ার নারকীয় দৃশ্য। সিগারেটের আগুনে দেহ দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য। বাবুন কেবল সেদিনই প্রহারের আঘাতে মাকে চোখ মুছতে দেখত না, যেদিন বাবা রুলিন বীনা কিংবা দ্বীপান্বিতা অথবা হাসনাদেরকে নিয়ে বাইরে রাত কাটাতেন। অবুঝ শিশু তাতে স্বস্তি পেত। মায়ের কপোল গড়িয়ে পড়া অশ্রু যে কোনো শিশুর জন্যই যে বড় কষ্টের। সেদিন শিশু বাবুন এই কষ্ট থেকে রেহাই পেত বলে তার খুশি ধরত না।

কিন্তু অবুঝ শিশু বোঝে না, যেদিন মায়ের চোখ অশ্রুপাত করে না সেদিন তার আত্মা রক্তপাত ঘটায়। সে রাতের অনুপস্থিত স্বামীর শূন্যতা কারবালার রুক্ষতা হয়ে মায়ের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অবুঝ শিশুর কি এসব বোঝার সময় আছে? সে বোঝে মায়ের চোখে আজ পানি নেই, ব্যস।

কতদিন সে বাবার হাতে মাকে হত্যা করতে উদ্যত দা-বটি দেখে, পিতার রুদ্রমূর্তি দেখে ক্ষোভের সাথে বলেছে- আব্বু ‘ববমাশ’, চালো তাকে জবাই করি! কতদিন মাকে নিভৃতে অশ্রুপাত করতে দেখে বলেছে- আম্মু! আর কেঁদো না, চলো আমরা ববমাশ বাবাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

রুলিনের সব অত্যাচার সহ্য করে যান ডেইজি। কিন্তু নির্যাতন, অত্যাচার, জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে গা পুড়িয়ে দেয়া, মানসিক নির্যাতন এবং হত্যার হুমকি দিন দিন বাড়তে থাকে। তাই শেষে

হাল ছেড়ে দেন তিনি। প্রিয় মানুষ রুলিনকে ভালোবাসা দিয়ে বিনিময়ে শুধু জীবনটা নিয়েই পালাতে সক্ষম হন তিনি।

তার অন্তরে আজ ভালোবাসার ঝাঁপসা স্মৃতি। স্মৃতির বিস্তৃত মাঠ জুড়ে বীনা, দ্বীপান্বিতা আর হাসনাদের সদর্প পদচারণা, নিজ স্বামীতে উড়ে এসে জুড়ে বসা এসব অতিথি নারীদের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের নারকীয় দৃশ্য, দুটি সন্তানের আম্মু ডাকার অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, ফেলে আসা শিশু বাবুনের মায়ের প্রতি অগাধ মমতার স্মৃতি আর স্বামী রুলিনের ব্যবহার্য একটি গেঞ্জি। বীনা, দ্বীপান্বিতা আর হাসনারা রুলিনের যে দেহ কুড়ে কুড়ে খায়, বৈধ স্ত্রী ডেইজি কেবল এই ব্যবহার্য গেঞ্জির গন্ধ শুঁকে সেই স্বামী রুলিনের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করেন! চোখের ওপর গেঞ্জিটা রেখে চোখ বুঁজে কল্পনা করেন, এই সেই গেঞ্জি যাতে রুলিনের দেহ স্পর্শ করেছে! রুলিন! তুমি কোথায়? এই দেখ, তোমার স্মৃতিকে কত আপন করে সাথে করে বেড়াচ্ছি!

ডেইজি! ঘুণেধরা এই সভ্যতায় একটি শীর্ণ বস্ত্রে তুমি তোমার দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতি খুঁজে বেড়াও? এই শীর্ণ বস্ত্রটি তোমার আঁখিজলে যেদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, সেদিন তুমি কোথায় খুঁজে বেড়াবে এই সান্ত্বনা?

ছেলে অনিন্দ্যটা এখন কী করছে? বাবুন কী এখন আম্মু আম্মু বলে কাঁদছে আর তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? এসব প্রশ্ন মা ডেইজির মনে ঘুরপাক খেতে থাকে তার শূন্য সংসারে। যখন কোনো কিছুতেই মন সরে না, তখন তিনি হাজির হন অনিন্দ্যদের

স্কুলগেটে। ছেলেকে এক নজর দেখে তৃষিত বুকটা সামান্য সময়ের জন্য শীতল করে আসেন তিনি। কিন্তু তার এই ‘সুখটা’ সহ্য হয় না রুলিনদের। অনিন্দ্য যেন মায়ের সাথে দেখা করতে না পারে এবং মা যেন তাকে দেখতে না পারে- এমন একটি কঠিন বিধান রচনা করেন তিনি। **শুধু তাই নয়**, ডেইজি শুনতে পেলেন নিজ সন্তান তার মায়ের চরিত্র নিয়ে কথা বলছে এবং তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার কারণ নাকি মায়ের চরিত্র- এমন কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কথাগুলো শুনে মায়ের আত্মা বিদীর্ণ হয়। তিনি অনেক কষ্টে একদিন ছেলের সাথে দেখা করেন এবং বলেন, বাবা! তুমি নাকি মায়ের নামে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছো?

বহুদিন পর মাকে দেখে অনিন্দ্যের অন্তরে ঝড় বইতে শুরু করে। সে মাকে আশ্বস্ত করে বলে, মা! আমি সত্যি সত্যিই একদিন তোমার কাছে ফিরে আসব। সেদিন আমি তোমাকে সব কথা বলব এবং জানাবো, কারা আমাকে দিয়ে এসব কথা বলাচ্ছে এবং কেন বলাচ্ছে।

সর্বহারা ডেইজির বুক এবার সাহারার মরুভূমি। শিশু বাবুনের জন্য তার মনটা সব সময় ছটফট করতে থাকে। পৃথিবীর সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও এক নজর ছেলেকে দেখতে চান তিনি। কিন্তু তাকে কোনোভাবেই সেই সুযোগ দেয়া হয় না। এরই মধ্যে শুনতে পান, বাবুনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হায়! কাজের লোক আর মজুরী দিয়ে বাবুনের মাতৃশূন্যতার ঘাটতি পূরণ হবে?

অনেক কষ্টে তিনি বাবুনের সাথে কথা বলার মতো একটা মোবাইল নাম্বার যোগাড় করলেন। ফোন করে কলজের টুকরোর সাথে কথা বললেন। **বহুদিন পর মায়ের কণ্ঠস্বর ছোট্ট** শিশু বাবুনের অন্তরে যেন অভিযোগ, অনুযোগ আর অভিমানের বান সৃষ্টি করলো। কান্নার ভাষাহীন ব্যাখ্যায় সে প্রকাশ করল তার অসহায়ত্বের কথা আর মাতৃস্নেহ বঞ্চনার দুঃখের কথা। পুনঃপুন তাগিদ দিয়ে মায়ের বুকে ফিরে আসার আর্তি জানালো সে। এমন নিষ্পাপ সন্তানের দুঃখভরা আকুতি ডেইজিকে যেন বিদ্রোহীনী করে তোলে। মন চায় একবার যেমন পেট চিড়ে সন্তানকে দুনিয়ায় নিয়ে এসেছেন এবার সমাজ আর রুলিনদের নিষ্ঠুরতার বাধা ছিন্ন করে সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। কিন্তু নিজের অক্ষমতার কথা মনে করে মুহূর্তেই চুপসে যান। তিনি জানেন, সন্তানের এই আর্তি যতই নিষ্পাপ ও অকৃত্রিম হোক না কেন, তা জালিমের রুক্ষহৃদয়পাড়ে করুণার ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়বে না। ফিরে দেয়া তো দূরের কথা, হয়ত অনিন্দ্যের মতো তার সাথেও দেখা বা কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়া হবে। হলোও তাই। বাবুনের সাথে গর্ভধারীনী মায়ের কথা বলার ঘটনাটি জানতে পেরে এই পথটিও রুদ্ধ করে দিলেন রুলিন।

এত লাঞ্ছনা, বঞ্চনার পরও স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় কমতি নেই ডেইজির। যে তাকে দাম্পত্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে, কোল খালি করেছে, দূর থেকে তারও নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন তিনি। কিন্তু কী হলো আজ তিনদিন হয় স্বামীর খোঁজ পাচ্ছেন না

ডেইজি। অনেকের সাথে যোগাযোগ করেও সন্ধান করতে পারলেন না তিনি। অবশেষে দেবরের মাধ্যমে জানতে পারলেন রুলিন স্ট্রোক করেছেন। কিন্তু কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন তা জানাতে অস্বীকার করল সে। তিনি বারবার তার পায়ে পড়তে লাগলেন স্বামীর সর্বশেষ অবস্থা এবং তার অবস্থানস্থল জানার জন্য। কিন্তু দেবর অনঢ়। কোনো আকুতিতেই সে এরচে বেশি তথ্য দিল না।

তবে অন্য মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, রুলিন স্ট্রোক করে মিরপুরের ন্যাশনাল হার্টফাউন্ডেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। কিন্তু অসুস্থ স্বামীকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি নেই তার। কারণ, রুলিনের আদেশ ডেইজি যেন তার মরা মুখটাও দেখার কোনো সুযোগ না পায়। তার এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শিয়রে বসে আছে হাসনা। পৃথিবীর মস্তবড় এই রক্ষী অবিচল রয়েছেন ডেইজির আগমন ঠেকানোর জন্য। কারণ, ডেইজি দেখা করায় পাছে রোগীর যদি কোনো ক্ষতি হয়! হায় হাসনা! একেই বলে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি!

অনেক অনুনয় বিনয় ও কসম করেও অসুস্থ স্বামীকে দেখার অনুমতি পেলেন না ডেইজি। অধিকার বঞ্চিত ডেইজির আজ সম্বল স্বামীর ব্যবহার্য একটা গেঞ্জি, ২রা নভেম্বর ২০১০ইং থেকে সন্তান হারানোর স্মৃতি এবং ওই যে বেঞ্চের ওপর তিন ঘণ্টার সেই প্রেমপাঠ্য! শতভ্রষ্টতায় পিষ্ট ডেইজি আজও নারী পটিয়সী বহু ভালোবাসার কাঙাল স্বামীকে ভালোবেসে যান পাগলের মতো। কি

জানি ডেইজিদের মতো সরল অবলা নারীদের উদ্দেশ্যই হয়ত শেখ সা’দী রহ. কাব্য গেঁথেছেন নিম্নোক্ত শব্দমালায়-

معشوق هزار دوستو را دل نه دهی

(মা’শূকে হাজার দোস্তরা দেল না দেহী)

ورمی دهی ان دل بجدائ به نهی

(ওয়ার মী দেহী আ দেল ব-জুদাঈ বা নেহী)

‘বহুভালোবাসার কাঙাল ভিখারীর থালায় ভালোবাসার ভিক্ষা দিও না। একবার দিলেও তা তুলে নিতে প্রস্তুত থেকো।’

ডেইজি! কাব্যের প্রথম লাইনটি তোমার জন্য, শেষেরটাও তাই।

ভিনগ্রহের পরকীয়া

ঘটনাটা প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় নি। এখনও কেমন খটকা খটকা লাগে। কিন্তু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা মন থেকে খটকা দূর করে দিয়েছে। ব্যাখ্যা পাঠ করে মনে হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে। তাছাড়া ঘটনাটি সচিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইচ্ছা করলেও সহজে তা অবিশ্বাস করার উপায় নেই। আগে ঘটনার পেছনের ঘটনা উল্লেখ করে নিই :

সুর আর গানের ঝংকারে বিমুগ্ধ হয় মানুষ। সুরের মূর্ছনায় হিতাহীত জ্ঞান হারিয়ে অপ্রীতিকর কিছুও করে বসে তারা। অশ্লীল গান আর সুরের ঝংকারে নষ্ট হতে পারে ঈমান-আকীদা। অনেক সময় সুরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় নানান আপত্তিকর ঘটনা। অবশ্য এগুলো নিতান্তই মানব সমাজের ঘটনা। কিন্তু যদি ভিন্ন জগতের বাসিন্দারা সুরের মূর্ছনায় অস্বাভাবিক কিছু করে বসে তাহলে সেটা কেমন হয়? সেরূপ একটা ঘটনা পড়েছিলাম বহুদিন আগে একটি আরবী কিতাবে।

জনৈক ব্যক্তি এক হিজাযী বন্ধুর বাড়িতে মেহমান হয়ে দেখতে পেলেন, ঘরের বাইরে একটা গোলামকে বেঁধে রাখা হয়েছে। গোলাম মেহমানকে দেখে আশান্বিত হলো। কারণ, আরবরা মেহমানকে খুব সম্মান করে। তাই সে মেহমানকে বলল, জনাব! আপনি আমাকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করুন। মেহমান বললেন, আগে বলবে তো কী হয়েছে তোমার? গোলাম বলল, হুজুর!

অনিচ্ছাকৃত একটি অপরাধের সাজা দিতে আমাকে বন্দী রাখা হয়েছে। এরপর সে পুরো কাহিনী বর্ণনা করে শোনালো।

আমি একবার সফর থেকে ফিরছিলাম- বলা শুরু করল সে- মুনিবের বাড়ির কাছাকাছি এসে তর সইছিল না। তাই দ্রুত উট হাঁকালাম। উট হাঁকানোর ক্ষেত্রে আমার একটা কৌশল আছে। সেই কৌশল আমি সেদিনও প্রয়োগ করলাম। সুরেলাকণ্ঠে গযল গাওয়া শুরু করলাম আর আমার সওয়ারকে দ্রুত হাঁকাতে শুরু করলাম। কণ্ঠের মাধুর্য্যে পেছনের উটগুলো ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করল। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হলাম। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে দম নেয়ার আগেই উটগুলো একের পর এক পড়ে মারা যেতে শুরু করল। অবলা প্রাণীগুলো সুরের মূর্ছনায় দম নেয়ার সময় না পেলেও যখন পেলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভেতর শুকিয়ে কলজে ফেটে তখন মরার সময়। তাই প্রায় সবগুলো উটই মারা পড়ল। মুনিব এত বড় ক্ষতি মেনে নিতে পারলেন না। মানার কথাও না। তাই তিনি আমাকে বন্দী করে এভাবে ফেলে রাখলেন। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

মেহমান তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমাকে সাহায্য ও উদ্ধার করার চেষ্টা করব। কথা মতো তিনি খেতে বসে হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিলেন। আরব মেজবানের জন্য এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু হয় না। তিনি অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপার কী? মেহমান বললেন, আপনি যদি একটা কথা

রাখেন তাহলে আপনার বাড়ির খাবার গ্রহণ করব, অন্যথায় নয়। মেজবান তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, কী সেই কথা?

-আপনার গোলামটাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে হবে!

-কিন্তু আপনি কি জানেন সে আমার কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে? তার কণ্ঠে এমন যাদু আছে যা বোবা পশুদেরকেও তন্ময় করে। আসুন দেখবেন তার কারিশমা।

এই বলে মেজবান তাকে গোলামের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন, তুমি তোমার সুরে গযল গাইতে শুরু করো তো!

মুনিবের আদেশ মোতাবেক ছাড়া পাওয়া গোলাম গযল গাওয়া শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে এক সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হলো। গাছপালাও যেন সুরের ঝংকারে দুলে ওঠা শুরু করল। আশেপাশের উটগুলো লাফাতে শুরু করল। কোনোটা দড়ি ছিঁড়ে গোলামের কাছে দৌঁড়ে এলো। মেহমান বিস্মিত হলেন। সুরের মূর্ছনায় পশুপাখিও যে বিমোহিত হয় তার বাস্তব প্রমাণ নিয়ে তিনি সেদিন ঘরে ফিরলেন।

বহুদিন পর এমন আরেকটি ঘটনার সন্ধান মিলল। ঘটনাটি হিজাযের নয়, আমাদের দেশের; রংপুর চিড়িয়াখানায়। মানুষের ধারণা, আল্লাহ তা‘আলা আঠার হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাদের এই ধারণা আদৌ সত্য নয়। আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি ও মাখলুকের সংখ্যা মোটেই এত কম নয়। বিজ্ঞানিরাই তো এ

পর্যন্ত অনুন্ধান করে তের লাখ পঞ্চাশ হাজার প্রাণীর অস্তিত্ব পেয়েছেন। এর মধ্যে কীট-পতঙ্গই আছে প্রায় ছয় লাখ।
দয়াময় মাবুদের সৃষ্টি এসব প্রাণীর মধ্যে যে কত রকমের বৈচিত্র্য আছে তার কিছুটা অনুমান করা যায় আল্লামা দুমাইরী রহ. সংকলিত হায়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থটি পাঠ করে। এসব প্রাণী ও কীটপতঙ্গের কতগুলো আছে বিস্ময়কর গানপাগল। সুর আর গানের মূর্ছনায় তারা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। যেমন অতিপরিচিত একটা কীট হচ্ছে ঘুগরা। পৃথিবীতে বহুপ্রজাতির ঘুগরা আছে। কেবল আমেরিকাতেই আছে ২২০ প্রজাতির ঘুগরা। পুরুষ ঘুগরার কাজ হচ্ছে গানের মাধ্যমে বান্ধবী খুঁজে বেড়ানো। তারা গানে গানে বান্ধবীকে কাছে আসার আমন্ত্রণ জানায়। আর মেয়ে ঘুগরারাও পুরুষ ঘুগরার গানে মাতাল হয়ে তার কাছে ধরা দেয় এবং তার সাথে মিলিত হয়।
ঘুগরা ছাড়াও আরো বহুপ্রাণী আছে যারা গান করে বিপরীত লিঙ্গকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। একটি ঘটনা অবতারণার জন্য এতগুলো কথা বললাম। এবার মূল কথায় ফিরে আসি। বছর দশেক আগে ঢাকা চিড়িয়াখানা থেকে রংপুর চিড়িয়াখানায় আনা হয় জোড়া ময়ূর-ময়ূরীকে। রাখা হয় এক খাঁচায়। প্রাণী তত্ত্বাবধায়ক আনোয়ার হোসেন শখ করে ময়ূরের নাম রাখেন শাকিল খান। আর স্ত্রী ময়ূরের নাম রাখেন ময়ূরী।
আবাসস্থল পরিববর্তন হলেও ভালোই দিন কাটছিল তাদের। ময়ূরীকে ছাড়া এক মুহূর্তও একা থাকত না শাকিল খান। কিন্তু

বছর চারেক আগে পাশের খাঁচায় আনা হয় এক কিশোর পাখিকে। অতিথির আগমন সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে। ডিমোসিলক্রেন নামের এই পাখিটি দেখতে সুদর্শন। ময়ূরীর খাঁচার পাশে বড় হতে থাকে সে। সুদর্শন এই ডিমোসিলক্রেন যুবক বয়সী হওয়ার সাথে সাথে আনোয়ার হোসেন এটার নাম রাখেন শাকিব খান। মিষ্টি সুরে গান করে শাকিব খান। তাই এই সুর ফাটল সৃষ্টি করে ময়ূরী ও শাকিল খানের সম্পর্কে।
তার গানে মুগ্ধ হয় ময়ূরী। বিমোহিত হয়। কিন্তু 'স্বামী'র সামনে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না সে। তাই স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেই মনের টানে শাকিব খানের খাঁচার পাশে গিয়ে হাজির হয় সে। আস্তে আস্তে ময়ূরীর প্রতি দুর্বল হতে শুরু করে শাকিব খানও। সুযোগ পেলেই শিল্পিত আকারে পরকীয়ার চর্চা করে। খাঁচার ফাঁক গলে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে ময়ূরীকে 'আদর' করে। ময়ূরীও কম যায় না। সেও তার ভালোবাসার ডাকে সাড়া দেয়। ফলে শাকিল থেকে দূরে সরে যেতে থাকে ময়ূরী। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ময়ূরীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় শাকিল খান। কিন্তু ময়ূরী তখন পরকীয়ার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া এক ভ্রান্ত নাবিক। সে কোনো মতেই নিজেকে শাকিলে আবদ্ধ রাখতে পারে না। ফলে অভিমানে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেয় সে। স্বামীর সামনেই দেখিয়ে দেখিয়ে সারাক্ষণ শাকিবের খাঁচার কাছে পড়ে থাকে। বোবা প্রাণীর পরকীয়ায় মানুষেরই বা কী করার আছে? তাই

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ময়ূরীকে শাকিবের খাঁচায় রাখা শুরু করে।

পরস্পরকে কাছে পেয়ে নতুন জীবন ফিরে পায় শাকিব-ময়ূরী। স্বাভাবিক খাবার খাওয়া শুরু করে তারা। অপরদিকে নিজের চোখের সামনে স্ত্রীর পরকীয়া এবং পরকীয়া স্বামীর সাথে আমোদে বসবাস দেখে দুঃখের সাগরে ভাসতে শুরু করে শাকিল। শোকে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয় সে। চিড়িয়াখানার ডেপুটি কিউরেটর আবুল কাশেম জানান, মানুষের মতো ভালোবাসা প্রাণীজগতের মধ্যেও রয়েছে। তারাও সঙ্গীনী হারানো ব্যথা অনুভব করে। সেটা শাকিলের আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ভিন্ন উপায়ে খানা খাওয়ানো হচ্ছে। [তথ্যসূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ১জুন ২০১১ইং]

কী অদ্ভুত ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত প্রাণীজগতেও...

প্রাণীজগতে বেশকিছু প্রাণীর সতীত্ব ও স্বামী-স্ত্রী ভক্তির সুনাম আছে। এগুলোর অন্যতম হলো ময়ূর-ময়ূরী, ঘুঘু, কবুতর ইত্যাদি। আল্লামা ইবন কুতাইবা (রহ.) 'উয়ূনুল আখবার'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি কবুতরীকে দেখেছি, সে নিজ স্বামী (জোড়া) ছাড়া অন্যকে সংগত হওয়ার সুযোগ দেয় না। আর স্বামী কবুতরও নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাথে মিলিত হয় না। ময়ূরের মধ্যেও ঠিক এই স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ কী! আজ যে হিসেবপাতি ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে! ময়ূরী কেন শাকিল খানের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে? এটা কীসের আলামত? এই ঘটনা তো আমাদের

মানবসভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে না? শেষ পর্যন্ত চিড়িয়াখানার চিড়িয়াগুলো আমাদের মানবসমাজের মুখোশ উন্মোচন করে দেবে নাকি! আসুন এবার এসব প্রশ্নের উত্তর ও রহস্যের জট খুলতে কুরআনের ব্যাখ্যায় যাই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ ﴾ [الروم: ٤١]

‘মানুষের হাতের উপার্জনে জল ও স্থলভাগে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়েছে।’ {সূরা আর-রূম, আয়াত : ৪১}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর জল ও স্থলভাগ এক সময় শান্ত, নিরাপদ ও জুলুমমুক্ত ছিল। কেউ কারও প্রতি আগ্রাসী ছিল না। বনের বাঘ ছাগলের ওপর, সিংহ হরিণের ওপর আক্রমণ করত না। সাপ ব্যাঙ ধরে খেত না। রাঘব বোয়াল পুঁটি মাছ ধরে খেত না। কুমির খেত না কচ্ছপকে। কিন্তু এক সময় মানুষের পাপের ভারে বিপর্যস্ত হয় পরিবেশ। ভেঙে পড়ে ইনসাফ ব্যবস্থা। মানুষের হাতের কামাইয়ের কারণে জল ও স্থলভাগে ছড়িয়ে পড়ে জুলুম-আগ্রাসন। যেদিন কাবিল নিরাপরাধ হাবিলকে হত্যা করে সেদিন থেকে স্থলভাগের পশুদের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে। তারা চিন্তা করে তবে এটাই বুঝি জগতের নিয়ম? শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলের ওপর আক্রমণ করা? ব্যস, শুরু হলো হাঙ্গামা। শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলকে আক্রমণ করার নির্মম প্রতিযোগিতা।

জুলুমও আগ্রাসন ততক্ষণ পর্যন্ত স্থলভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখনও জলভাগে এর প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু এগিয়ে এলো আরেক জুলুমবাজ। জালান্দার ইবন কিরকির। কুরআনে মুসা (আ.) ও খিযির (আ.)-এর ঘটনায় নৌকা নষ্ট করে দেয়ার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মূল উৎস ছিলেন এই বাদশা মশাই! তিনিই জোর করে গরীব-দুঃখীদের নিখুঁত ও ভালো জাহাজ এবং নৌকাগুলো ছিনিয়ে নিতেন। অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে দুর্বলের সম্পদ গ্রাস ও তার ওপর আক্রমণ করার দৃশ্য দেখে সেদিন থেকে জলভাগের প্রাণীরাও জুলুমবাজ হতে শুরু করেছিল। মানুষের দেখাদেখি জলভাগেও সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর আক্রমণের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, সেদিন থেকে বোয়াল পুঁটিকে ধরে। কুমির ধরে কচ্ছপকে। ফলে এভাবেই মানুষের দেখাদেখি স্থল ও জলভাগে জুলুম ও অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। অবলা প্রাণীরা এক্ষেত্রে নির্বিচারে মানুষের 'অন্ধ অনুসরণ' করতে থাকে!

বর্তমান সময়ে প্রেম ও পরকীয়া মানুষের মধ্যে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে প্রাণীরাও যেন এই দুষিত আবওহাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। তারাও মানুষের অনুসরণ করার কসরত করছে! ময়ূরী-শাকিলের প্রেম-উপাখ্যান কি তবে মানুষেরই পাপের ফসল? আমরা কি এই নিষ্পাপ পাখিদের মধ্যে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে শুরু করেছি? কথাটা বোধ হয় সত্যি, মিথ্যে নয় এক রত্তি!

সন্দেহ ও অবিশ্বাস : উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের অবাঞ্ছিত প্রসব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً ».

'আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা একশতটি রহমত সৃষ্টি করে মাত্র একভাগ মাখলূকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই একভাগ রহমত দিয়েই মাখলূক একে অপরের প্রতি রহম ও করুণা করে।' [তিরমিযী : ৩৮৪৬]

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, 'এই একভাগ রহমতের বদৌলতেই মায়েরা তার বাচ্চার প্রতি স্নেহ করে...' [দেখুন, বুখারী : ৬০০০; মুসলিম : ৭১৪৮]

বস্তুত মায়েদের মনে আল্লাহ তা'আলা রহমতের সাগর তৈরি করে দিয়েছেন বলেই তারা সন্তানের প্রতি সীমাহীন করুণাময়ী হয়। দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করে। যে কিশোরী কৈশোরে কোনো মাকে সন্তানের পেশাব সাফ করতে দেখে নাক চাপে সেই কিশোরীই যখন নিজ উদরে সন্তান ধারণ করে এবং মৃত্যুদুয়ার পেরিয়ে নিজের নতুন জীবনপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে জননী হয়, তখন তার সব ঘৃণা কোন্ দিগন্তে যেন হারিয়ে যায়। ফলে এক সময় পেশাবকে ঘৃণা করলেও এখন দুহাতে নিজ সন্তানের পায়খানা মলতেও বাধে

না তার! যে অনূঢ়া অন্যের শিশুর কান্নায় ত্যক্ত-বিরক্ত হয় সেই 'মহিলাই' বিয়ের পিঁড়ি ভেঙে যখন মা হয় তখন গভীর রাতেও সন্তানের কান্নায় বিরক্ত হয় না। তার সত্তাটা সন্তানের চাহিদা পূরণে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কাজ করে। স্নেহের আতিশয্যে কখন যে ঘুমের মধ্যে জামার বোতামটা খুলে সন্তানের মুখে স্তন্য পুরিয়ে দেয় সে নিজেও তা জানে না! ক্ষুধার্ত শিশু মায়ের স্তন্য গ্রহণ করে যতটুকু তৃপ্তি না পায়, ঘুম মার দিয়ে সন্তানকে স্তন্য দিয়ে তার চেয়ে বেশি তৃপ্তি পান ওই মা। এমনি সব স্নেহ, প্রীতি আর মায়ায় ঘেরা সন্তান আর মায়েদের জীবন!

কিন্তু স্নেহ-প্রীতি ও মায়ার বাঁধনটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছে। সময়ের পরিবর্তনে ঘটে চলেছে অস্বাভাবিক নানা ঘটনা। আজ অনেক মাকে নিজ হাতে সন্তান হত্যা করতে দেখা যায়। কখনও বা সে সন্তানকে করছে নিজের সাথে মৃত্যুপথ যাত্রী। আর এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকে। এটাকে কেন্দ্র করে কত নারীপুরুষের যে কপাল পুড়ছে, ঘর ভাঙছে তার ইয়ত্তা নেই। বলাবাহুল্য এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে জনক-জননীর কাজ করছে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিস্ময় মোবাইল!

বাংলাদেশে প্রথম যখন মোবাইল নামের 'নিরীহ ঘাতকটা' আগমন করে তখন তা ছিল এদেশের হতদরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের জন্য রীতিমতো বিস্ময়। দেড়লক্ষ টাকা খরচ করে একটা মোবাইল কেনার কয়জনই বা সাহস করত! তাই কারও হাতে মোবাইল থাকলে আশেপাশের লোকেরা তার দিকে ঈর্ষাভরে তাকাতো! আর

মোবাইলধারী ওই ব্যক্তিও নিজের প্রতি অন্যের আক্ষেপের দৃষ্টি নিপতিত হতে দেখে চরম পুলক অনুভব করত। মোবাইলধারীকে দেখে কতজনকে আক্ষেপ করতে দেখেছি! লোকদেরকে ওমন একটা মোবাইলের মালিক হওয়ার স্বপ্ন বুনতে দেখেছি!

তবে চড়াদামের সাথে সাথে মোবাইলগুলোর সেবাও ছিল সীমিত। কেবল রাজধানী ও গোটা গোটা কয়েকটি শহরে এর কার্যকারিতা চোখে পড়ত। সেখানেও আবার ঠিকমতো সেবা পাওয়া যেত না। শুনেছি, জনৈক অভিনেতা নাকি গায়ক একবার মানিক মিয়া এভিনিউতে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন। মোবাইল কোম্পানির পক্ষ থেকে ইমার্জেন্সি কারণে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার বিশেষ একটা নাম্বার দেয়া ছিল। এই ব্যক্তি বিপদে পড়ে খেই হারালেন না। মাথা ঠিক রেখে বুদ্ধি করে সেই জরুরী নাম্বারে কল দিলেন। কিন্তু তার মাথা ঠিক মতো কাজ করলেও মোবাইলটা ঠিক মতো কাজ করল না। যতবার কল দিলেন ততোবার 'মোবাইল ওমেন' বললেন, দুঃখিত, আপনার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারে এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ পর আবার কল করুন...

মোবাইলওয়ালা মারাত্মক বিরক্ত ও ক্ষীপ্ত হলেন। ছিনতাইকারীরা তার সব নিয়ে যায় কিন্তু মোবাইলের 'কিছুক্ষণ' আর শেষ হয় না! ঠিক কতক্ষণ পর তাকে কল করতে বলা হচ্ছে তা তিনি ঠাহর করতে পারলেন না! আক্রান্ত হয়ে সর্বস্ব হারানোর পর মোবাইলটা

কল গ্রহণ করবে? ছিনতাইকারী বাছাধন কি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?
মূল্যবান বস্তুটির প্রতি ভীষণ রাগ হলো তার। তাই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে মোবাইলটাকে পিচঢালা রাস্তার ওপর ছুঁড়ে মারলেন। সেবা প্রদানে ত্রুটি করায় সেদিন মোবাইলটার কী অবস্থা হয়েছিল তা বলতে পারি না, তবে সেবা অবাধ হওয়ার পর মানুষের যে অবস্থা হয়েছে তার কিঞ্চিত ধারণা দিতে পারি এবং সেই ধারণা দেয়ার জন্যই আজকের ঘটনাটি উল্লেখ করব।
এর পর আসল গ্রামীণফোন। নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকল সারাদেশে। এক সময় রাস্তার পাশে ছোট ছোট বিলবোর্ডে লেখা থাকত- জিপি এখন সিরাজগঞ্জে, জিপি এখন হবিগঞ্জে...
এরপর আসল আরেক পর্যায়। ঢাকার বাসিন্দাদের কি মনে পড়ে ফার্মগেটের ওভারব্রিজের দুই গায়ে জড়ানো ডিজিটাল সাইনের গ্রামীণফোনের চকচকে বিজ্ঞাপনগুলোর কথা, যাতে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠে মাথাল মাথায় দেয়া কৃষক ও ছাগলের বাচ্চা কোলে নেয়া গৃহিণীর হাতে মোবাইল ধারণের দৃশ্য প্রতিভাত হতো? সে সময় কি এই দৃশ্যের বাস্তবতা কল্পনা করতে কষ্ট হতো না? বিজ্ঞাপন নির্মাতার কল্পনার দুঃসাহস বলে মনে হতো না?
কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্নের উত্তর কাটায় কাটায় মিলে গেছে। বিজ্ঞাপননির্মাতা এবং কোম্পানির কল্পনাকেও হার মানিয়েছে বাস্তবতা। আজ গৃহিণী আর কৃষাণের হাতেই মোবাইল

সীমাবদ্ধ নয়। সমুদ্রের গভীরে অথৈ পানির কলকল ধ্বনির সাথে জেলের কোচড়াতেও প্রতি মুহূর্তে গর্জে উঠছে মোবাইল। মোবাইলের রিংটোনে কেঁপে উঠছে সমুদ্র, নদীর শান্ত পানিরাশি। আধুনিকতা আর উৎকর্ষের দখলে আজ স্থল ও জল উভয়ভাগ! এভাবে বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এই বেগের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে আবেগ, উচ্ছ্বাস আর মমতা। নিচের ঘটনাটা দেখুন :

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানার পশ্চিম ধুলাসার গ্রাম। আধুনিকতা আর উৎকর্ষের ছোঁয়া লেগেছে এই প্রত্যন্ত গ্রামটিতেও। তাজেনুর রহমান (২৬) এর স্বামী কাওসার বিশ্বাস। পেশায় জেলে। মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। নামের সাথে বিশ্বাস শব্দটা থাকলেও 'বিশ্বাসে' বিশ্বাসটার পরিমাণ কম। তাই তিনি স্ত্রীকে অবিশ্বাসের তীরে বিদ্ধ করেন। আর তা মোবাইলকে কেন্দ্র করেই। ঘরে রেখে যাওয়া মোবাইলে অপরিচিত নাম্বার থেকে মাঝেমধ্যেই কল আসত। উত্ত্যক্ত করত তাজেনুরকে। স্বামী নিজেও অনেক সময় কল দিয়ে স্ত্রীকে পরীক্ষা করতেন। আর সামান্যতেই সন্দেহের বিষ ঢেলে দিতেন স্ত্রীর ওপর। বিষে বিষে জর্জরিত হতো তাজেনুরের জীবন।

এরই মধ্যে গত ২৩-০৫-২০১১ইং তারিখ মঙ্গলবারে অপরিচিত একটি নাম্বার থেকে কল আসে এবং কলদাতা তাকে গালিগালাজ করতে থাকে। এ নিয়ে স্ত্রীর সাথে তুমুল ঝগড়ায় লিপ্ত হন কাওসার বিশ্বাস। বিষাক্ত হয় তাজেনুরের মন। স্বামীর অবিশ্বাস,

সন্দেহ আর গালিগালাজে অতিষ্ঠ হন তিনি। জীবনটা তার কাছে বোঝার মতো লাগে। হয়ে পড়ে অর্থহীন। তাই সিদ্ধান্ত নেন চরম কিছু করার। অজানা ও না ফিরে আসার পথের যাত্রী হওয়ার। এই পথের যাত্রী হিসেবে সাথে নেন আদরে, স্নেহে, মায়ায় লালিত তিনটি কন্যাসন্তানকে। রাগে অপমানে ঘরে থাকা কীটনাশক ঔষধ পান করে জীবননাশ করার চেষ্টা করেন তিনি।

'মার কাছে পানি খাইতে চাইলে মা গুঁড়া গুঁড়া কি জানি পানিতে গুইললা আমাগো তিন বইনেরে খাওয়ায়। মায়ও খায় হেই পানি। পানি খাইয়াই ছোড বইন (জান্নাত) বমি করতে করতে ঘুমাইয়া পড়ে। আমাগোও খালি মাথা ঘুরায়। আর বমি বমি হয়। খালি প্যাডে ব্যথা করে। মায় খালি জোরে জোরে কান্দে। হেইর পর আর কিছু মনে নেই।'

হাসপাতালের বেডে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা এই কথাগুলো বলছিল সাত বছরের তামেমা। তার অপর বোন রাবেয়াও মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে মায়ার বোনটা তো যন্ত্রণা সইতে না পেরে আগেই পরকালের বাসিন্দা হয়েছে। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ ২৭/০৫/২০১১ইং]

এই আমাদের দেশ! আমাদের সভ্যতা। এভাবে হাসপাতালের বেডেই ছটফট করতে থাকবে আমাদের সভ্যতা? সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা? হে বিজ্ঞান! তুমি তোমার প্রযুক্তি ও উৎকর্ষ তুলে নাও। আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও গ্রামের সরল বধূটি। মাথায়

মাথাল বাঁধা, গলায় গামছা ঝোলানো সরল কৃষকটি। যে উৎকর্ষ আমাদেরকে সভ্যতার কাঙাল বানিয়েছে আমরা সেই সভ্যতার ঋণে আবদ্ধ হতে চাই না!

মুক্তবাসের প্রহারে রক্তাক্ত মানবতা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ وَلاَ ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ وَلاَ ضَرَبَ شَيْئًا بِيَمِينِهِ قَطُّ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তার স্ত্রীগণের কাউকে প্রহার করেন নি। কোনো খাদেমকে প্রহার করেন নি, এবং নিজ হাতে তিনি যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনও কাউকে আঘাত করেন নি।’ [শামায়েলে তিরমিযী : পৃষ্ঠা ২৩, সুনানে বায়হাকী : ১৩৩০২] এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামের আচরণ। নারী জাতির প্রতি তাঁর করুণার ধারা ছিল অফুরন্ত। নারীসত্তা বহুমাত্রিক। এ কারণে তিনি তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। বক্রতার যন্ত্রণা নিয়েই সংসার সমুদ্রে জীবনের দাড় টেনে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর একান্ত অপরাগ হলে কেবল তখনই শাসন, প্রয়োজনে বিছানা আলাদা করে দেয়া এবং একেবারে অপরাগ হলে তখন সামান্য প্রহার করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু অন্যায়ভাবে প্রহার করা কিংবা সীমাতিরিক্ত প্রহার করা অথবা সাধারণ অপরাধে ‘অসাধারণ’ প্রহার করার কথা ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলাম এসব অমানবিকতা কেবল ঘৃণাই করে না, তা সমূলে উচ্ছেদ করার দৃঢ়তম পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। আলোচ্য হাদীসে এই আদর্শই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অন্য

বহু হাদীসেও নারীদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ, কোমল ব্যবহার এবং সদাচারণের আদেশ দেয়া হয়েছে।
কিন্তু আমাদের সমাজ সংসার থেকে হৃদ্যতা, সহমর্মিতা, প্রেম-প্রীতি আর দয়া-মায়া দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে কিংবা মুমূর্ষ রোগীর মতো আখেরী সালাম জানিয়ে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। আমার কথায় হয়ত অতিরঞ্জন থাকতে পারে। তবে বাস্তবতা আমাকে এমন তিতা-কড়া কথা বলতে বাধ্য করে। আমি অক্ষম! আমি অপরাগ!!
আর এই পরিস্থিরি জন্য সিংহভাগ দায় পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা, নৈতিকমূল্যবোধের অভাব এবং মুক্তবাসের। শেষোক্ত কারণে এমন সব ঘটনা ঘটে চলেছে যা শুনতেও ইচ্ছা করে না বলতেও ইচ্ছা করে না। তবু তা শুনতে বাধ্য হই এবং নির্দয়ভাবে অন্যকে শোনাতে যাই। যদি তাতে সবাই পথে ফিরে আসে...
এবার আসি ঘটনার মূলে :
নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার পঞ্চবটি হরিহরপাড়া। সুদর্শন স্কুলছাত্রী মাহমুদা এই গ্রামেরই বাসিন্দা। স্কুলের পাঠ চুকাবার আগেই শিক্ষানবিশের আরেক মিছিলে যোগ দিয়েছেন তিনি। এতো মিছিল নয়, শোভাযাত্রা নয়- শবযাত্রা! হরিহরপাড়ার পার্শ্ববতী গুলশান রোডের মনসুর মিয়ার ছেলে সোহাগের আহ্বানে তিনি এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, জড়িয়ে পড়েছিলেন ছিন্ন করতে অক্ষম মায়াজালে। জাল থেকে বিয়ের পিঁড়ির এই সুদীর্ঘ ও বন্ধুর পথপরিক্রমায় মাহমুদার কোনো অভিভাবক সাথে ছিল না।

গিরিখাদ থেকে পা হড়কে সরাসরি মৃত্যুখাদে পতিত হওয়ার যে সমূহ আশঙ্কা ছিল তাতেও তার কোনো রাহবর ছিল না। ফলে জীবনের চলার পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়েছে। তাই আজ ধ্বংসস্তুপে খুঁজে ফিরতে হচ্ছে মাহমুদার বিলুপ্ত অস্তিত্ব! মাহমুদা এক্ষেত্রে দুটি ভুল করেছিলেন।

এক. জীবনসঙ্গী বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে একাকী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অথচ এটা এমন ভয়ানক ও পিচ্ছিল পথ, যাতে হাজার জনকে সাথে নিয়ে পথ চলতেও গা ছমছম করা ভয় চেপে ধরে। পদে পদে ভূপতিত হওয়ার আশঙ্কা কাজ করে। মা বাবা ও মুরুব্বীদের আঁখিজল মেশানো দুআ সত্ত্বেও ভবিষ্যত শঙ্কা গা চেপে ধরে। সেক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত নেয়া কতটুকু নিরাপদ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

দুই. পদ্ধতিতে ভুল করার সাথে সাথে তিনি লোক নির্বাচনেও ভুল করেছিলেন। তিনি সোহাগের বাইরের রূপটাই শুধু দেখেছিলেন। ভেতরের ও মুদ্রার আসল রূপটা দেখার চেষ্টা করেন নি। যদি ভালো করে দেখতে যেতেন তাহলে বিয়ের পরে নয় আগেই দেখতে পেতেন যে, সোহাগ একজন নেশাখোর ও বখাটে যুবক। যাদের অত্যাচারে জর্জরিত আমাদের সমাজ, দেশ ও নারীসত্তা। কিন্তু প্রেমের তীব্রতা মাহমুদার দৃষ্টি থেকে সোহাগের আসল চেহারাটা আড়াল করে রাখে। কল্পিত জীবনসঙ্গীর দোষ খুঁজে বেড়ানোটাকে ভালোবাসার অমর্যাদা বলে মনে হয়। কিন্তু করণীয় যথাসময়ে না করায় জীবনে দেখা দেয় চরম দুর্ভোগ। বিয়ের আগে

যাচাই না করলেও বিয়ের পর যাচাই করা ছাড়াই পঁচা বস্তুর মতো সোহাগের আসল পরিচয়টা ভেতর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে।

হাদীসে নেশাকে 'উম্মুল খাবায়েছ' বা সব খারাবীর জননী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই খারাবীর সবটাই যেন ভর করে আছে সোহাগের ওপর। তাই যে মাহমুদাকে ভালোবেসে বিয়ে করে এনেছিল, অল্পদিনেই সেই মাহমুদার প্রতি খড়গহস্ত হয় সে। ভালোবাসার মানুষের প্রতি ভালোবাসার রূপসুষমা জাহির করার পরিবর্তে পশুত্বের হিংস্রতা ফলায় অহর্নিশ।

নিজ থেকে বিয়ে করায় মাহমুদার পরিবার এই বিয়েকে প্রথমে মেনে নিতে পারে নি। অবশ্য এটাকে দোষেরও বলা যায় না। মা বাবা সন্তান জন্ম দেবেন, দুঃখ-কষ্ট করে লালন পালন করবেন আর বিয়ের সময় তাদের অমতেই সন্তানরা বিয়ে করে অন্যের হাত ধরে চলে যাবে- এটা কি মেনে নেয়ার মতো বিষয়? পৃথিবীর কোনো আদালতে দাঁড়িয়ে কোনো বাদী কি এ কারণে কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে? সঙ্গত কারণেই মাহমুদার এই আচরণে তার পরিবার খুশি হতে পারে নি এবং এর ফলে তারা বিয়ের কোনো অনুষ্ঠানও করে নি। সোহাগের অশুভযাত্রার শুরু এখান থেকেই। সে এ নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধাতো মাহমুদার সাথে। নেশায় আচ্ছন্ন লোকটা বুঝতেই চাইত না যে, সে মাহমুদাকে সরল পথে বউ করে ঘরে তোলে নি। মা বাবার বুক থেকে এক প্রকার জোর করেই সে তাকে কেড়ে নিয়ে এসেছে। অতএব, এসব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান-আয়োজনের চিন্তাটা মাথা থেকে

ফেলে দাও। কিন্তু তা মানে না সোহাগ। ফলে থেমে থেমে চলতে থাকে ঝগড়া, মারধর ও গালাগাল।

কন্যার ওপর চালিত অত্যাচারের সংবাদ পৌঁছতে দেরি হলো না মা-বাবা পর্যন্ত। সন্তান মা বাবাকে যতই কষ্ট দিক তারা কখনও প্রতিশোধ নেন না। বরং সন্তানের বিপদে, বেদনায়, দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হয় তাদের মন। মুহূর্তে ভুলে যান তারা সন্তানের অপরাধ। পাহাড়প্রমাণ অপরাধ করলেও নিমিষে তা ভুলে সন্তানকে বুকে তুলে নেন তারা। তাই পিতা মুফিজুল ইসলাম কন্যার এমন কষ্টের কথা শুনে মর্মাহত হলেন। নিজের ওপরই রাগ হলো তার। তার অভিমানে দগ্ধ হচ্ছে মেয়েটি! না আর হতে দেয়া যায় না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ধুমধাম আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেয়েকে পুনরায় স্বামীর ঘরে পাঠাবেন তিনি। কিন্তু সোহাগের তাতেও তর সয় না। সে পূর্বের মতোই দানবীয় আচরণ করতে থাকে।

০৯-০৮-১০ইং তারিখে মাহমুদা স্কুলে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা শেষ করে বাসায় ফেরার পর আবার ঝগড়ায় লিপ্ত হয় সোহাগ। এক পর্যায়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মাহমুদাকে আটকে রাখে সে। এভাবে গড়িয়ে যায় বেলা। কিন্তু দরজা খোলা হয় না। শঙ্কা বাঁধে মনে। শুরু হয় দরজা ধাক্কাধাক্কি। কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ফেলা হয়। ভেতরে গুমোট পরিবেশে নিস্তব্ধ শূন্যতায় ফ্যানের সিলিঙের সাথে ভেসে থাকতে দেখা যায় মাহমুদাকে। উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয় তাকে। কিন্তু এর আগেই

দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছেন তিনি। এখন শুধু ঘোষণাটা বাকি। কর্তব্যরত ডাক্তারগণ সেই অবশিষ্ট কাজটাই সমাপ্ত করলেন। [তথ্যসূত্র : দৈনিক যায় যায় দিন ১১/০৮/১০ইং]

নিহত মাহমুদার শরীর জুড়ে আছে আঘাতের ভয়াবহ চিহ্ন। এ কীসের চিহ্ন? কীসের দাগ? এ আমাদের ঘুণেধরা সমাজের বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খল ও মুক্তবাসের বিষাক্ত ছোবল ও নির্মম কষ্টের দাগ।

ছেলে-মেয়েরা আজ নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক সেজে বসে আছে। তাই পিতামাতা ও অভিভাবকদের অমতে, অনিচ্ছায় নিজ পছন্দে, ভালোবাসা করে বিয়ে করছে। এক্ষেত্রে কল্যাণকামী অভিভাবক বাধ সাধলে তারা তাদেরকে পথের কাঁটা মনে করছে। হে যুবক! মনে রেখো, সুখ আর কল্যাণ নিজে রচনা করা যায় না। কিংবা যার মধ্যে সুখ আছে বলে এখন খালি চোখে দেখতে পাচ্ছো, বাস্তবতার চশমা পরলে তাতে কল্পিত সেই সুখের টিকিটিও না পাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই এই বন্ধুর পথে, সংকীর্ণ গলিতে একা হাঁটতে যেও না। মা-বাবা এবং অভিভাবককে সাথে নাও। দেখবে তাদের নেক দুআর ফসল জীবন্ত অস্তিত্ব হয়ে তোমার সুখের উঠানে এসে গড়াগড়ি আর লুটোপুটি খাচ্ছে!

সম্ভ্রমহানীর কাঠুরিয়া

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক দেশের সাথে আরেক দেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এই সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে এক দেশের সাথে আরেক দেশের বোঝাপড়া ঠিক থাকে। ফলে বিশ্বে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। এমনিভাবে এক দেশের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আনুষঙ্গিক অবস্থা অন্য দেশে তুলে ধরার রীতিও চলে আসছে সেই আবহমান কাল হতেই। এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয়েছে দূতিয়ালি ব্যবস্থা। এক দেশের রাষ্ট্রদূত অন্য দেশে বাস করে। নিজ দেশের স্বীকৃতি, কৃতিত্ব, সুনাম সেই দেশে তুলে ধরে বিশ্ব মানচিত্রে নিজ দেশের ভাবমর্যাদা তুলে ধরার চেষ্টা করে।

এখনকার মতো স্থায়ীভাবে দূত নিয়োগের মতো রেওয়াজ পৃথিবীর উষালগ্নে চালু না থাকলেও দূত ব্যবস্থা চালু ছিল। দূতের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বার্তা প্রদান করা হতো। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তৎকালীন বিশ্বের প্রতাপশালী রাষ্ট্রগুলোতে দূত প্রেরণ করেছিলেন। এসব দূত ছিলেন চরিত্র, আদর্শ ও সভ্যতার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ, সাহস, বীরত্ব ও দেশপ্রেম দেখে বহু রাষ্ট্র প্রভাবিত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করেছেন হাজার হাজার মানুষ আর স্বার্থক ও সফল হয়েছে দূত প্রেরণের মহান উদ্দেশ্য। দূতদের আনীত বার্তা যে সুন্দর, শান্তিময় তা দর্শক ও আহুতরা দূতদের দেখেই বুঝতে পেরেছে।

একটি দেশের সভ্যতার গভীরতা কতটুকু তা নির্ণীত হয় এ দূতদের চেহারা-সুরতেই। তাই তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষে দেশের যেমন সুনাম তেমনি নোংরামী ও লাম্পট্যে দেশের রসাতল অবস্থা। চারিত্রিক অধপতন, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা আর কামনার লেলিহান শিখায় আমাদের দেশের ভাবমূর্তি অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। এটি এখন আর গোপন কোনো বিষয় নয়। ইজ্জতের যতটুকু বাকি আছে, তা খোয়ানোর কাজ করছেন আমাদের দেশের মান্যবার, মহামান্য হর্তাকর্তাগণ। তারা বিশ্ববাসীর সামনে আমাদের মুসলিম দেশটির গর্ব মিশিয়ে দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। এমনি এক বার্তা, জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত একে এম জাহিদুর রহমানের (ছদ্মনাম) কীর্তিগল্প শুনুন :

এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিশালী ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশ জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের একমাত্র আণবিক বোমার আঘাতে জর্জরিত হওয়ার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু বোমার সেই দগদগে ক্ষত দেহে রেখেই তারা জাতীয় ঐক্য অটুট রেখে এগিয়ে চলেছে দেশ উন্নয়নের কাজে। এতে তারা সফলও হয়েছে। বিশ্বমানচিত্রে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তো একজন দূত এদেশে নিযুক্ত হলে নিজ দেশের সুনাম রক্ষা করবেন এবং সেই দেশের ভালো গুণগুলো নিজ দেশে আমদানি করবেন। এটাই তার কাছে দেশবাসীর চাওয়া। কিন্তু তিনি তা না করে কী করলেন? এক কথায় আমাদের জাত মেরে দিলেন তিনি!

২০১০ইং ১৩ আগস্ট জাপানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজে যোগ দেন জাহিদুর রহমান। নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রদূতগণ সপরিবারে কর্মক্ষেত্রে থাকার সুবিধা পান। কিন্তু একদম বৈরাগ্যের মতো সুযোগ হাত ছাড়া করলেন জাহিদুর রহমান। তার এই বৈরাগ্য খ্রিস্টান পাদ্রীদের মতো, যারা সারা জীবন বিয়ে না করে যাজকগিরি করে আর গির্জায় বসে বসে শিশুদের অকালে সতীচ্ছেদ করে। বিশ্বে শিশু ধর্ষণের জন্য যদি কাউকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার রীতি গড়ে ওঠে তবে নির্বাচকদেরকে অন্তত এক্ষেত্রে কোনো কষ্ট করতে হবে না। নির্দ্বিধায় তারা খ্রিষ্টান যাজকদেরকে নির্বাচিত করতে পারবেন! পাদ্রী থাকতে কেউ এই পুরস্কার নেয়ার সাহস করতে পারে! যাদের বিবাহ করার অনুমতি নেই, তারা তো অবৈধ পথেই জৈবিক চাহিদা মিটিয়ে নেবে!

থাকগে সে কথা। জাহিদুর রহমান সাহেবের কথায় আসি। তিনি জানালেন তার স্ত্রী মানসিক রোগী। তাই তাকে সাথে নিলে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে। কিন্তু এটা তার দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয় ছিল না। ছিল কুপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়। ব্যাপারটি প্রকাশ পেতে সময় নেয় নি।

২০১১ইং সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি নিজের স্যোশাল সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেন স্থানীয় জাপানী তরুণী কিয়োকো তাকাহাসিকে। চাকরিপ্রার্থী তাকাহাসি ১০ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদূত একে এম জাহিদুর রহমানের সামনে প্রথম ইন্টারভিউ দেন। প্রথম ইন্টারভিউতেই তিনি আমাদের মুসলিম জাতি সত্তাটাকে

চরম ঠেঙ্গানী খাওয়ান। তিনি তাকাহাসির কাছে জানতে চান, তুমি কি কাজ শেষে আমার সাথে চা খেতে পারবে? পরবর্তী প্রশ্ন ছিল আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারি?!

এ প্রসঙ্গে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তাকাহাসি বলেন- ইন্টারভিউয়ের অভিজ্ঞতা না থাকায় ভেবেছিলাম এধরনের অনুরোধ হয়ত বাংলাদেশের সংস্কৃতিরই একটা অংশ। তিনি জানান, চাকরির দ্বিতীয় ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং সেদিনের প্রশ্ন ছিল- তুমি কি অবিবাহিতা? তোমার কি কোনো প্রেমিক আছে?

এরপর ২১ই ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ইন্টারভিউয়ের জন্য তাকে ডাকেন রাষ্ট্রদূত। সেদিন আগের প্রশ্নগুলো পুনরুল্লেখ করেন তিনি। তাকাহাসির ভাষায়, ইন্টারভিউতে এধরনের অভিজ্ঞতা না থাকায় ভেবেছিলাম, এধরনের অনুরোধ হয়ত বাংলাদেশের সাস্কৃতিরই অংশ। তিনি আরও জানান, ইন্টারভিউতে রাষ্ট্রদূত দৈহিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তাকাহাসির ভাষ্যানুযায়ী চাকরিতে যোগ দেয়ার প্রথম দিনেই ২৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদূতের কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানান।

তিনি অন্য যে কোনো বিদেশীর চেয়ে আমাকে বেশি জোরে চেপে ধরেছিলেন। সেদিনই অফিসে তার সঙ্গে চা পান করতে হয় আমাকে। পরদিন ২৬ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদূত আমাকে নিয়ে তামাগাওয়া নদী ভ্রমণে গিয়ে একটি নির্জন গাছের নিচে বসেন।

বলেন, আমি কি তোমাকে চুমু খেতে পারি। আমি না বলেছিলাম। কারণ, আমাদের দেশে বস পর্যায়ের কারও সাথে এধরনের সম্পর্ক বৈধ নয়। কিন্তু তিনি আমাকে এ কাজে বাধ্য করেছিলেন। ২৮ই ফেব্রুয়ারি অফিসে ঢুকেই তিনি কক্ষের দরজা বন্ধ করে আমাকে আলিঙ্গন করেন এবং চুমু খান। অফিস চলাকালীন বহুবার রাষ্ট্রদূতের এমন আচরণে আমি শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠি।

তাকাহাসি তার অভিযোগনামায় আরও উল্লেখ করেন, মার্চ মাসে আমাকে তার সাথে ডেট করার জন্য কাসাইরিনকারি পার্কে নিয়ে যান। পার্কে হাঁটতে হাঁটতে তিনি আমাকে বলেন, গত আড়াই বছরে কারো সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক হয় নি। পরোক্ষভাবে তিনি আমার কাছে শারীরিক সম্পর্কের অনুমতি চান। আমি নেতিবাচক উত্তর দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে জানান, স্যোশাল সেক্রেটারি হিসেবে তাকাহাসির চাকরির শর্তই হলো শারীরিক সম্পর্ক। এটা না করলে চাকরি থাকবে না। তাকাহাসি উল্লেখ করেন, সেদিন পার্কে হাঁটাহাঁটি ও চুম্বনরত অবস্থায় এক বাংলাদেশী আমাদের ছবি তোলে। তাতে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, এরা ঢাকার মিডিয়ায় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করতে পারে।

তখই আমি বুঝতে পারি রাষ্ট্রদূত আমার সাথে যা করছেন তা বাংলাদেশের কোনো সাংস্কৃতিক বিষয় নয়। তবে ছবি তোলা দেখেও তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় নি। তিনি আমার সাথে

শারীরিক সম্পর্কে স্থাপনের জোর চেষ্টা চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তিনি আমাকে প্রস্তাব দেন আমি যেন একজন জাপানী তরুণী খুঁজে দেই তাকে। আমি তাকে জানাই, আমার এধরনের কোনো বান্ধবী নেই। এরপর থেকে আমি সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকি। কেননা তিনি তার পদের বলে যে কোনো অভিযোগ এড়িয়ে যেতে পারবেন।

তাকাহাসি বলেন, রাষ্ট্রদূতের সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার পর তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং জানিয়ে দেন, আমাকে তার স্যোশাল সেক্রেটারির পদে রাখা সম্ভব নয়। পাশাপাশি তিনি তার নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য কোনো প্রমাণও রাখতে চান নি। একারণে তিনি আমার কাছে থাকা সব ডকুমেন্ট জমা দিতে বলেন। কিন্তু আমি তা করি নি। কারণ, আমি নিশ্চিত ডকুমেন্ট নষ্ট করলে তিনি উল্টো আমার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলবেন। তিনি ও দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা আমার ভুল ধরে আমাকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের পথ খুঁজছেন। বাংলাদেশী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে আমি জাপানি আদালত ও মিডিয়ায় যাব।

বাংলাদেশী একজন কামুকের এমন নির্লজ্জপনায় কূটনৈতিক মহল ও স্থানীয় জাপানী কমিউনিটিতে আলোড়ন তুললে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ৮ই মে জাপানে যান এবং তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পান। [তথ্যসূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ৬/৬/১১ইং]

অবশ্য জাহিদুর রহমান এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ১৪ই তারিখের আমার দেশ পত্রিকায় জানিয়েছে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

হায় আক্ষেপ! একজন রাষ্ট্রদূত গোটা দেশের প্রতিনিধি। কিন্তু তিনি আমাদের এ কীসের প্রতিনিধিত্ব করলেন? তিনি কি আমাদের রিপুর প্রতিনিধিত্ব করলেন? কত বড় আক্ষেপের কথা, তাকাহাসি ও জাপানীদের অন্তরে তিনি এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যে, পরনারীকে চুম্বন করা বাংলাদেশের সাংস্কৃতির অংশ! হায়! আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী। মুসলিম বিশ্বে আমাদের এনিয়ে কত গৌরব। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের রিপুর তাড়নায় এভাবেই ধ্বসে পড়ল আমাদের গৌরবের দেয়াল? আমরা শেষ পর্যন্ত বহিঃবিশ্বে কামুক জাতি হিসেবে চিহ্নিত হলাম? এই কি ছিল রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব?

অথচ আমাদের গৌরবময় মুসলিম শাসনের ইতিহাসে রাষ্ট্রদূতদের ইতিহাস ছিল কত গৌরবময়! বিশ্ব বীর রুস্তমের কাছে মুসলিম দূত গমন করলে তিনি তাকে বললেন, আপনারা এখানে এসেছেন কেন? দূত স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে বললেন- আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর গোলামীর সাথে যুক্ত করতে এসেছি! এসেছি কুপ্রবৃত্তি থেকে মানুষকে বের করে আনতে।’

কত বীরত্বময়, গৌরবগাঁথা, স্মরণীয় প্রতিনিধিত্ব! রিপুর তাড়নার কাছে আমরা এভাবেই পরাস্ত হতে থাকব? কামনার আগুন আর

মুক্তবাসের দাবানলে পুড়তে থাকবে আমাদের গৌরবের কীর্তিঘরগুলো?

কল্পিত ভালোবাসার করুণ উপসংহার

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

«يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ»

‘মুমিনের স্বভাবে সব রকমের গুনাহ থাকতে পারে। কিন্তু দুটি গুনাহ নয় প্রতারণা ও মিথ্যা।’ [মুসনাদে আহমাদ : ২২১৭০; মুসান্নাফ : ৩০৩৩৯]

কল্পনার শীর্ণতায় যদি কারও জীবন নাশ হয়, বিবেচনার দীনতায় যদি কাউকে নির্মম ভাবে জীবন দিতে হয় তাহলে সেই কল্পনা আর বিবেচনার জন্য আক্ষেপ হয় বৈকি! নারীসত্তা পৃথিবীর দুর্বলতম বস্তুর অন্যতম। এই দুর্বল বস্তুর ওপর কতজন যে কতভাবে নিজেদের স্বার্থের বাঁধ নির্মাণ করে তার ইয়াত্তা নেই। সেই বাঁধের ভারে নুয়ে পড়ে নারীর জীবন। ধ্বংস হয় তাদের সুখকল্পনা, ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় তাদের আশার মিনার।

কিশোরগঞ্জের দুই তরুণীর ঘটনা। দুজন নারী সেদিন ঢাকার এক হোটেলে এক সাথে প্রাণ দিয়েছিলেন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ঢাকাবাসীর বর্জ্যভাগাড়ে। এ এমন নির্মম ঘটনা যার তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন। এরূপ একটি ঘটনাই একটা সমাজের রূপ পাল্টে দেবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের অনুভূতিবোধ এত নিষ্ক্রিয় যে,

সমাজের ঘটমান এসব হাজার ঘটনাও আমাদেরকে জাগাতে পারছে না।

‘সম্ভবত বেলা বারোটা তখন। আমার পরীক্ষা ছিল, তাই পড়ছিলাম। সুমি আপু মাকে বলে তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেল। আমাকে বলে গেল, রুনি, আমি উর্মিকে নিয়ে বিউটিপার্লারে যাচ্ছি। দেখবি আজ খুব সুন্দর করে সেজে আসব।’ কিন্তু সেই সেজে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি সুমির। অভিশপ্ত মুক্তবাসের জীবন কেড়ে নিয়েছে ঘরে ফেরার চিরন্তন আশা।

ঘটনাটি ২০০৮ সালের ১৬ই জুলাইয়ের। আফরোজা আক্তার সুমি ও আফরোজা আক্তার ঊর্মি দুই বান্ধবী। দুজনেরই বাড়ি কিশোরগঞ্জ শহরে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে লেখাপড়া করেছেন।

মুঠোফোনের মাধ্যমেই উভয়ে জড়িয়ে পড়েন প্রেমের সম্পর্কে। তাদের দুই প্রেমিক শামীম হাওলাদার (৩৬) ও মনিরুজ্জামান ওরফে হলুদ মিয়া (৩৪)। সুমির সাথে মুঠোফোনে শামীম হাওলাদারের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। শামীম বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। চট্রগ্রামের লালখান বাজারে একটি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর দোকানের পরিচ্ছন্ন কর্মী। কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক তৈরির সময় সে তার পরিচয় দেয় ইলেক্ট্রিক কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে। তার বাড়ি ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার কাওখারা গ্রামে।

একইভাবে আফরোজা উর্মির পরিচয় হয় কিশোরগঞ্জ পুলিশ লাইনের কনষ্টেবল মনিরুজ্জামান ওরফে হলুদ মিয়ার সাথে। হলুদ

মিয়া নিজেকে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলে পরিচয় দেয়। তার বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হাটবারেঙ্গা গ্রামে।

এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাহলো, পরস্পরের মধ্যে দেখা করার তাড়না সৃষ্টি হওয়া। তাদের বেলায়ও ব্যত্যয় ঘটল না। এই জুটিদ্বয় পরস্পরের মধ্যে দেখাদেখির পর্বটা সেরে নিলেন। আর এই দেখাদেখির পর্বেই মনিরুজ্জামান ও শামীমের মধ্যে যোগাযোগ হয় এবং তারা একে অপরের ফোন নম্বর বিনিময় করে।

সত্য বেশিদিন চাপা থাকে না। পৃথিবীর অন্যতম শাশ্বত বাস্তবতা এটি। সেই ধারাবাহিকতায় উর্মি ও সুমি তাদের মনের মানুষের আসল পরিচয়ে পরিচিত হয়। এই পরিচয়ের পর তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ঠিক ইয়াহূদীদের মতো। আল্লাহর বিধান না মানার কারণে তাদের ওপর তুর পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুমি ও উর্মিও কী তবে সেই কঠিন বোঝার বাহক? দুষ্ট ইহুদীরা পরামর্শ করেছিল, তারা পালাক্রমে পাহাড় মাথায় করে রাখবে, তবু নবীর কথা শুনবে না, আল্লাহর বিধান মানবে না। কিন্তু উর্মিরা কী পারবে দুষ্টবুদ্ধির এমন অসাধ্য কাজ করতে? মনিরুজ্জামান আর শামীমরা তাদের ওপর মিথ্যা ও ছলনার যে পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে তা দীর্ঘদিন বহন করা কি তাদের জন্য আদৌ সহজ হবে? এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই কেটে যায় বেশ কিছুদিন।

ওদিকে প্রেমিক ব্যাটাদেরও তো মানসম্মানের ব্যাপার বলে কথা আছে! কোম্পানি কর্মকর্তা আর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের ফাঁক

গলে যখন পরিচ্ছন্নতা কর্মী আর কনস্টেবলের পরিচয়টা বের হয়ে আসে তখন আর তারা বিষয়টিকে মর্যাদার জন্য নিরাপদ মনে করে না। ফলে কথিত প্রিয় মানুষদেরকে নিয়ে চরম ও জঘন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে তারা। পরিকল্পনা মোতাবেক ২০০৮ সালের জুলাই মাসে উর্মি ও সুমি দুই বান্ধবীকে কিশোরগঞ্জের একটি বিউটি পার্লার থেকে বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। নারীসত্তার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। এধরনের ভয়ানক একটি ফাঁদে দুইজন তরুণী পা দিলেন কিন্তু একজনও পরিণতির ভয়াবহতার কথা চিন্তা করলেন না কিংবা পরিবারের সদস্যের সাথে বিষয়টি আলোচনা করলেন না। যার পুরো সুবিধা গ্রহণ করল প্রতারক লোক দুটি। তারা মিথ্যা পরিচয়ে মেয়ে দুটিকে নিয়ে কারওয়ান বাজারের ওয়েস্টার্ন গার্ডেন হোটেলে ৩০৬ ও ৩০৭ নম্বর কক্ষে আশ্রয় নেয় এবং রাতে প্রেমিকাদের শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে কক্ষ দুটিতে তালা দিয়ে খাবার আনার কথা বলে হোটেল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর হোটেলের দুই মালিক আঃ খালেক ও রানা এবং ব্যবস্থাপক আবুল মিয়া খুনের কথা পুলিশকে না জানিয়ে লাশ দুটি সব্জির ঝুড়িতে ভরে একটি ঝুড়ি মগবাজার হাতিরঝিলের পানিতে ফেলে দেয় এবং অপর ঝুড়ি তেজগাঁও রেলষ্টেশনের পাশের ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। [তথ্যসূত্র : কালের কণ্ঠ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ইং]

হায় আক্ষেপ! মোহ আর ভালোবাসার রূপকথা এভাবে দুজন তরুণীকে করুণ পরিণতিতে ভোগালো? কী মর্মান্তিক এই আখ্যান! মিথ্যার জাল বিছিয়ে, প্রতারণার ফাঁদ পেতে কীভাবে নারীজাতিকে ধ্বংস করে চলেছে সম্ভ্রমখেকো পুরুষগুলো! আর নারীরাও অবলার মতো নিজেদেরকে ধ্বংসের ভাগাড়ে নিক্ষেপ করছে। তাদেরকে কে বোঝাবে যে, তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসা জীবনের অপরিহার্য কোনো অংশ নয়? বরং এগুলো হচ্ছে একটা মোহ। আর মোহ মানেই সাময়িক উত্তেজনা। এই সাময়িক উত্তেজনার কাছে কি বাস্তবতা বন্ধক থাকতে পারে? বহু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে মোহ কেটে যাওয়ার পর পূর্বের মোহের কারণে আক্ষেপ করতে দেখেছি। বাস্তবতার কাছে হার মানতে দেখেছি। তারা নিজেরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এটাই বাস্তবতা। মোহ কল্পনা, আর জীবন বাস্তব। আর বাস্তবতার কাছে কল্পনা হার মানতে বাধ্য।

প্রযুক্তির সৃষ্টিগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য করা হয়। কিন্তু তার ভুল ব্যবহার হলেই তা অনাসৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ বাস্তবতা একথা বলাতে বাধ্য করছে যে, মোবাইলপ্রেম আপনাকে সমৃদ্ধ করছে না, শূন্য করছে।

এক্ষেত্রে তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদেরকে নিজ গরজে সচেতন হতে হবে। একথা তাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মোবাইল ফোন জীবনের অনুষঙ্গ, কখনই জীবনের জন্য অপরিহার্য নয়। বিরক্তিকর বা অপরিচিত কলগুলোতে মজা করার কথা না

ভেবে এড়িয়ে চলা উচিত। তাহলে জীবনের অনেকাংশই নিরাপদ হয়ে যাবে।

মানুষমাত্রই ভুল করে। আর এই বয়সটায় এধরনের ভুল ও পদস্খলন হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। তাই কোনোভাবে অবাঞ্ছিত এই সম্পর্ক হয়ে গেলে সেটা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। তার নিজের কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত যে, আমি ভুল করছি না তো। এরূপ হয়ে গেলে পরিবারকে পর না ভেবে তাদেরকে আপন ভাবুন। মা-বাবা অথবা ভাই-বোনের সাথে মন খুলে আলাপ করুন। এসব সম্পর্কের ভালোমন্দ দিক তাদের সাথে শেয়ার করুন।

যুবক-যুবতীদের সাথে সাথে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। এধরনের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিশোর-কিশোরীরা। তাই অভিভাবকদের অবহেলা তাদের জীবনকে অধিক দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিনোদনের সুযোগ কম এবং বেকারত্বের থাবাও প্রবল। তাই কেউ কেউ বিনোদনের স্বাদ নিতে কিংবা বেকারত্বের দুঃখ ভুলতে মোবাইলের মাধ্যমে উচ্ছৃংখল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই পরিবারের লোকদের উচিত এসব যুবক-যুবতীর প্রতি খেয়াল রাখা। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, দুটি মেয়ে এক সাথে পলায়ন করেছে। আসলে পরিবারের লোকদেরকে যদি সন্তানরা আপন ভাবে, তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে তবে তাদের

মনে এধরনের চিন্তা আসবে না এবং পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এধরনের পদক্ষেপও কখনও নেবে না।

এমনিভাবে অভিভাবকের বেখেয়াল, অসচেতনতা সন্তানকে জেদি আর অসংযমী করে তোলে। তাই এধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে অবশ্যই অভিভাবককে সচেতন হতে হবে। আর সব সময় শাসনের লাঠি ব্যবহার না করে কৌশলে তাদেরকে বশে রাখার প্রয়াস পেতে হবে।

এ ধরনের ঘটনায় ছেলেমেয়েরা সাধারণত খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তারা অজান্তেই ফাঁদে পা দেয়। তাই অভিভাবকদের একটু বেশি সচেতন হতে হবে। সন্তানের বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই মা-বাবার উচিত সন্তানের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া। তাদের গতিবিধি ও চলাফেরার দিকে খেয়াল রাখা। সন্তান জন্ম দেয়া সহজ কিন্তু মানুষ এবং আদর্শবান করে গড়ে তোলা কঠিন বৈকি! স্বাধীনতার মতো। যা অর্জন করা সহজ কিন্তু ধরে রাখা কঠিন।

কফিন কল্পনা

এক.

প্রবাসী স্বামীর কফিন কল্পনায় আচ্ছন্ন থাকতেন ফারজানা (ছদ্মনাম)। আশায় থাকতেন কবে শুনবেন সড়ক কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় স্বামীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কফিনে ভরে লাশ ফিরে আসছে- সেই আশায়। দীর্ঘ দেড়টি যুগ কাটল এই আশায় আশায়!

অনেকে হয়ত অবিশ্বাস করবেন কথাটা। কেউ কেউ লেখকের মস্তিষ্ক সুস্থতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এর কোনোটাই করতে হবে না আপনাকে। আমাদের সমাজে কত অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে। হয়ত দেখার আগে আপনি তা বিশ্বাস করতে চান না। দেখার পরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতেই হয়**। এমনই অবিশ্বাস্য কিন্তু বাস্তব ঘটনায় মোড়া আমাদের বর্তমান সমাজ**!

দিনাজপুরের এই মেয়েটি বাবার খুব আদরের সন্তান। অত্যন্ত চঞ্চল আর দূরন্ত। বাবা তাকে অত্যধিক স্নেহ ও মায়া করেন। সারা সময় ধরে মেয়েটি খেলা করে বেড়ায়। গাছের মগডালে উঠে বসে থাকে। তবে পরীক্ষার সময় ভালো ফলাফল করে। এভাবে মেট্রিক পাশ করার পর ফারজানা (ছদ্মনাম) মামার কাছে ঢাকায় চলে আসে। এখানে এসেই শুরু হয় সেই অবাঞ্ছিত জীবনের পথে পা মাড়ানো।

ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হন ফারজানা। বহুদিন আগে ভার্সিটিরই এক ছাত্রের লেখা 'ভার্সিটির মেয়েরা' নামের বইটি পড়ে ভার্সিটির মেয়েদের হালহাকিকত সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সে প্রসঙ্গে আর যেতে চাই না। ভার্সিটির ক্যাম্পাস আর আশেপাশের এলাকাগুলো যেন অবাধ চারণভূমি। এখানে যে যা খুশি তাই করতে পারেন। কেউ কাউকে বাধা দেয়ার মতো অযথা বোকামী করতে যান না। এমন মুক্তবাসের ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়ে অবাক হয়ে যান ফারজানা। গ্রামের এই সরল মেয়েটির কাছে প্রথম প্রথম শহরের হাবভাব অদ্ভুত লাগে।

ভার্সিটির ক্যাম্পাস এলাকা তার কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর আঙিনা হয়ে ধরা দেয়! তবে ঘোর কাটতে সময় লাগল না। তিনিও আর দশটি মেয়ের মতো জুটি যোগাড়ে সফল হলেন। ভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা একদিকে ব্যাচেলর আবার অন্য দিকে আজন্ম দাম্পত্য জীবন তাদের!

প্রথমে বড় বোনই তাকে একাজে সহায়তা করলেন। আজকাল তো প্রেম-প্রীতি ফ্যাশনের মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন একটা কাপড় কিনল তো অপর বন্ধু বা বান্ধবীকেও সেই কাপড় কিনতে উৎসাহিত করল। এভাবে একজন প্রেমে পড়ল তো অপরজনকেও ঝুটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ওর সাথে লেগে পড়ো...

একবার ভার্সিটিতে কী এক উপলক্ষ্যে আর্টের প্রদর্শনী করা হলো। ফারজানার বড় বোন (মামাতো) বললেন, তোকে আজ একটা লোক দেখাবো রে...
তখন থেকেই শুরু। বোনের দেখানো লোকটি সুদর্শন। ব্যস, বাহ্যিক রূপের কাছে অন্য নারীদের মতো ফারজানাও হার মানলেন। শুরু হলো অন্যদের মতো প্রেম দরিয়ায় সাঁতার কাটা। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর বিয়ের প্রসঙ্গ আসল। ফারজানার মা-বাবা নিম রাজি হলেন। কিন্তু প্রেম আর অন্যদের চাপাচাপিতে পুরো রাজি না হয়ে পারলেন না তারা। ফলে বিয়েতে রাজি হতে হলো। দিনাজপুরের গ্রামের বাড়িতে বিয়ে সম্পন্ন হলো। ছেলেকে দেখে বিয়ের আগেই স্নেহময়ী পিতা কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার মন বলছে, এই স্বামী নিয়ে তুই সুখী হতে পারবি না মা!
বাবার সেদিনের সেই আশঙ্কা কানে নেয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা ছিল না ফারজানার। তাই বাবার আশঙ্কা প্রেমের দুর্বার ঝড়ে হাওয়ায় উড়ে গেল। বিয়ের পর কেটে গেল বেশ কিছুদিন। ফারজানা লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন- এই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই কোল ভরাট করে সন্তানের আগমন ঘটল। জন্ম লাভের মাত্র একমাস পর সন্তানকে মায়ের কাছে রেখে ঢাকায় রওয়ানা হলেন ফারজানা। রাস্তায় কান্না চাপা রাখতে পারলেন না। মাত্র দেড় বছরের মেয়েটা প্রতি মুহূর্তে তার চোখে ভাসছে। বাসের সিট চোখের জলে ভেজাতে ভেজাতে ঢাকায় পা

রাখলেন তিনি। ঢাকায় এসে এবার মাথায় বাজ পড়ার মতো একটা সংবাদ কানে পড়ল তার। এক বান্ধবীর মুখে তার স্বামীর নেশা করার কথা শুনতে পেয়ে আকাশসম শূন্যতা তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করল। অস্পষ্ট হলেও বাবার সেই আশঙ্কাটা তার কানে বাজতে শুরু করল- এই ছেলেকে নিয়ে...

তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং সংবাদটা শোনামাত্র বিলম্ব না করে সোজা স্বামীর বাসা মগবাজারে চলে গেলেন। স্বামী সে সময় ঘুমিয়েছিলেন। ফারজানা তাকে জাগিয়ে তুলে বললেন, তুমি নাকি নেশা করো?

ক্লাশের টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমানো ছাত্রটি কোন দিন স্বীকার করেছে যে, সে ঘুমিয়েছে? নেশাখোররা তো আরও বড় অপরাধী। তারা অপরাধ স্বীকার করবে কেন? তাই ফারজানার স্বামীও নেশা গ্রহণ করার কথা স্বীকার করলেন না। উল্টো স্ত্রীর গালে পৌরষ ফলিয়ে সজোরে থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন। প্রিয় মানুষের এমন রুদ্রমূর্তি আর পরিণামের এমন অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে এলেন ফারজানা। রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ছিল বাবার সেই আশঙ্কার কথা- এই ছেলেকে নিয়ে...

সন্দেহ-সংশয় আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে এগিয়ে চলল তাদের জীবন। বৈবাহিক সম্পর্কের ভাঙনটা বেশ কয়েকবার আছড়ে পড়েছিল তাদের দাম্পত্যের জীবনপাড়ে। কিন্তু কী এক বাধার কাছে আটকে গিয়েছিল তা। প্রেম করে বিয়ে করা সুদর্শন লোকটাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে চাননি বলে ফারজানা বিয়ের

সম্পর্ককে দীর্ঘায়িত করেছেন। একপর্যায়ে জীবিকার সন্ধানে আমেরিকার পথে পা বাড়ালেন ফারজানার স্বামী। তার পেটে তখন দেড় মাসের নতুন অতিথি। আগত সন্তানের মুখ না দেখেই প্রবাসের পথে পা রাখতে হলো তার স্বামীকে।

আমেরিকা বস্তুজগতের মানুষের কাছে এক জীবন্ত স্বর্গ যেন! সেই স্বর্গে পা দিয়ে কী আর দুনিয়ার কথা মনে থাকে কারও? অন্য দশজনের মতো ফারজানার স্বামীর বেলায়ও তাই ঘটল। তিনি যেন ভুলেই গেলেন যে, দেশে একজন স্ত্রী, একটা মেয়ে এবং স্ত্রীর গর্ভে একজন নতুন অতিথি রেখে এসেছেন। ফলে স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ কমে গেল তার। স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচাপাতিও পাঠাতেন না তেমন। মাঝেমধ্যে দশবিশ হাজার টাকা পাঠাতেন। মাত্র একবার এক সাথে এক লাখ টাকা পাঠিয়েছিলেন। তাও ফারজানা তা জানতেন না। সে সময় তার শাশুড়ী অসুস্থ ছিল বলে তাকে দেখতে গেলেন। শাশুড়ী তাকে দেখে বললেন, হুঁ, টাকার গন্ধ পাইছো না!

ফারজানা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আম্মা আমি টাকার কথা জানি না। এসেছি আপনাকে দেখতে। এভাবে মাস, বছর পেরিয়ে যুগও পেরিয়ে গেল। কিন্তু স্বামীর দেশে ফেরার নাম নেই। সন্তান আর স্ত্রী পরিজনেরও খবর নেন না তিনি। জীবনটা অর্থহীন মনে হতে থাকে ফারজানার কাছে। এদিকে দুটি সন্তানকে নিয়ে তিনি পড়েন বিপাকে। তবে হাল না ছেড়ে তাদেরকে মানুষ করার কাজে লেগে যান। ফ্যাশন ডিজাইনের কাজ শেখেন তিনি। অল্পদিনে বেশ

অর্থকড়িও কামাতে সক্ষম হন। এক সময় তিনি নিজেই কয়েকটি দোকানের মালিক হন। উত্তরাতেও একটি শো রুম খোলেন। স্বামী পরিত্যক্ত বলে কেউ কেউ তাকে বিদ্রূপও করত। কিন্তু জীবনের তাগিদে আর সন্তানদেরকে মানুষ করার মানসে সে সব গা করার চিন্তা করতেন না তিনি। দীর্ঘ ষোলটি বছর কেটে যায় স্বামীর অবজ্ঞা, অবহেলা আর উদাসীনতার মধ্য দিয়ে। এই সময়টাতেই তিনি স্বামীর প্রতি মারাত্মক ক্ষিপ্ত হয়ে তার কফিন কল্পনা করতেন। ভাবতেন কবে তিনি তার অকৃতজ্ঞ স্বামীর সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ শুনবেন আর শুনবেন যে তার কফিন দেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে!

আহ্! কী নিদারুণ কল্পনা! একজন স্ত্রীর স্বামীর কফিন কল্পনা যে কত দুঃসহ বেদনার সাগর পাড়ি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অমানবিক, অবিশ্বাস্য হলেও একজন স্ত্রীর মধ্যে এধরনের কল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। আর মনে আছে তো, কেন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল? মুক্তবাসের জীবন সরল মেয়েটি ফারজানাকে ঢাকার আবওহাওয়া এমন কষ্টের এমন মরুপ্রান্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এর দায় একা ফারজানার না। যারা এই সরল মেয়েটিকে এ পথে টেনে এনেছিল, ছেলে বন্ধুর যোগাড় করে দিয়েছিল এবং যারা একে সমর্থন দিয়েছিল দায় তাদের সকলের। পাপের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা এই যে, সবাই তোমাকে পাপ কাজে উৎসাহ যোগাবে কিন্তু যখন পাপের দায়ভার গ্রহণ করার পালা আসবে তখন কাউকে আর পাশে পাবে না। যে ফারজানাকে

সকলে মিলে এই পথে টেনে এনেছিল তার বিপদের দিনে কেউ কি তাকে যথাযথভাবে সহায়তা করেছে? স্বামীর কফিন কল্পনার মতো কঠিন নির্মোহ জীবনে তাকে আশার বাণী শুনিয়েছে?

যাহোক, এভাবে কেটে গেল দীর্ঘ ১৬টি বছর। এরই মধ্যে ফারজানা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন। ঢাকার নামীদামী মার্কেটে তার পোশাকের দোকান গড়ে উঠেছে। স্বামীর অর্থ আনুকূল্য এখন তার কাছে অতীত। কাম্য শুধু তার সঙ্গটাই। কিন্তু তা থেকেও তিনি তাকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করেছেন। তাই মাঝেমধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে তার কফিন কল্পনাটা মাথায় চেপে বসে। এরই মধ্যে আমেরিকা থেকে একটা কল আসল। আমেরিকান এক পুলিশ কল দিয়েছে। পুলিশের পরিচয় পেয়েও মনটা নড়ে উঠল না ফারজানার। পুলিশ জানালো আপনার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তার লাশ আপনারা গ্রহণ করবেন কিনা? হায়! তার কল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবিত হলো! কিন্তু তিনি ভাবলেশহীন কণ্ঠে পুলিশকে জানালেন, লাশ আমেরিকাতেই দাফন করে দেয়া হোক।

স্ত্রী স্বামীর লাশ কবুল করতে না চাইলেও যে কোনো কারণেই হোক তার লাশ ঢাকায় আসে। জিয়া বিমানবন্দরে লাশ গ্রহণ করতে হাজির হন ফারজানা তার ষোল বছরে মেয়ে তন্দ্রা এবং চৌদ্দ বছরের ছেলে তারেক। ফারজানা সেদিন স্বামীর কফিনের সামনে কেঁদেছিলেন বটে, তবে সেটা স্বামীর শোকে নয়। ছেলেটি যখন পেটে ছিল তখন এই লোকটি জীবিত অবস্থায় এই

বিমানবন্দর দিয়েই আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। আজ ছেলে যখন দুনিয়া দেখা শুরু হয়েছে সেদিন সে দেশে ফিরে আসছে কিন্তু লাশ হয়ে! এই আমার ছেলের ভাগ্য? এসব ভেবে কেঁদেছিলেন ফারজানা।

তো ফারজানার 'আশা' দীর্ঘায়িত হয়েছে বটে কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। একজন মানুষের আশা আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘদিন অপূর্ণ রাখেন না। চাই সেই আশা অন্যের জন্য যতই নির্মম হোক না কেন। দুয়েকটি তো নিজ চোখেই দেখেছি এমন। আল্লাহর এই দুনিয়ায় আরও কত কিছু ঘটবে সে সবের খবর আলেমুল গায়ব আল্লাহ ছাড়া আর কে রাখে। ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে জিয়া বিমানবন্দর থেকে যেদিন আমেরিকায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার স্বামীর কফিনে ভরা লাশ গ্রহণ করেছিলেন সেদিন তার আশার প্রদীপ জ্বলেছিল। যে প্রদীপের ফিতায় তিনি দীর্ঘ ষোল বছর ধরে ক্ষোভের জ্বালানী সরবরাহ করেছিলেন।

বিমানবন্দরে সেদিন কফিন গ্রহণ করতে স্বামী শোকে ফারজানার বুক কাঁপেনি তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। মুক্তবাসের অভিশপ্ত জীবন তাকে এমন নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে যা হয় নিজ চোখে একবার তা দেখেছি।

দুই.

২০১১ইং সালের ১৫ই নভেম্বরের ঘটনা। পরের দিন ঈদুল আজহা। ফযরের নামাযের আগে কুরআন তিলাওয়াত করছি এমন সময় জনৈক আলেম তাকবীরে তাশরীকের মাসআলা জানার জন্য

ফোন দিলেন। তার সমাধান বলে ফোনটা রেখেছি এমন সময় বড় ভাই ফোন দিলেন। সময়ের অস্বাভাবিকতার কারণে প্রথমে ভড়কে গেলাম। আগের লোকের ফোনের কথা ভেবে চিন্তা করলাম, হয়ত তিনিও তাকবীরে তাশরীকের মাসআলা জানার জন্যই ফোন দিয়েছেন। কিন্তু ফোন রিসিভ করেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বড় ভাই কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে! মাসুদ ভাই (বড় ভগ্নিপতি) মারা গেছেন!

অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে একেবারে থ হয়ে গেলাম। বোন ও মাসুম দুটি ভাগ্নে-ভাগ্নির নিষ্পাপ চেহারা আমার চোখে ভেসে উঠল। ফযর সালাত আদায় করেই টঙ্গি থেকে মহাখালীর দিকে ছুটলাম। পরের দিন ঈদ। মানুষ শিকড়ের টানে আনন্দ করতে ছুটছে গ্রামের বাড়ি। আর আমি ছুটছি আমার ইয়াতিম ভাগ্নে-ভাগ্নির পিতৃহারা বেদনার মুখচ্ছবি দেখতে! সারাপথ শুধু একথা ভাবলাম যে, কী অবস্থায় দেখতে পাবো আমি আমার সদ্য বিধবা অসহায় বোনটিকে? আমি কি তার অসহায়ত্বের সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাবো? তাকে আমি কী অবস্থায় দেখবো? প্রবাসে স্বামীর মৃত্যশয্যায় উপস্থিত থাকতে না পারা একজন স্ত্রীর যে দুঃখ, পৃথিবীর কোনো ভাষায় কি সেই দুঃখ নিবারণ করার শক্তি আছে? আমি কি ভাষাহীন সেই অসহায় অভিযাত্রী নই?

ঢাকার সেদিনের মানুষের ঢল আমার কাছে নিরর্থক মনে হলো। এই যে বাঁধভাঙা ঢল, কোথায় গিয়ে থামবে এর চলার গতি? শেষ পর্যন্ত কবরই তো? আসলে সারা পৃথিবীটাই আল্লাহর কাছে

নিরর্থক। মশার ডানা পরিমাণও এর মূল্য নেই তাঁর দৃষ্টিতে। ইরশাদ হয়েছে-

«لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ»

'আল্লাহর কাছে যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার পাখার সমানও হত তবে কোনো কাফের এ থেকে একফোঁটা পানিও পেত না।' [তিরমিযী : ২৩২০]

কথাটা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বোঝেন জীবনের প্রতি মুহূর্তে। আর আমরা বুঝি কেবল বিপদগ্রস্ত হলে। যাহোক, কম্পিত পদে বোনের বাসায় হাজির হলাম। ঘরের বাইরে থেকেই কান্নার রোল শোনা যাচ্ছে। এমনি এক অসহায় মুহূর্তে আপন বলতে আমিই কেবল উপস্থিত তখন। লেখাপড়া করার জন্য যখন ঢাকায় এসেছি তখন গোটা অচেনা নগরীতে একমাত্র বড় বোনটাই ছিলেন আমার সেই ছোটো বেলার আশ্রয়। সারা সপ্তায় মাদ্রাসায় কাটিয়ে সদ্য ঢাকায় পা রাখা গ্রামের একটি ছেলের মনের মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হতো, সেই শূন্যতা কাটাতে বোনের বাসায় ছুটে যেতাম। বোনের, মায়ের সব আদর এখানেই খুঁজে ফিরতাম আমি। তিনিও আমাকে স্নেহ দিয়ে, সাহস দিয়ে নির্ভার করতেন। এমন উপকারী বড় বোনটির এই বেদনাহত দৃশ্য দেখে আমি নিজেকে শক্ত রাখার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা সহসাই ভেঙে গেল। আমি তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তিনি আমার কাছে স্বামী হারানোর ব্যাকুলতা করুণ সুরে ব্যক্ত করলেন। ব্যাকুলতার সে সব ভাষা আমার বুকে সুঁই হয়ে বিঁধতে শুরু করল।

তার মর্সিয়ার ভাষাগুলো নিদারুণ বেদনার ঢেউ তোলে মনে। বিদেশ যাওয়ার অল্পদিন পরেই ভগ্নিপতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র সাতমাস বয়সী আদরের মেয়েটির মায়াবী চেহারাটা চোখে ভেসে উঠতেই তিনি উদাস হয়ে যেতেন। এসব উদাসীনতা থেকে বড় ধরনের রোগ জন্ম নিয়েছিল। অসুস্থতার দিনগুলো তিনি হাসপাতালের বেডে একা কাটিয়েছেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিয়ে তিনি অফিস থেকে রাত করে একবার বাসায় ফিরলেন। শারীরিক অসুস্থতা, সারাদিনের ব্যস্ততার ক্লান্তি আর রাত গভীরে বাজার করে রান্না করে খাওয়ার সাহস হলো না বলে সরল মনে মামীকে দুটি রুটি বানিয়ে দিতে বললেন। আমার বোনের কাছে মামী এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করলেন। মামীর অভিযোগ শুনে বোন দিশেহারা হয়ে গেলেন। আপনজন থেকে বহুদূরে অবস্থিত অসুস্থ স্বামীর এতটুকু বিরক্তি বরদাশত করার অনুরোধ করবেন, না স্বামীকে হাজারো কষ্টের সাথে আরেকটু কষ্ট স্বীকার করার পরামর্শ দেবেন- তিনি তা ভেবে পান না। হায়! অসুস্থ মানুষের অতি নগন্য এই আব্দারের জন্য সেই সুইডেন থেকে অভিযোগ দিতে হয়!

বোনের এসব করুণ আখ্যান শুনে শুনে আমার চোখের পাতা আরও বেশি করে ভিজে উঠল। তবু আমি নিজেকে শান্ত রাখলাম এবং বোনকে আমার সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিতে থাকলাম। স্বামীর সাথে গত রাতেও কথা বলেছেন তিনি। শেষ কথার রাতটি এখনও শেষ হয়নি। ফযর নামাযের জন্য দেয়া এলার্ম এখনো

বেজে ওঠে নি। এমন সময় সুইডেন থেকে ভগ্নিপতির মামা ফোন দিলেন। ঘুমের জড়তা নিয়ে বোন ফোন ধরলেন। ফোনদাতা কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললেন, ফাহিমের মা! বাস্তবতা মেনে নাও। তোমার স্বামী ইন্তেকাল করেছে!

সদ্য ঘুম থেকে ওঠা একজন নারী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদটি সহজে মেনে নিতে পারে? তাই একটি করুণ চিৎকার ধ্বনি দিয়ে তিনি বেঁহুশ হয়ে খাট থেকে পড়ে গেলেন।

স্বামীর কত শত স্মৃতির কথা ভেসে উঠছে তার রিক্তহৃদয়ে। সেগুলো বলে বলে মর্সিয়া করছেন আর স্বামীর লাশটা দেখার জন্য আকুতি জানাচ্ছেন। ভগ্নিপতিকে সুইডেনে নিয়েছিলেন তার মামা, নিজের কোম্পানিতে কাজে নিয়োগ দেয়ার জন্য। তাই লাশ পাঠাতে হলে তারই খরচে পাঠাতে হবে। ফোনে মামার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানালেন এত টাকা খরচ করে লাশ পাঠানো সম্ভব না! দরকার হলে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এখানে এসে বাবার কবর যিয়ারত করে যাবে! হায় বিলাসী ভাবনা! মানুষ নিজের স্বার্থে অন্যকে এভাবেই বিলাসী স্বপ্ন দেখিয়ে থাকে?

এরপর নানাভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু ভারি আব্দার শোনার ভয়ে তিনি ফোন রিসিভ করা বাদ দিলেন। আমার বোন তার শাশুড়ীর সাথে যোগাযোগ করলেন। তাকে জোর তাগিদ দিয়ে বললেন, আমি আমার স্বামীর লাশ শেষবারের মতো দেখতে চাই। তাছাড়া, ফাহিমের আব্বা বারবার বলত আমাকে যেন আমার বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়। তার শেষ ইচ্ছাটাও

পূরণ করার ব্যবস্থা করা হোক। বোনের পীড়াপীড়ি আর মায়ের আত্মার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হলেন মামা। তিনি লাশ পাঠাবেন বলে ওয়াদা দিলেন।

১লা ডিসেম্বর বুধবার। সুদূর সুইডেন থেকে লাশ আসবে জিয়া বিমানবন্দরে। যে বিমানবন্দর দিয়ে আত্মীয়স্বজন আর আপনজনকে কাঁদিয়ে বিদেশের পথে পা রেখেছিলেন সেই বিমানবন্দর দিয়েই আজ লাশ হয়ে ফিরে আসবেন তিনি। বিমানবন্দরগুলোতে দুটি পরিচিত দৃশ্য দেখা যায়। যারা বিদেশ যায় তাদের আপনজনরা অশ্রু বিয়োগ করে আর যারা বিদেশ থেকে ফেরত আসে তাদের আপনজনরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কিন্তু আমার ভগ্নিপতির বেলায় ঘটল এর উল্টোটা। তিনি যাওয়ার সময়েও কাঁদিয়েছিলেন, আসার সময়েও কাঁদাবেন। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমি, বড় ভাই এবং ছোট ভগ্নিপতি হাসান বিমানবন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম ভেতরে। ধারণা ছিল যাত্রীবাহিনী বিমানেই কফিন আসবে। একদিকে বেরিয়ে আসবে দীর্ঘদিন পর দেশে ফেরা আনন্দে উচ্ছল একদল যাত্রী, যারা আপনজন আর ছেলেমেয়েকে আনন্দে জরিয়ে ধরবে। আর তাদের পাশ দিয়েই বেরুবে আমার ভগ্নিপতির কফিন, যার ওপর আছড়ে পড়বে তার মা, স্ত্রী এবং দশ বছরের অবুঝ ভাগ্নে ফাহিম? কিন্তু বিমানবন্দরে গিয়ে জানতে পারলাম লাশ আসবে কার্গো বিমানে।

যাহোক, আমরা পরিচয় দিয়ে অনুমতি নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসে প্রবেশ করলাম। ভেতরে সে কী কর্মতৎপরতা! হাজার রকমের মাল-সামানা আসছে বিদেশ থেকে। মানুষ সেগুলো গ্রহণ করছে, হইচই করছে। আর আমরা কয়েকজন মানুষ শুকনো মুখে একজন মানুষের নিথর দেহ আগমনের অপেক্ষায় আছি। ইমিগ্রেশন অফিসে বয়স্ক এক মহিলা কর্মরত ছিলেন। লাশের ঠিকানা দেখে নিজ এলাকার হওয়ায় তিনি সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন। আনুষ্ঠানিকতা সারতে কেটে গেল অনেক সময়।

পৃথিবীর কারও কাছে লাশের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আজ আমাদের কাছে সেই লাশই অমূল্য সম্পদ! কাগজপত্রের কাজ চলাকালেই শুনলাম কফিনবাহী সেই কার্গো বিমানটি অবতরণ করেছে। রক্ষীদেরকে এক রকম ফাঁকি দিয়েই বিমানের কাছাকাছি পৌঁছলাম। বিমানের সব মাল খালাস করা হয়েছে। সে সব মালামালের সাথে অযত্নে অবহেলায় পড়ে রয়েছে একটি কফিনও। বুঝতে বাকি থাকল না যে, এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই কফিন বক্স। হায় অবিনশ্বর পৃথিবী! এখানে মৃতের মূল্য এত নগন্য! যে মানুষগুলোকে নিয়ে এত কর্মব্যস্ততা সেই মানুষটির প্রাণ বের হয়ে গেলেই সে এত মূল্যহীন? ইচ্ছে হলো কফিনটা একবার ছুঁয়ে দেখি। কিন্তু পাহাদারদেরকে এক্ষেত্রে ফাঁকি দেয়া গেল না। তারা আমাদেরকে সরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে বাইরে এসে পৌঁছেছেন বোন ও ভাগ্নেরাও। তারা নিষ্ঠুর এক প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। সব আনুষ্ঠিকতা সেরে

ট্রলিতে কফিন উঠানো হলো। ট্রলির চাকা ঘুরছে আর আমার হৃদপিণ্ড কাঁপছে। কফিনটা দেখে না জানি বোন, মা ও তার সন্তানেরা কী করে বসে। আমার আশঙ্কাই বাস্তবিত হলো। কফিন দেখামাত্রই এর ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আশেপাশের মানুষের চোখেও বেদনার অশ্রু। ট্রলি বহনকারী লোকটিকে কিছু বকশিশ দিতে গেলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, আমরা লাশ বহন করে বকশিশ গ্রহণ করি না। আসলে এটা এমন এক বেদনাবিধুর পরিবেশ যেখানে কেউই চোখের জল আটকে রাখতে পারে না। তাই বাংলাদেশের মতো বকশিশ পাগল দেশের লোকেরাও এখানে বকশিশ গ্রহণ করে না!

সেদিনের কফিনকে ঘিরে যে বেদনা ও কষ্টের দৃশ্য দেখেছিলাম, স্বামীহারা বোনকে যেভাবে অশ্রুসিক্ত হতে দেখেছিলাম ফারজানাও কি স্বামী হারিয়ে, তার কফিনের সামনে এধরনের কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? তার আত্মা কি সেদিন স্বামী হারার বেদনায় কেঁপে ওঠেনি? তার কথায় বুঝা যায়, তিনি তেমন কিছু অনুভব করেন নি। বরং দীর্ঘদিন ধরে যে স্বাভাবিকভাবে স্বামীর কফিন কল্পনা করেছেন, কফিনের সামনে দাঁড়িয়েও তেমন স্বাভাবিকতা দেখিয়েছেন। কীসে তাকে এতো নির্মম করে তুলেছিল? অনৈতিক সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা আর মুক্তবাস এভাবেই মানুষকে নির্মম করে তোলে? স্বামীর কফিনের সামনে দাঁড়িয়েও কোনো নারী নির্দয়, নিষ্ঠুর আর অবিচল থাকতে পারে?

স্বামীকে ছাড়াই তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। নিজে বিউটিশিয়ান হিসেবে প্রচুর টাকা উপার্জন করা শুরু করেছিলেন। তাই স্বামীর মৃত্যু তাকে তেমন ভাবায়নি। অবশ্য মৃত্যুর আগেই সুদীর্ঘ ষোল বছর ঘর-সংসার করার পর তাকে ডিভোর্স দিয়েছিলেন। তাই এখন নতুন করে ঘর করার পথেও কোনো বাধা নেই। এরই মধ্যে আরেকজন লোক নতুন করে প্রেম প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয় তার সামনে। সে ফারজানাকে এক নজর দেখার জন্য তার অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত**। কখনও তার পায়ে পড়ে তার প্রেমের আকুলতা ব্যক্ত করত। সে আরও বলত**, তাকে ছাড়া সে বাঁচবে না। তার 'অকৃত্রিম' ভালোবাসার কাছে আবার হার মানেন ফারজানা। জীবনের এক দরজা দিয়ে প্রথম স্বামীর মৃত্যু কফিন বের হয়ে গেছে তো আরেক দরজা দিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর পাল্কি প্রবেশ করেছে। প্রথম স্বামীর কবরের তাজা মাটির ওপর নির্মাণ করেছেন দ্বিতীয় সংসারের সুখপ্রাসাদ!

তিন.

আমি তার ইচ্ছার সততাকে কলুষিত করতে চাই না। প্রথম স্বামীর সীমাহীন নির্যাতনে তিনি চরম হতাশ হয়েছিলেন একথাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখে তাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তিনি দ্বিতীয় স্বামীর কবরের মাটি কত তাড়াতাড়ি শুকোয় সেটার কামনা করছেন। মনে পড়ে গেল আরবী সাহিত্যের বিশ্বখ্যাত কিতাব 'আন-নাযারাত' এর একটি ঘটনা। ড.

মুস্তাফা লুতফী আল-মানফালুতীর লেখা এই কিতাবটি আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ও বিপুল সমাদৃত কিতাব। 'গাদারুল মারআ (নারীর প্রতারণা)' নামে তিনি যে ঘটনাটি এই কিতাবে লিখেছেন তা এখানে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাই পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিখ্যাত এক গ্রিক দার্শনিক। জ্ঞানে-গুণে দেশজুড়ে পরিচিতি তার। স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসেন প্রচণ্ড। ভালোবাসায় সিক্ত রাখেন তাকে, আপ্লুত থাকেন নিজে। সেই ভালোবাসার তোড়েই মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে চিরচেনা সেই প্রশ্নটি করে বসেন- 'আমার পরে তুমি কি কাউকে বিয়ে করবে?'

দার্শনিক স্বামীর এমন ভূতুড়ে প্রশ্নে গাল ফোলান স্ত্রী। অভিমান করে বলেন, আমাকে ভালোবাস না বলেই তুমি অমন প্রশ্ন করো! স্ত্রীর অভিমানে চুপসে যান দার্শনিক। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকে প্রশ্নের এই ধারা। কিন্তু আবার প্রশ্ন জাগে মনে। পুনরায় প্রশ্ন করেন স্ত্রীকে। স্ত্রীও চরম অভিমানে ফুঁসে ওঠেন। স্বামীর ভালোবাসার ব্যাপারে উল্টো তিনিও প্রশ্ন তোলেন।

দার্শনিক একবার কোনো কারণে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরতি পথে দেখা একটি ঘটনা তার মনের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে। তিনি দেখতে পান, নতুন এক কবরে জনৈক মহিলা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। তিনি দার্শনিক মানুষ। এসব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় দার্শনিকদের একটু বেশি ভাবুক করে তোলে। তিনি তাই কৌতূহল নিয়ে কবরের পাশে যান। মহিলাকে

কবরে বাতাস করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু মহিলা এদিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। সে বলল, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। অনুগ্রহ করে আমাকে বিরক্ত করবেন না! কিন্তু দার্শনিক এই 'ধমকে' দমবার পাত্র নন। তিনি ঘটনার শেষটা দেখার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং মহিলাকে বললেন, তুমি অনেকক্ষণ ধরে বাতাস করছ। সুযোগ দিলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি! মহিলা তাকে সদয় সুযোগ দিল। সুযোগ পেয়ে মহিলার হাত থেকে পাখা নিয়ে বাতাস করা শুরু করলেন তিনি। দু'জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কবরের তাজা মাটি কিছুটা শুকিয়ে উঠল। মহিলা এবার দার্শনিকের দিকে মনোনিবেশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, মাননীয় দার্শনিক সাহেব! আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার এই সহযোগিতার কথা কোনোদিন ভুলব না। আপনাকে আমি চিনি। কিন্তু করার কিছু ছিল না। আপনার সহায়তা পেয়ে কাজটি সহজ হলো। তাই এবার শুনুন আমার কাহিনী।

স্বামী আমাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন- বলা শুরু করলেন তিনি। সেই ভালোবাসার তাগিদেই তিনি বারবার আমাকে বলতেন, তার মৃত্যুর পর আমি অন্য কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব কিনা? আমি তার প্রতিদিনের জিজ্ঞাসা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিতাম। একদিন তিনি নাছোড় হয়ে ধরলেন আমাকে। আমার কাছ থেকে তিনি চূড়ান্ত কিছু শুনতে চাইলেন। আমিও দৃঢ়ভাবে তার আশঙ্কা দূর করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি মানলেন না। শেষে নিজের পক্ষ থেকেই বললেন- আচ্ছা, একটা কাজ

করো। আমি মরার পর তুমি স্বামী গ্রহণ করলেও অন্তত কবরের মাটি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমি প্রথমে তার এই কথা কানেই তুললাম না। কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে এক প্রকার অবহেলা করেই বললাম, আচ্ছা যাও, তাই হবে।

এরপর একদিন তিনি সত্যিই মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সাথে সাথে অন্য এক পুরুষ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবদাতাকে ফিরিয়ে দিতে মন সরল না। এদিকে স্বামীকেও ওয়াদা করেছিলাম তার কবরের মাটি না শুকানো পর্যন্ত বিয়ে করব না। কী করব দ্বিধা করছিলাম। এরই মধ্যে মাথায় বুদ্ধি আসল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম। দুই কুল রক্ষা করার সিদ্ধান্ত। সেই মোতাবেক আমি স্বামীর কবরে বাতাস করা শুরু করলাম। অবশেষে আপনার সহায়তায় আমার কাজটা সহজ হলো। এই নিন আপনার উপহার! যে রেশমি পাখা দিয়ে বাতাস করে আমার আজকের দ্বিতীয় বাসরটা ত্বরান্বিত করেছেন সেটা আপনারই প্রাপ্য!

দার্শনিক বলেন, মহিলা আমাকে রেশমি পাখাটি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। আমি তাকে বাধা দিলাম না। কেননা, সে এখন দ্বিতীয় বাসরের স্বপ্নে বিভোর। আমি সম্বিতহারা যন্ত্রচালিতের মতো ঘরপানে এগিয়ে চললাম আর সারা পথ ভাবতে থাকলাম এই মহিলার 'ওয়াফাদারী'র কথা! ঘরে এসে আমি রেশমি পাখাটা স্ত্রীকে দিয়ে বললাম, এই নাও স্বজাতির পক্ষ থেকে তোমাকে দেয়া হাদিয়া!

আমার স্ত্রী এই পাখার কাহিনী জানতে চাইল। আমি তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে সেই আগের কথা মনে করিয়ে দিলাম। সে উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, পৃথিবীর সব নারীকে তুমি এক পাল্লায় মাপো, তাই না? আমিও কি কখনও ওই সর্বনাশী বেওয়াফা নারীর মতো হতে পারি? এসব কথা বলে সে ওই নারীকে আচ্ছা করে বকতে শুরু করল। বকাঝকা করে মনের আয়েশ মিটিয়ে তবেই ক্ষান্ত হলো সে।

এরপর কেটে গেল বেশ কিছুদিন। মান-অভিমান মিলেই কাটল দিনগুলো। এর মধ্যে দার্শনিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আজ তিনি জীবন সায়াহ্নে উপনীত। শয্যা থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরবেন কিনা- স্বয়ং দার্শনিকই তাতে সন্দিহান। রোগ বাড়তে থাকল। চরম অবস্থা ধারণ করলে একদিন তিনি স্ত্রীকে কাছে ডাকলেন এবং তার মৃত্যুর পর কাউকে জীবনসঙ্গীনী বানিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু স্বামীর এই পরামর্শে সেই আগের মতোই ক্ষিপ্ত হলেন স্ত্রী। এই শেষ সফরেও তোমার সন্দেহ গেল না- বলে স্বামীকে তিরস্কার করলেন।

সেই রাতে স্ত্রীকে আবার ডাকলেন দার্শনিক। বললেন, অভিজ্ঞতায় বলছে এটাই আমার জীবনের শেষ রাত। যদি ভালো মনে করো তবে আমার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করবে। বিদায়বেলায় স্ত্রীকে অনেক কথা বললেন তিনি। শেষে বললেন, এখান থেকে চলে যাবার সময় আমাকে কাফনের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে যাবে। রাতে আর কাউকে এই ঘরে ঢুকতে দেবে না। তুমিও ঢুকবে না।

তোমার সাথে আমার জীবদ্দশার শেষ দেখা এটি। আগামীকাল যখন শহরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক জমায়েত হবে তখন আমার জানাযার ব্যবস্থা করবে। বিদায়...
স্বামীর শেষ কথায় বুক ফেটে কান্না আসল স্ত্রীর। স্বামীর দেহে কাফনের কাপড় জড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তিনি। অন্য ঘরে বসে মৃত স্বামীর জন্য মর্সিয়া করতে থাকলেন।
রাত তখন মধ্য পথে থমকে আছে। ঘরের ভেতর এখনও কাঁদছেন সদ্যপ্রয়াত দার্শনিকের স্ত্রী। রাত গভীরে থমকে থমকে ভেসে আসা করুণ বিলাপে শোকাতর হচ্ছে নীরব পরিবেশও। ঠিক এই অসময়ে মালিকার ঘরে করাঘাত করল এক দাসী। দরজা খুলে দাসীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন দার্শনিকের স্ত্রী। দাসী মালিকার চাহনির জবাবে বললেন, দূর থেকে আসা এক যুবক তার প্রিয় গুরুর মৃত্যুতে চরম শোকাতর হয়েছে। মেহমানখানায় সে কেবলই গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার অবস্থা খুবই নাযুক!
দার্শনিকের স্ত্রী বললেন- তাকে থাকার জায়গা করে দাও। আর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো। দাসী বলল, সে তার গুরুর শোকে শোকাচ্ছন্ন। খাবারের নামও নেয়া দায় হবে তার সামনে। সে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চায়।
এমন এক শোকাবহ পরিবেশে অচেনা আগন্তুকের সাথে দেখা করতে মন সরছিল না দার্শনিকপত্নীর। কিন্তু দাসীর পীড়াপীড়িতে

না করতেও পারলেন না। তাই বাধ্য হয়ে দাসীর সাথে আগন্তুক যুবকের সাথে দেখা করতে বের হলেন।

ক্রন্দনরত যুবকের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলেন দার্শনিকের স্ত্রী। এমন সুদর্শন মানুষ হয়! ইউসূফ আলাইহিস সালামের বংশের কেউ না তো? স্বল্প সময়ের জন্য তিনি মৃত্যুশোক ভুলে গেলেন। আগন্তুক যুবকের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন অনেক সময়। যুবকের সৌন্দর্যের অস্বাভাবিকতা শোকের ভার তার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল। তিনি প্রবল আগ্রহ নিয়ে যুবকের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। যুবক বহু দূর থেকে তার আসার কারণ বর্ণনা করল এবং প্রিয় গুরুর মৃত্যুতে সীমাহীন আঘাত পেয়েছে বলে জানালো। এরপর সে আবার কাঁদা শুরু করল। এবার তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভার দার্শনিকের স্ত্রীর! তিনি বলা শুরু করলেন, হে যুবক! মৃতকে নিয়ে আর কত শোক করবে? জীবন বাস্তব, মৃত্যু অতীত। এসো আমরা বাস্তবকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি!

সদ্য বৈধব্যের শোকমালা পরা নারীর ইশারা বুঝতে পারলেন না যুবক। শোকের মধ্যেই তিনি কথাটার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। দার্শনিকের স্ত্রী জড়তা মেশানো কণ্ঠে বললেন, না বোঝার কী আছে? দার্শনিক তোমার গুরু আর আমার স্বামী। আমরা দুজনেই শোক পেয়েছি। তাই শোক থেকে বেরিয়ে আসার দায়িত্বও আমাদের দুজনেরই। চলো, আমরা শোক কাটিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করি!

মহিলার মোটা দাগের ইশারাও যেন বুঝতে পারছে না যুবক। সে আবার মহিলার দিকে তাকালো জিজ্ঞাসুনেত্রে। যুবকের অবুঝপনা দেখে বিরক্ত হলেন দার্শনিকপত্নী। তিনি রুষ্টকণ্ঠে বললেন, তুমি বিশ্বখ্যাত একজন দার্শনিকের শিষ্য, অথচ সোজা কথাটা বুঝতেও তোমাকে এত গলদঘর্ম করতে হয়! আমি চাই মৃত্যুশোক দ্রুত কাটিয়ে উঠতে আমরা নতুন করে ঘর শুরু করব! একথাটাই আমি তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি। বোকা যুবক, কিচ্ছু বোঝে না!

কান্নার মধ্যে হাসি পেল শিষ্যের। হায় নারী! ত্বকের সৌন্দর্যই তোর কাছে সব? এই তোর পতিপরায়ণতা? পৃথিবীতে বহু পুরুষ এমন আছে যার মনের শুভ্রতা দিয়ে যদি ত্বকে প্রলেপ দেয়া হতো তবে ত্বক দুধের মতো সাদা হয়ে যেত। কিন্তু কয়জন নারী এমন মহৎ পুরুষকে সম্মান দেখাতে পেরেছে? বাইরের ত্বকই যাদের ধ্যান-জ্ঞান তারা স্বামীর অবর্তমানটাকে উপভোগ করবে না কেন?

কিন্তু যুবক তাকে হতাশ করল। তাকে নিবৃত করে বলল, কিন্তু আমি যে অক্ষম! আমি এমন এক দুরারোগ্যে আক্রান্ত পৃথিবীর কোনো হাকিমের কাছে যার চিকিৎসা নেই।

মহিলা হতাশকণ্ঠে বললেন, কী সেই রোগ তোমার?

-এমন রোগ যা বলতেও ভয় করে!

-বলোই না!

-রোগটা আভ্যন্তরীণ। আমি পৃথিবীর বহু বিখ্যাত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছি। অনেকে রোগের কথা শুনেই আমাকে বিদায় করে দিয়েছেন। আর কেউ কেউ চিকিৎসা দিতে পারবেন

বলেছেন। কিন্তু সেই চিকিৎসাবস্তু যোগাড় করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

-কী সেই বস্তু, শুনতে পারি?

- শুনে কী হবে? যার ব্যবস্থা নেই তা শুনেও লাভ নেই!

-আহ্, তুমি বেশি ভণিতা করছ! তুমি বলো দেখি আমি সেই বস্তু যোগাড় করতে পারি কিনা? যে কোনো মূল্য আমাদেরকে নতুন ঘর বাঁধতে হবে। তাই যেভাবেই হোক আমি তোমার সেই চিকিৎসার বস্তু যোগাড় করতে তৎপর হবো।

-যদি শুনতেই চান তবে শুনুন। সেই বস্তুটি হচ্ছে সদ্যপ্রয়াত কোনো ব্যক্তির মাথার মগজ!

কথাটা শুনে প্রথমে চমকে গেলেন দার্শনিকের স্ত্রী। বাকরুদ্ধ থাকলেন অনেকক্ষণ। তার মুখ থেকে কথা ফুটছে না দেখে শিষ্য বলল, আমি আগেই বলেছিলাম, আমার রোগের কোনো পথ্য নেই। আমি কত জায়গায় ঘুরেছি। কতভাবে মানুষকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছি। কিন্তু কেউই আমাকে এই বস্তু সংগ্রহ করে দেয়ার আশ্বাস দেয় নি। তাই জীবন সম্পর্কে আমি নিরাশ হয়ে গেছি। আমার বাঁচাও হবে না, কারও সাথে ঘরও করা হবে না। কথাগুলো বলে লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো যুবক। তা দেখে বেদনায় মুখশ্রীটা নীল হয়ে গেল দার্শনিক পত্নীর। তিনি তাকে সাহস দিয়ে বললেন, আমি বলব, তারপরেও তোমার নিরাশ হওয়া উচিত নয়!

-পৃথিবীর সব চিকিৎসক যেখানে আমাকে নিরাশ করেছে সেখানে আপনি আমাকে আশাবাদী হতে বলেন? আমি এমন কৌতুক আশা করিনি আপনার কাছ থেকে।

-কৌতুক বলছ কেন যুবক! আমি তোমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিলাম। তুমি এবার নিশ্চিন্ত হতে পারো।

কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন দার্শনিক পত্নী। তার প্রস্থানপথের দিকে চরম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন দার্শনিকশিষ্য।

ঘর থেকে বের হয়ে সোজা অস্ত্র ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। কদমে তার দৃঢ়তা। ইচ্ছায় অদম্যতা। ঘরে ঢুকে ধারালো কুড়ালটা হাতে তুলে নিলেন। কুড়ালটার চাকচিক্যে রাতের আঁধারটাও যেন ক্ষণিকের জন্য দূরে পালালো। তিনি বিদ্যুৎবেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তার সিদ্ধান্তের নির্মমতায় কেঁপে উঠল আকাশ। সদ্যপ্রয়াত স্বামীর লাশের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করল দাসী। ঘরের খিড়কী খুলে তিনি সাদা কাফনের ঢাকা স্বামীর লাশের মাথার দিকে দাঁড়ালেন। 'সদ্যমৃত' লাশের মগজ হলেই তিনি নতুন করে ঘর বাঁধতে পারবেন। এই 'ছোট্ট' একটা বাধা তাকে অতিক্রম করতেই হবে। তিনি কুড়ালটাকে আরও দৃঢ়ভাবে ধরলেন। বামহাত দিয়ে মাথা থেকে কাফনের সাদা কাপড়টা সরিয়ে দিলেন। ডানহাতে কুড়ালটা উঠাতে যাবেন ঠিক সে সময় দার্শনিক বেচারা ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। চৌকাঠে সম্মিলিতকণ্ঠের হাসির

আওয়াজও শোনা গেল। দার্শনিকপত্নী চকিতে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন আগন্তুক যুবক ও দাসী মিটমিট করে হাসছে! তার বোঝার আর কিছু বাকি থাকল না। দার্শনিক স্বামী তাকে এত নিষ্ঠুর পরীক্ষায় ফেলবেন বলে কস্মিনকালেও ধারণা হয় নি। তিনি ভাষা হারিয়ে ফেললেন। হতবাক, বাকরুদ্ধ স্ত্রীকে দার্শনিক শুধু একটা কথাই বললেন, তোমার এই কুড়ালের চেয়ে রেশমী পাখাওয়ালা ওই মহিলা কি উত্তম নয়?

স্বামীর তীর্যকবাক্য, অতিথি ও দাসীর বিদ্রূপাত্মক হাসি অপ্রস্তুত করে তুলল দার্শনিকপত্নীকে। তিনি লজ্জায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

এভাবে প্রথম স্বামীর লাশ মাড়িয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের আশা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল দার্শনিকপত্নীর। বাঁধার আগেই ভেঙে গেল নতুন ঘরের স্বপ্ন। এরপরে কী হয়েছিল ইতিহাস সে ব্যাপারে নীরব। কিন্তু আমাদের ফারজানার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের ইতিহাসটা অজানা নয়। তিনি প্রথম স্বামীর কফিন কল্পনার মধ্য দিয়ে যে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিলেন সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে আরও বেশি আঘাত দিয়েছিল।

সরকারী চাকরিজীবি এই লোকটা প্রথমে হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। সে ধর্ম ত্যাগ করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ফারজানাকে দেখে তিনি তার প্রেমে পড়ে যান। তাকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। এজন্য কত যে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কখনও কখনও তিনি ফারজানার অফিসে, তার ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। কখনও পা জড়িয়ে ধরে বলতেন, আমাকে বাঁচান, আমি আপনাকে ছাড়া বাঁচব না। মুক্তবাস উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম একবার দেখা হয়ে গিয়েছিল ফারজানার। তাই দ্বিতীয়বার তিনি এপথে পা মাড়াতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু লোকটির সীমাহীন পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। প্রায় দেড় যুগ পরে একই তরিকায় দ্বিতীয় বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। বিয়ের সময় শর্ত দিয়েছিলেন, আগের ঘরের ছেলেমেয়েদের সাথে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারবেন কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হবে।

দীর্ঘদিনের স্বামীসান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ফারজানা নতুন স্বামী পেয়ে নতুন জীবন লাভ করলেন। দীর্ঘ ষোল বছরের তৃষিত, বঞ্চিত দাম্পত্যভূমিতে এই নতুন স্বামী এক পশলা বৃষ্টি হয়ে আগমন করল তার জীবনে। পুনরায় সজীব হয়ে উঠেছিল ফারজানার নিষ্প্রভ আত্মা। কিন্তু কী কারণে যেন এই সজীবতা স্থায়ী হলো না। দ্বিতীয় দাম্পত্য স্থায়ী হলো মাত্র আট মাস। এ যেন শিয়ালের বিয়ের বৃষ্টি! একদিকে রোদ তো অন্যদিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

ফারজানা অনেক অনুনয় বিনয় করেছিলেন দ্বিতীয় স্বামীর কাছে। বলেছিলেন, এ নিয়ে কম তো আর হলো না। তাই নতুন করে আর কিছু চাই না, শুধু স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়টা অটুট থাকতে দাও। স্ত্রীত্বের সম্মানটা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার সুযোগ দাও। অন্তত আমার এই সম্মানটুকু রক্ষা করো!

বস্তুত একটা নারী ধনী হোক বা গরীব, তার কাছে স্বামীর পরিচয় থাকা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের একটি। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল। টঙ্গীর চেরাগ আলীর ঘটনা এটি। এক প্রতিবন্ধীর চার চারটে স্ত্রী! দু'পা ভালো থাকার সময় করেছিলেন দুই বিয়ে আর সড়ক দুর্ঘটনায় এক পা হারানোর পর করেছিলেন আরো দুই বিয়ে। চার স্ত্রীকে নিয়ে তার জীবনযাত্রাও বেশ বিচিত্র। প্রতিদিন তিনি গার্মেন্টে চাকরিরত একেক স্ত্রীর কাছে যান। তার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করেন আর আসার সময় ১৮ টাকা রিক্সা ভাড়া এবং ১২ টাকা চা নাস্তার খরচ নেন। মাসের তিরিশটি দিন নাকি তার কাটে এভাবেই!

ঘটনার বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করলাম, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চার চারজন মহিলা স্বামী হিসেবে বরণ করবে একথা আমরা বিশ্বাস করতে যাবো কেন? তিনি বললেন, 'স্বামী আছে' পরিচয় দেয়ার এতটুকু স্বার্থে তারা তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল!

এই ঘটনা সত্যিই প্রমাণ করে, একজন নারীর কাছে স্বামী পরিচয়ের চেয়ে বড় মর্যাদার কোনো পরিচয় নেই। সেই পরিচয় রক্ষার্থেই ফারজানা দ্বিতীয় স্বামীর কাছে অনেক অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু বিফলে গেল তার সব আকুতি। দ্বিতীয় স্বামী তাকে ততধিক অপমান, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন।

ফারজানার মেয়ে এবং ফারজানা নিজেও একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত রাগী ও জেদি নারী। তার এই ভস্ম পরিণতি মুক্তবাসের ছাই না জেদের আগুনের ছাই- তা নির্ণয় করা কঠিন। হয়ত উভয়টাই। এই দুটি বস্তুই নারীর জন্য অশুভ। নারীর জেদ নিয়ে প্রবাদ বাক্যও কম তৈরি হয়নি। একটি আঞ্চলিক প্রবাদ এরূপ : 'পুরুষের জেদে বাদশা, আর নারীর জেদে বেশ্যা।'

হয়ত প্রবাদের ভাষাটা একটু বেশি কঠিন ও অশালীন। তবে প্রবাদটার সবটুকু মিথ্যা বলার সুযোগ নেই, অবশ্যই সত্যের কিছু না কিছু অংশ আছে এখানে।

দুই দুটি সংসার চোখের সামনে এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল ফারজানার। অবাঞ্ছিত পথে গড়া বিয়ের পিঁড়িগুলো এভাবেই উঁইপোকায় খাওয়া প্রমাণিত হয় সমাজ-সংসারে। কিন্তু শাশ্বত এই বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নেয় কয়জন সেটাই দেখার বিষয়।

শিক্ষার আলোকস্নাত ক্যাম্পাসে আঁধারে ঢাকা নৈতিকতা

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে শহীদ করার পর হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ আসমা বিনত আবী বকর রাদিয়াআল্লাহু 'আনহার কাছে গেলে তিনি তাকে উদ্দেশ করে বললেন,

سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ ، قَالَتْ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : مُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন- 'বনী ছাকীফে একজন মিথ্যুক ও একজন রক্তপিপাসুর জন্ম হবে।' মিথ্যুককে তো আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি আর রক্তপিপাসু (সে হলে তুমি)। হাজ্জাজ এ কথা শুনে বললেন, (হ্যা, আমি রক্তপিপাসু তবে তা) মুনাফিকদের বেলায়। [**মুসনাদ হুমাইদী** : ৩২৮; তাবরানী : ২৩২]

রক্তপিপাসু ব্যক্তিটি হলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। ইতিহাসে তার রক্তপিপাসার কথা বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে। তার রক্তপিপাসা এতই তীব্র ছিল যে, সে সব কাহিনী শুনলে গা হিম হয়ে আসে। তার উন্মুক্ত তরবারীর তৃষ্ণা থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন সৌভাগ্য সে সময়ের খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। রক্তে যার এত রক্তপিপাসা সেই লোকটির অন্য একটি ভালো গুণও ছিল। তিনি ছিলেন মুসলিমের বাচ্চা। ধমনীতে তার মুসলিমের শৌর্যবীর্য ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাই তার ইসলামী গায়রত ও আত্মমর্যাবোধও ছিল অত্যন্ত প্রখর। সেই মর্যাদাবোধ থেকেই তিনি ইতিহাসের অমর

এক কীর্তি রচনা করেছিলেন। ইতিহাস যদি সত্য কথা বলে তাহলে সেই কীর্তি তার নামের পাশে চির অম্লান হয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকবে।

রাজা দাহির তখন হিন্দুস্তানের প্রতাপশালী শাসক। তার দ্বারাই হিন্দুস্তানের এক মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিতা হলেন। সেই খবর হাজ্জাজের কানে পড়ার সাথে সাথে চরম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে তার ধমনীতে মুসলমানী গায়রত ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ভারতের মানচিত্র হাতে নিয়ে রাজা দাহিরের এলাকা চিহ্নিত করলেন এবং এর প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা করলেন। ভারত উপমহাদেশে আটশত বছর মুসলমানী শাসন পরোক্ষভাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সেই গায়রতেরই ফসল। তিনি সেদিন একজন মুসলিম তরুণীর সম্ভ্রমের মূল্য উসুল করে নিতে গোটা মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

তার বক্তব্য ছিল, একজন মুসলিম তরুণীর সম্ভ্রমই যদি নিরাপদ না হয় তবে এত খরচ করে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার দরকারটা কী? সেই বোধ আর সম্ভ্রমবোধই আমাদের গৌরব, আমাদের অমর ইতিহাস। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো একজন অত্যাচারী শাসক ও জালেমের মধ্যেও সেই গৌরবের কীর্তিগাঁথার কমতি ছিল না। কিন্তু মুসলিমজাতি আজ তাদের অমরকীর্তির স্মৃতিচারণ করারও সময় পায় না। তাই ফিরে আসে না সেই রোমাঞ্চকর অতীত। রচিত হয় না নতুন কোনো বীরত্বগাঁথা কাব্য। বরং রচিত হয় ঘৃণিত সব অপকর্ম। 'দাহিরপুত্রদের' দ্বারা মুসলিম তরুণীর

সম্ভ্রমহানী হলেও জাগ্রত হয় না সেই হাজ্জাজী গায়রত। বরং আমাদের উদারতার মহাসমুদ্রে হারিয়ে যায় দাহিরের উত্তরসূরী দাহিরপুত্রদের অপকর্ম।

মুক্তবাসিনী বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিন পরের ঘটনা। মাগরিব সালাত আদায় করে বাসায় যাচ্ছি এমন সময় অপরিচিত একটা নাম্বার থেকে কল আসল। কল গ্রহণ করলে কলদাতা আমাকে একহাত নিলেন। এই বইটিতে ঢাকার এক স্কুলের জনৈক শিক্ষকের এধরনের একটি 'কীর্তি'র কথা তুলে ধরা হয়েছিল। তিনি সেই সম্মানিত শিক্ষকের বন্ধু ও সহকর্মী। অনেক আদেশ-উপদেশের পর তিনি আমাকে এই লেখাটির জন্য প্রচ্ছন্নভাবে হুমকিও দিলেন। হুমকির ভাষ্য জেলের ভাত খাওয়ানো, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ইত্যাদি।

একজন শিক্ষকের নামে এধরনের লেখা ওঠা দুঃখজনক, আমিও তা বিশ্বাস করি। তাই ওই শিক্ষকের জন্য আমার প্রবল মায়া হলো। আমি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে আমার লেখার কারণে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া কিংবা কষ্ট পাওয়ার বদলায় রফ'য়ে দারাজাতের দু'আ করলাম। কিন্তু ভড়কে গেলাম না মোটেও। আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. এর একটি উক্তি ও ঘটনা আমার সবসময় কানে বাজে এবং চোখে ভাসে। আগে ঘটনাটি বলি :

আহমাদ ইবন হাম্বল রহ.-এর পুত্র আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমার আব্বা দুআয় প্রায়ই বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা আবুল হায়ছামকে রহম করুন, আবুল হায়ছামকে ক্ষমা করুন।' আমরা বারবার তার

মুখ থেকে এধরনের কথা শুনতাম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন আব্বাকে আবুল হায়ছামের পরিচয় এবং তার জন্য এসব দু'আর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমাকে 'খলকে কুরআনের' ফেতনার সময় জেলখানায় নেয়া হলো। জেলখানায় আমার শাস্তি ছিল দিনে সামর্থ্যবান জল্লাদের হাতের বেত্রাঘাত। দুই হাত বেঁধে আমাকে বেত্রাঘাতের জন্য প্রস্তুত করা হলো। ঠিক তখন আবুল হায়ছাম আমার কাছে এসে বলল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আমাকে চেনেন আমি কে? আমি এই শহরের বিখ্যাত সেই পকেটমার আবুল হায়ছাম। খলীফা আমাকে পাকড়াও করে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন আঠার হাজার বেত্রাঘাত। আমি শয়তানকে খুশি করতে এবং দুনিয়া কামাই করতে সেই শাস্তি খুশি মনে মেনে নিয়েছি**। আমি যদি শয়তানকে খুশি করতে এতো বড় শাস্তি মেনে নিতে পারি**, তবে আপনি আল্লাহকে খুশি করতে হকের ওপর থাকার কারণে যে শাস্তি আরোপিত হচ্ছে তা মেনে নেবেন না কেন?

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আবুল হায়ছামের এই উক্তি আমাকে নির্যাতন বরদাশত করতে সাহস যুগিয়েছিল। এরপর যখন আমাকে বেত্রাঘাত করা হতো তখন এটাকে আমার জন্য কোনো কষ্টের কারণই মনে হতো না। তাই আমি যখন তখন তার জন্য দু'আ করি।'

কলদাতার জেলজুলুম আর আদালতের হুমকি শুনে আমার আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. এর সেই ইতিহাস মনে হলো। আমার

আজ কোনো ভয় নেই। কলম ধরে জেলবাস! তাও হকের তরে! এর চেয়ে গৌরবের জেলবাস আর কী হতে পারে? মানুষ দুর্নীতি, চুরি, বদমাশি করে জেলে যেতে পারলে আমি মানুষের বিবেক জাগাতে গিয়ে জেলে গেলে তাতে অসম্মানী হবে কেন?

যাহোক, লোকটির কথা শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জাতির বিবেক শিক্ষকদেরকে নিয়ে আর কোনো লেখা লিখব না। কিন্তু সমাজের অনাচার আর এই 'মহোদয়দের' কুকীর্তি আমাকে প্রতিজ্ঞা পালনে বাধা দেয়। বিশেষ করে যে সব প্রতিষ্ঠানে সন্তান ভর্তি করে অভিভাবকগণ গৌরববোধ করেন সে সব প্রতিষ্ঠানে যদি ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানীর ঘটনা ঘটে তবে সেক্ষেত্রে চুপ থাকা যায় কি?

ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের সুনাম ও গৌরব দেশব্যাপী। সারা দেশে সব সময় এই প্রতিষ্ঠানটি লেখাপড়ায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন ধরে রাখে। তাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টিও থাকে একটু আলাদা। এখানে সন্তানকে ভর্তি করাতে পারাকে তারা অন্যতম সাফল্য বলে জ্ঞান করেন। ভর্তি করার আগে অভিভাবকগণ সন্তানদের সামনে এই মন্ত্র জপ করেন যে, এখানে ভর্তি হতে পারলে তোমার জীবনটাই পাল্টে যাবে। জীবনের সফলতার সিঁড়িতে কয়েক কদম এগিয়ে থাকবে তুমি!

কিন্তু এধরনের গৌরবগাঁথা কোনো প্রতিষ্ঠানে কন্যা দিয়ে অভিভাবক যদি তার কন্যার সম্ভ্রম নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে সে সমাজের চারিত্রিক সনদ দিতে কাউকে ভিন্ন করে চিন্তা করতে হবে না।

‘নরপশু শিক্ষক পরিমল জয়ধর। রাজা দাহিরের একেবারে খাস শিষ্য। ঘরে স্ত্রী এবং একটি সন্তানও আছে। কিন্তু তবু এই পশু সর্বনাশ করেছিল ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের বসুন্ধরা শাখা (দিবা)-র দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর। একটি মুসলিম দেশে বাস করে সে একজন মুসলিম তরুণীর সম্ভ্রম কেড়ে নিতে সামান্যও কার্পণ্য করে নি। সে ক্লাশে মূলপাঠের বদলে অশ্লীল কবিতা ও গল্প পড়াতো এবং এদিকে ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করত।

ভিকারুননিসা স্কুলের আইন অনুযায়ী ৯৯% শিক্ষক হবেন নারী এবং প্রতি শাখায় সর্বোচ্চ দুজন করে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বান্ধবী বলে পরিচিত হুসনে আরা বেগম এক্ষেত্রে চরমভাবে আইন লঙ্ঘন করেন। তিনি এক শাখাতেই ছয়জন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেন, যাদের প্রত্যেকেই হিন্দু! আমরা সাম্প্রদায়িক শান্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু একটি মুসলিম দেশে যেভাবে একটা দেশকে খুশি করার জন্য হিন্দু বাবুদের প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে তাতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মুসলিমদের জন্য চাকরির কোটা পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও চাকরির ক্ষেত্রে তারা হবে সংখ্যালঘু!

এই স্কুলের আরো নিয়ম হলো নিয়োগপ্রাপ্তরা প্রথম অবস্থায় সর্বোচ্চ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবেন, তার ওপরে নয়। আর নিয়োগপ্রাপ্তির পর দুই বছরের আগে কেউ কোচিং (ব্যবসা) শুরু করতে পারবেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এলাকার লোক আর বান্ধবী হোসনে আরার আস্থাভাজন হওয়ায় পরিমল এসব আইনের

ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম হয়। প্রথম অবস্থাতেই তাকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস দেয়া হয় এবং সিনিয়র শিক্ষকদেরকে অধ্যক্ষ হোসনে আরা বলেন, আপনারা অনেক দিন ধরেই কোচিং করছেন, পরিমলকেও কিছু সুযোগ দিন।

হোসনে আরার নির্দেশে সেই সুযোগ দেয়া হয়েছে কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। এর ফলে দেশের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে। একটি মুসলিম তরুণীর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। একদিন সে কোচিংয়ের ছাত্রীদেরকে বলে, আগামীকাল তোমরা কেউ আসবে না। আগামীকাল পড়াবো না। তার নির্দেশ অনুযায়ী পরের দিন সবাই অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু সে ওই ছাত্রীকে ফোন দিয়ে পড়তে আসতে বলে। ছাত্রীর ধারণা ছিল, অন্য সব ছাত্রীকেও সম্ভবত এভাবে ফোন করে আসতে বলা হয়েছে। সরল বিশ্বাসে সে শিক্ষকের কোচিং সেন্টারে গিয়ে হাজির হয়। পশুটা আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিল। ছাত্রীটি কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার হাত বেঁধে, মুখে ওড়না গুঁজে এই অপকর্ম সাধন করে সে। অপকর্মটা যেন ছাত্রীটি প্রকাশ না করে সেটার ব্যবস্থা হিসেবে সে মোবাইলে ছবি তুলে রাখে এবং বিদায় দেয়ার সময় হুমকি দিয়ে বলে, যদি ঘটনা কাউকে জানানো হয় তবে ইন্টারনেটে এই ছবি ছেড়ে দেয়া হবে। ওই বলি মুক্তবাস। এখানেও মুক্তবাসের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রথম আলো পত্রিকার ভাষ্যানুযায়ী মেয়েটি ২৮মে টি শার্ট ও স্কার্ট পড়ে ক্লাশে গিয়েছিল।

শিক্ষকের হুমকিতে ভড়কে যায় মেয়েটি। কাউকে না বলে নিজের মধ্যে কষ্টকে দাফন করেই স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যায়। এমনকি পশুটার কাছে আবারও পড়তে যায়। এই সুযোগে ১৭ই জুন সে তাকে আবার লাঞ্ছিত করে। ছাত্রীটি এবার বাধা ও তা ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দিলে পরিমল তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

কত বড় স্পর্ধা একজন ‘মালাউনের’! একটি মুসলিম নারীর সম্ভ্রম লুট করবে আর তাতে বাধা দিলে তাকে হত্যা করার হুমকি দেবে! এভাবে মে মাসে সে সুযোগ পেয়ে তরুণীটির সাথে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রথমবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তার ছবি তোলে এবং সেই ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে বারবার সে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রাখে। কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর অর্থবাণিজ্যের বলির পাঠা হয় মেয়েটি। নিজের অজান্তেই লণ্ডভণ্ড হয় তার সম্ভ্রমের সাজানো বাগান। এই নরপশু উত্তরা মডেল কলেজেও এমন অপকর্ম করে বিদায় নিয়েছিল। এমন একটা লম্পটকে শুধু দলীয় বিবেচনা, অর্থবানিজ্যের ভিত্তিতে এমন একটি বিখ্যাত স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব দেয়া হয়! মেয়েটি বারবার নিপীড়িত হয়ে না পেরে শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা প্রকাশ করে দেয়।

সে শুধু ছাত্রীর সাথেই নয়; শিক্ষিকাদের সাথেও অনৈতিক সম্পর্ক ও অনৈতিক আচরণের চেষ্টা করে। ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে গেলে ওই ছাত্রী ও অন্যান্য ছাত্রীর অভিভাবকবৃন্দ নরপশু জয়ধরের শাস্তি

দাবি করতে থাকেন। তারা পরিমলের ছবি পেয়ে তাতে জুতা পেটা করতে থাকেন। এক অভিভাবক বলেন, শিক্ষকরা এখন আমাদের মেয়েদের শরীর ও মন নিয়ে খেলা করা শুরু করেছে! ছি! কী নিকৃষ্ট অভিযোগ শিক্ষার আলো বিতরণকারী শিক্ষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে!

তবে কথা হচ্ছে, কার বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি করছেন অভিভাবকরা? এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যিনি এদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিজ এলাকার বাসিন্দা। যিনি প্রধানমন্ত্রীর কথিত বান্ধবী বলে পরিচিত স্কুলের অধ্যক্ষের আপনজন। আর দলীয় বিবেচনা তো আছেই।

অতএব যিনি প্রধানমন্ত্রীর নিজ এলাকার লোক, দলীয় লোক এবং তার বান্ধবীর আপনজন তিনি যতবড়ই অপরাধ করেন না কেন, এদেশে তার বিচার হওয়া ঠিক নয়। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি হাজ্জাজের আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে দণ্ডায়মান হতে পারবেন না। নিরবে সয়ে নিতে হবে সব অপকর্ম? অবস্থা দেখে তাই মনে হয়। কারণ, অভিভাবকবৃন্দ নরপশু পরিমল জয়ধরের শাস্তি দাবি করে মানবন্ধন করলে অধ্যক্ষ হোসনে আরা স্কুল পরিদর্শনে যান এবং যে সব শিক্ষক প্রতিবাদী অভিভাবকদের পক্ষ নিয়েছেন তাদেরকে তিনি একহাত নেন।

তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, এটা মিউচুয়াল সেক্স। আপনারা আসলে বেশি কনজারভেটিভ! আর বর্মণের লাম্পট্যের কথা বলা হলে তিনি বলেন, কেউ খারাপ নজরে তাকালে আমাদের তো করার কিছু থাকে না! শুধু তাই নয়, প্রতিবাদীদের

বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে চরম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন তিনি। লাঞ্ছিত ছাত্রীর পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টো তাকে খারাপ মেয়ে বলে স্কুল থেকে বহিষ্কার করার কথাও ঘোষণা দেন তিনি!

হায় হোসনে আরা! তুমি কোন্ মায়ের জাত? তোমার কোনো কন্যাকে নিয়ে অন্য কোনো পরিমল যদি এমন ছিনিমিনি খেলা খেলত তাহলে তুমি কি তা নীরবে হজম করতে? তোমার পক্ষে যারা প্রতিবাদ করত তাদেরকেও তুমি একহাত নিতে? তোমার কাছে যদি তোমার সন্তানের সম্ভ্রমের মর্যাদা থাকে তবে নিশ্চয় তা মেনে নিতে না। তাহলে অন্য যাদের সম্ভ্রমের মর্যাদা আছে তারা প্রতিবাদ করলে তাদের বিরুদ্ধে তুমি একহাত নিতে যাও কেন? একজন অধ্যক্ষ কি করে পারে শুধু আপন ও দলীয় লোক হওয়ার সুবাধে এতবড় এক অপরাধীর পক্ষ নিতে? একটি মুসলিম দেশে একটা চাঁড়াল একজন মুসলিম তরুণীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে নিরাপদ থাকবে, ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে, তা কী করে মেনে নেয়া যায়?

হোসনে আরারা তা মেনে নিতে পারলেও এখনও যাদের ধমনীতে ইসলামী গায়রতের কিছু লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে তারা থেমে থাকেননি। এই পশুটার কঠিন শাস্তি বিধান সাব্যস্ত করার লড়াই অব্যাহত রেখেছেন। অবশেষে তাদেরই জয় হয়েছে। পশুটাকে খোঁয়াড়ে তোলা হয়েছে এবং আমরা আশা করব খোঁয়াড়ের কোনো ফাঁক গলে যেন বের হয়ে আসতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। এছাড়া তার সাথে অপকর্মে আরও কারা কারা শরীক ছিল প্যাদানী দিয়ে সে সব তথ্যও বের করতে হবে। খবরে

প্রকাশ, তার আরও যে পাঁচজন সহযোগী আছে তাদের সবাই হিন্দু এবং এদের মধ্যে বরুণ বর্মণের বিরুদ্ধেও ঠিক এরূপ অভিযোগ উঠেছে। এসবটি পশুকে ভাগমতো ঠেঙ্গানী দিয়ে জন্মের মতো খোঁয়াড়ে তুলে রাখতে হবে।

জাতির পক্ষ থেকে প্রশ্ন, যে ক্যাম্পাস শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় স্নাত থাকে সেই ক্যাম্পাসের কুঠুরীগুলোতে নৈতিকতার এত দৈন্য কেন? এসব চাঁড়াল লম্পটদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলতে হয়-

ধড়ে আছে ইসলামী শির
রক্তে আছে তীব্রবেগ
সম্ভ্রমলুটেরা জালিমের বিরুদ্ধে মোরা
'হাজ্জাজ', মাহমুদ বীর খালেদ।

ফ্রান্সের এক শিক্ষক কম্পিউটারে পর্ণ সাইটে প্রবেশ করেছিলেন বলে তার চাকরি কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তাদের বক্তব্য, সারা দেশ উলঙ্গপনায় ভরে যেতে পারে, ঘরে ঘরে উলঙ্গপনার চর্চা হতে পারে। প্রতি ইঞ্চি মাটি নির্লজ্জতার চাদরে ঢেকে যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসবের ঊর্ধ্বে। হাজারও পাপের মধ্যে অন্তত এই স্থানটুকু পবিত্র থাকতে হবে।

অদ্ভুত ব্যাপার! উলঙ্গপনা আর বেহায়াপনার জন্ম দিয়েছে যারা, তারাও অন্তত এতটুকু বোঝে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এসবের বাইরে রাখতে হবে। রাখতে হবে কলঙ্ক ও দাগমুক্ত। কিন্তু যাদের বোঝার দরকার ছিল বুঝল না তারা। আমাদের দেশটা এত

আত্মীয়, দলীয় ও ব্যক্তিকরণ হয়েছে যে, চরম নির্লজ্জ ও গর্হিত কাজ করেও শুধু এসব কারণে মানুষ বিরাট বিরাট শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এই যদি হয় সমাজের ভিত্তি তাহলে এদেশের ভবিষ্যতটার চেহারাটা কীরূপ তা ভাবতেই ভয়ে গা কাঁপুনি ধরে যায়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ ও অন্যান্য জাতীয় দৈনিক, ৪ঠা জুলাই ২০১১ইং]

প্রবাসী পুরুষের সরল বধূ

এক সময় এ দেশের বধূদের সরলতার সুনাম ছিল। তাদের সরলতা নিয়ে প্রবাদ, কৌতুকও তৈরি করা হতো। মনে আছে কি, প্রবাসী স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে বন্দী সরল স্ত্রীটির সেই কৌতুকের কথা, যার অশিক্ষা আর সরলতায় স্বামীর কাছে লেখা তার দাড়ি, কমাবিহীন চিঠিটি এখনও হাসির অন্যতম খোরাকের স্থান দখল করে আছে?

কিন্তু সরলতার সে সব গল্প আজ কেবলই অতীত। আজ বিজ্ঞান গেছে সবখানে, ছুঁয়েছে সকলের হৃদয়। তাই সরলতা আজ অভিধানেই বন্দি। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন গৃহবধূর ঘরেও সুখী মানুষের জামা পাওয়ার মতো সরলতা বস্তুটিও যে খুঁজে পাওয়া পরম অনিশ্চিত, তাতে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই।

যে কোনো পাঠক আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন, তবে সমাজপ্রবাহে ঘটমান হাজারও ঘটনা আমাকে একথা বিশ্বাস করতেই বাধ্য করছে।

বাংলাদেশ দরিদ্র একটি দেশ। এদেশের মানুষের আয় খুবই সীমিত। শিল্পকারখানা তেমন নেই বললেই চলে। অথচ একটি দেশের অর্থনীতির প্রাণ হচ্ছে শিল্প। শিল্প ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন অসম্ভব। আর বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা দুষ্কর। তবে গার্মেন্ট শিল্প আর বিদেশে বাংলাদেশের

শ্রমবাজার কিছুটা হলেও সে ঘাটতি কমিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে বিদেশের শ্রমবাজার। বাংলাদেশের ৩৫% পুরুষ লোক প্রবাসী এবং এই বিপুল সংখ্যক লোকের কষ্টার্জিত অর্থই বাংলাদেশের প্রাণ। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের কষ্টের কথা শুনে কখনও কখনও চোখ ফেটে পানি আসে। নিজেদের সংসারের জন্য করা তাদের এই শ্রম যে দেশের বিপুল কল্যাণ সাধন করে চলেছে, সে কথা ভেবে তাদের জন্য শ্রদ্ধা না এসে পারে না। কীসের রাজনীতিক-ফিতিক! প্রকৃত দেশপ্রেমী এরাই। এরাই দেশের মানুষের স্যালুট পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, দেশের জন্য, নিজ সংসারের জন্য যারা এত কষ্ট করেন আমরা তাদের মূল্য দেই না। তারা নিগৃহিত হন, লাঞ্ছিত হন। কখনও কখনও নিজ পরিবার থেকে তারা এত বড় আঘাত পান, যা তাদের জীবনের সব স্বপ্ন ধুলিষ্মাৎ করে দেয়।

সে সব নিরস গল্পের অন্যতম হলো স্ত্রী পরকীয়া। দৈনিক আমার দেশের ৯ই জুলাই ২০১১ইং একটি রিপোর্ট অনুযায়ী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়াদের মধ্যে প্রবাসী নারীদের সংখ্যাই বেশি। কখনও কখনও একজন লোক কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে এসে বিয়ে করেন। এরপর কিছুদিন দেশে থেকে আবার বিদেশে পাড়ি জমান। যাওয়ার সময় স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান মহাযন্ত্র মোবাইল। সদ্য বিয়ের পিঁড়ি মাড়িয়ে আসা নববিবাহিতা যুবতীটি তখন নিজেকে বড় একা ভাবে। স্বামীর অনুপস্থিতির নিঃসঙ্গতা কাটাতে

যোগাড় করে নেয় কোনো মোবাইল বন্ধু। এভাবে গড়িয়ে চলে মরণনেশা। এ নেশা থেকে সৃষ্টি হয় বিভেদ, দ্বন্দ্ব, খুন-গুম, অর্থ লোপাট, আত্মহত্যা, এসিড নিক্ষেপসহ হাজারো অপরাধ। এধরনের দুয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনা তুলে ধরছি :

ঘটনাটি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার পারকোর্ট ইউনিয়নের শোশালিয়া গ্রামের। এই গ্রামের বাসিন্দা মনির হোসেন দীর্ঘ দশ বছর আগে বিয়ে করেন একই উপজেলার শাহাপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের মেয়ে রিনা বেগমকে। বিয়ের পর থেকেই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য চলে আসছিল। বিয়ের মাত্র ছয় মাস পর মনির বিদেশ চলে গেলে স্ত্রী রিনা পাশের বাড়ির এক যুবকের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং স্বামীর টাকা আত্মসাৎ করতে থাকেন। একজন বিদেশ-বিভূঁইয়ের স্ত্রীর ইজ্জত ও সম্মানের হেফাযত করা প্রতিটি বিবেকবান প্রতিবেশির একান্ত দায়িত্ব। একারণে হাদীসে প্রতিবেশি নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচারকে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, মহা অপরাধ কোনটি? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহর সাথে

কাউকে শরীক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরের অপরাধ কোনটি- এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আহারে ভাগ বসাবে এই আশঙ্কায় নিজ সন্তানকে হত্যা করা। এরপরের অপরাধ কী? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, প্রতিবেশির নারীর সাথে ব্যভিচার করা।' [সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৪৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৬]

একজন প্রতিবেশির কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মান আর স্ত্রীর নিরাপত্তাটুকু না পেয়ে ঘটনা শুনে দেশে ফিরে আসেন মুনির। স্বামীর এক্ষেত্রে প্রশংসাই করতে হয়। প্রথমেই তিনি কঠোরভাবে শাসন না করে সরল পথে স্ত্রীকে নিজ পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীর এই উদারতা স্ত্রী সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। বরং স্বামী তার পথে বাধা হওয়ায় তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শুক্রবার মুনির শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যান। স্বামী বাবার বাড়ি গেলে স্ত্রীর মন আনন্দে ভরে যায়। তাকে সমাদর করা, মনের মতো করে আপ্যায়ন করাতে সে রাজ্যের তৃপ্তি খুঁজে পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে রিনা ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এটাকে তিনি তার পথের কাঁটা দূর করার মহাসুযোগ বলে গ্রহণ করেন। তাই রাতের খাবারের সাথে বিষ মাখিয়ে স্বামীর সামনে পরিবেশন করেন তিনি। বিষের প্রভাবে জীবন সাঙ্গ হয় মুনিরের। স্ত্রীর পরকীয়ায় বঞ্চিত হয় দেশ, মা-বাবা এবং স্ত্রী রিনা নিজেও। স্বামীর খুন মাড়িয়ে কোনো স্ত্রী কখনও সুখের দেখা পেতে পারে? [তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৪ জুন ২০১১ ইং]

বেনারশীতে আগমন কাফনে বিদায়

মানুষের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। এক সময় যে ঘটনা সকলের আত্মা বিদীর্ণ করে, সময়ের আবর্তনে সে ঘটনাই মানুষ অবলীলায় ভুলে যেতে পারে। এক সময় এমনও আসে যে এরূপ ঘটনা সে কোনোদিন শুনেছে বলেই স্মরণ করতে পারে না। তাই আমরা স্থায়ী স্মৃতির পাতায় লিখে যাই এসব ঘটনা। বর্তমান, ভবিষ্যত সবসময় যেন এসব ঘটনা মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেয়, তাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করে তোলে- এই উদ্দেশ্যে।

সকাল থেকে একটা প্রাইভেটকার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে। কোথায় তার গন্তব্য তা কেউ জানে না। এমনকি জানে না গাড়ির চালকও। দামী গ্লাস ভেদ করে গাড়ির যাত্রী কে- তাও ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। উদ্ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত গাড়িটি মৎসভবনের সামনে গিয়ে থেমে গেল। পুলিশ ধাওয়া করে আটক করল চালককে। চালক ছাড়া মাত্র একজন যাত্রী গাড়িতে। গাড়ির ঝাঁকুনিতেও নিস্তব্ধ যাত্রী। নিষ্পলক নীরব হয়ে বসে আছে সে। সন্দেহ করার মতোই ব্যাপার। পুলিশ যাত্রীকে সম্বোধন করল। কিন্তু তবু তার সাড়া নেই। সন্দেহ বাড়ে পুলিশের। এবার যাত্রীকে নাড়া দেয় তারা। পুলিশের মৃদ ধাক্কায় বোঁটা ছিঁড়ে টুপ করে পড়া পাকা ফলের মতো গাড়ির সিটে পড়ে যায় যাত্রী। গাড়ির চালকের চেহারায় তখন রাজ্যের আতঙ্ক।

পুলিশ দ্বিধা-সঙ্কোচে আড়ষ্ট। বাক্যহীন নীরবতায় কেটে গেল বেশকিছু সময়। পুলিশ তাদের দায়িত্ববোধে জেগে ওঠে।
যাত্রীর মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দেয় তারা। পুলিশের হাজারো বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা আছে। তাই তারা সহজে ভড়কায় না। কিন্তু আজকের এই দৃশ্যটা তাদেরকেও ভড়কে দিল। একটি গর্ভবতী নারীর গোটা দেহে ভয়ানক আঘাতের সব চিহ্ন! আঘাতে আঘাতে তার শরীর নীল হয়ে আছে। পেটের যে আকৃতি, তাতে গর্ভের বয়স নয় মাসের কম নয় কোনোমতেই। তবে বাচ্চাটার কী অবস্থা! সেও কি মায়ের সাথে পরপারের বাসিন্দা হয়েছে এতক্ষণে? নাহ্ আর বিলম্ব করা যায় না। থানায় নিয়ে সব রহস্য উন্মোচন করতে হবে।
পুলিশের কাছে দেয়া বিবরণ নিম্নরূপ :
সৈয়দ কামরুন্নাহার নাদিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্রী তিনি। মাস্টার্স পাশ করার পর তিনি বিজনেস এডমিনিস্ট্রে পড়ছিলেন। বাবা মৃত। পেশায় ছিলেন আইনজীবি। আর বরিশালের গৌরনদী থানার টরকীতে অবস্থিত মেঘনা পেট্রোলিয়ামের স্বত্ত্বাধিকারী শফিক। এক জিঘাংসু চরিত্রের মূর্তপ্রতীক। ২০০৩ ইং সালের ১লা এপ্রিল। সেদিন তার পিতা ছুরিকাঘাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছিলেন। একজন আদম সন্তান তাকে এভাবে হত্যা করেছিল। জানেন কে সেই আদম সন্তান? এই শফিকই সেই আদম সন্তান! সেদিন নিজ পুত্রের হাতেই মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছিলেন জন্মদাতা পিতা।

শফিকের রক্তে খুনের নেশার সাথে সাথে যৌবনে ছিল অনৈতিকার নেশা। নারী কেলেঙ্কারী এবং বিয়ে পাগলামো ছিল তার দুধেচিনির স্বভাব। ছাত্র জীবনেই মুক্তবাসের পুরোপুরি ফায়দা উঠিয়েছিলেন তিনি। বেপর্দা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের গোটা রকমের সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনের সেই অভিজ্ঞতা ভোলেন নি। তাই সাংসারিক জীবনে এসে ঘটিয়েছেন এর পূর্ণ প্রয়োগ। প্রথমে বিয়ে করেছিলেন গাজীপুর জেলার নূরজাহানকে (ছদ্মনাম)। মন থেকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিয়ে নুরজাহানকে তিনি অন্য দশটি ভোগ্যসামগ্রীর মতোই ব্যবহার করেন। আর ভোগ্য সামগ্রীর কপালে যা জোটে নুরজাহানের কপালেও তাই ঝুটেছিল।

একটিমাত্র সন্তান জন্ম দিতেই শফিকের দৃষ্টিতে সে ঝুড়িতে পড়ে থাকা পুরানো ক্যালেণ্ডার আর ফ্লাস্কে জমে থাকা ঠান্ডা চায়ের মতো বেকদর হয়ে যায়। ফলে তাকে ফেলে নতুন শিকারের নেশায় ছুটতে শুরু করে শফিক। এরপর মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার ঠেঙ্গামারা গ্রামের আঃ খালেক হাওলাদারের মেয়ে সুবর্ণাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর তার কদরও কমে যায়। তাই শফিক আবার ছুটতে শুরু করে নতুন শিকারের আশায়। এবার তাকে বেশি দূর যেতে হয় না। নতুন ও তৃতীয় শিকার সুবর্ণারই ছোট বোন! বড়বোনকে তালাক না দিয়েই সে সুবর্ণার ছোট বোন সুজিতাকে ২০০৭ইং সালে বিয়ে করে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এরচেয়ে জঘন্য পাপকর্ম আর কী হতে পারে? কিন্তু মুক্তবাসের এই স্রোতে এই সমাজে পাপের অনুভূতিগুলোই ভোতা হয়ে এসেছে! শফিকরা কোনটা বড় পাপ, কোনটা ছোট পাপ সেসবের হিসেব কমই করে। কিন্তু হাজার হলেও মুসলিম দেশ। এদেশের মানুষের মনে এখনও ইসলামের মায়া আছে। **তারা এখনও অনৈতিকার চরম অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হন**, ব্যথিত হন এবং এধরনে দুরাচারদেরকে মাঝেমধ্যে কিছু দেখিয়ে দেন। তাই ঠেঙ্গামারা গ্রামের লোকেরা তাকে আচ্ছা মতো ঠেঙ্গানী দিয়েই গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। ঠেঙ্গা খেয়ে, সে ঢাকায় চলে আসে এবং এক স্ত্রীকে ঢাকায় ও অপর স্ত্রীকে টরকীতে রাখে। এভাবে দুইবোনকে নিয়ে একসাথে সংসার করে শফিক। দিনেদুপুরে চালিয়ে যায় একটি জঘন্য অপরাধ।

এই শফিকেরই ৪র্থ স্ত্রী নাদিয়া। আজ এটাই তার বড় পরিচয় এবং এই পরিচয়ই তাকে এমন নিষ্ঠুর পরিণতির কাছে টেনে এনেছে। পুলিশের কাছে শফিকের বর্ণনা অনুযায়ী সে তাকে আগের দিন সারাদিন পিটিয়েছে। হাত, পা ও মুখ বেঁধে পেটানো হয়েছে নাদিয়াকে। হায় নিষ্ঠুরতা! স্বামীর এই নির্যাতনের সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। শুনেছি পৃথিবীর সব পুরুষরাই নাকি এই সময়টাতে স্ত্রীর প্রতি অধিক পরিমাণ টান অনুভব করে। স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতা দেখায়। কিন্তু মুক্তবাসের ভয়ানক ছোবল শেষ পর্যন্ত আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক শিষ্টাচারগুলোকে

এভাবে গ্রাস করে নিল যে, একজন অন্তঃসত্ত্বাকেও এখন অবলীলায় ও নির্মমভাবে প্রহার করা হয়?

প্রহারের আঘাত সইতে না পেরে নাদিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়েন। শফিক তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি তার। ফলে গভীর রাতে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে সে। হত্যা করার পর লাশ গুম করার প্রশ্ন। এ উদ্দেশ্যে সারাদিন লাশ নিয়ে গাড়িতে ঘোরাঘুরি করে শফিক। এসময় বারবার ফোন দিতে থাকেন নাদিয়ার মামা। একেক সময় একেক জবাব দেয় শফিক। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে মৎসভবনের সামনে গিয়ে। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ ২৫/০৪/২০১১]

নাদিয়ার কপালে এভাবে চরম দুর্ভোগ নেমে এলো। এমন একটি পরিণতির জন্য দায়ী কারা বা কী? মর্মান্তিক ঘটনাটা যেদিন পত্রিকায় আসে সেদিন হত্যাকাণ্ডের কোনো কারণ উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ঘটনা পাঠ করেই আমার মনে সংশয় জেগেছিল হয়ত নারীঘটিত কোনো কারণ বা উচ্ছৃংখল জীবনের কোনো সূত্র এখানে থাকবেই। প্রথম দিকে হত্যাকাণ্ডের নানা রকম কারণ উল্লেখ করা হলেও পরে রিমান্ডে শফিক স্বীকার করেছে স্ত্রীর কিছু অনৈতিক আচরণের কারণেই সে এমন নিষ্ঠুর কাজ করেছে। সে আরও জানায়, নাদিয়া এক কলেজ ছাত্রের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ রাখতেন, তার সাথে মাঝেমধ্যে মোটরসাইকেলে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও বেড়াতেন।

মানুষের স্বভাবটা যে স্বৈরাচারী তার একটা প্রমাণ এসব ঘটনা। নিজে যে করছেন তা অন্যের বেলায় দেখলেই গা জ্বলে যায়। শফিক নিজেই যা করছেন স্ত্রীর কাছ থেকেও সে ধরনের আচরণ প্রকাশ পেতেই পারে। কিন্তু তা সহ্য করবেন কেন? তাই নিজে হাজারও অপরাধ করলেও ঠিকই স্ত্রীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। সমাধানযোগ্য অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন চরমভাবে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রকাশ করেছেন পরম পৌরুষ! নারীর ভুলে আর পুরুষের পৌরুষে এভাবেই রচিত হচ্ছে নির্মম আখ্যান। সামাজিক ভারসাম্যহীনতা, নৈতিকাবোধের অভাব, পরস্পরে বোঝাপড়ার ঘাটতি ইত্যাদি কারণে আমরা নিত্যদিন মুখোমুখি হচ্ছি এসব বিব্রতকর পরিস্থিতির সামনে। কবে আমাদের সমাজ সংশোধনের পথে হাঁটবে, সামাজিক শান্তির পথে কদম ফেলবে? কাঙ্ক্ষিত সেই দিনের অপেক্ষা করা ছাড়া কীই বা করার আছে আমাদের? আর কতদিন আমাদের বাঙালী বধুরা এভাবে বেনারশীতে আগমন করে কাফন পরে বিদায় নিতে থাকবে? প্রগতির ধ্বজাধারীরা কি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে দেখবেন?

হিজাব থেকে জিন্স : জীবন থেকে মৃত্যু

যখন জিয়া বিমানবন্দর দিয়ে কানাডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর বাঙালী ও পর্দানশীন নারী। হিজাবে আবৃত হয়ে আনতনয়নে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কানাডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন সেই একই বিমানবন্দর দিয়ে দেশে প্রবেশ করলেন তখন আর তিনি বাঙালী কিংবা পর্দানশীন কোনো নারী নন, পুরোদস্তুর ইউরোপিয়ান-আমেরিকান নারী। আজ তার পরনে টাইট ফিটিং জিন্সের প্যান্ট!
যেদিন বিদেশের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন সেদিন স্বামীর কাছে পুনঃপুন দু‘আ নিয়েছিলেন, বারবার দাম্পত্য ভাব বিনিময় করেছিলেন। কিন্তু যেদিন দেশে ফিরলেন সেদিন বিশ মিনিট পর কোনো মতে সৌজন্যের খাতিরে বললেন, ওহ্ তুমি? তা বলো কেমন আছো?
আধুনিকতা আমাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে সবকিছু উগরে দিয়েছে। দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও দিতে থাকবে। বিজ্ঞানের অবদান কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে কথা বলা মুশকিল। তবে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, মানুষ বিজ্ঞান, উন্নতি আর উৎকর্ষের হাত ধরে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে, যখন তারা নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে কথা বলতে পারবে। হাদীসের বাণী-
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

‘ওই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বনের হিংস্র বাঘ কথা বলবে, কোড়া (চাবুক) কথা বলবে, জুতার ফিতা কথা বলবে এবং স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে যে পাপ করেছে উরু তার সংবাদ দেবে’। [জামে তিরমিযী : **২১৮১**, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মানুষ চতুষ্পদ জন্তুসহ জড় পদার্থের ভাষা পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হবে। তো এই বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে। দেয়া শেষ হয়নি এখনও। ডেটিং, চ্যাটিং আর ম্যাসেজিং হলো এই বিজ্ঞানেরই অন্যতম অবদান! বিশ্বের এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের মানুষের সাথে নিমিষেই যোগাযোগ করতে পারছে। ফেসবুকের মাধ্যমে, মোবাইলের মাধ্যমে। মোবাইলে কথা বলতে গেলে আমাদের দেশে সর্বনিম্ন মূল্য হলেও অন্তত ২৯ পয়সা মিনিটে কথা বলতে হয়। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে এরচেয়ে অনেক কম মূল্যে- বলা যায় প্রায় বিনামূল্যে লক্ষ মাইল দূরে বসে দুইজন লোক পরস্পরে কথা বলছে। শুধু কথাই বলছে না, বরং কম্পিউটার ক্যামেরার কল্যাণে পরস্পরকে দেখে দেখে কথা বলছে!

আজকের যুগে দুইজন যুবক-যুবতী চ্যাট করবে আর পরস্পরে পরস্পরকে দেখবে না- তার কল্পনাকেও বিজ্ঞানের অবমাননা বলে জ্ঞান করা হয়। উৎকর্ষের ধাপ একে একে পেরিয়ে পাগলা ঘোড়ার গতিতে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান। টু-জি প্রযুক্তি ছাড়িয়ে

এখন বাংলাদেশেও থ্রিজি (থার্ড জেনারেশন বা তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তি) সুবিধা সম্বলিত মোবাইল সেবা প্রবেশের জন্য মুখ ব্যাদান করে অপেক্ষা করছে। এই প্রযুক্তির আগমনের মধ্য দিয়ে তখন সাধারণ যুবক-যুবতীরাও মোবাইলেই ইন্টারনেটের সেই বাঞ্ছিত সুবিধা পাওয়ার সুযোগ লাভ করবে। তখন তরুণ-তরুণী আর যুবক-যুবতীদের নৈতিকতার যে পচন ধরবে তা কোন্ ভাগাড়ে নিয়ে ফেলতে হবে আবিষ্কারকদেরকে সে কথাটাও আগাম ভেবে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু তখন কি আমরা পারব বিজ্ঞানের সেই ভার সইতে? এখনই যে বিজ্ঞানের 'ভারে' আমরা কেবলই ন্যুব্জ হয়ে পড়ছি! এই ঋণের দাবানলে আমাদের ঘর পুড়ছে, জীবন ধ্বংস হচ্ছে এবং হাজারও অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদেরকে ভয়ানক পরিণতির অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত বিখ্যাত সব মানুষের জীবনপাতার সজীবতাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

২০১১ইং সালের জুনের ৫ তারিখের কথা অনেকেরই মনে থাকবে হয়ত। সেদিনের সেই ঘটনাটি আমাদের সামাজিক অবক্ষয়, আচরণের নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসের অবমূল্যায়নের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বিখ্যাত বিশবিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিক্ষিকা যদি ভিন্ন সম্পর্কের অভিযোগে স্বামী কর্তৃক চরম নির্যাতনের শিকার হন- চাই সেই অভিযোগ যতই প্রশ্নবিদ্ধ হোক না কেন- তবে সেই সমাজের নৈতিকতা নিয়ে আর বড়াই করা যায় না এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়ে গৌরব করারও কিছু থাকে না। আসলে দেশের গৌরব এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষিকার ব্যাপারে কিছু লেখা আমাদের মানায়ও না, উচিতও না। তবু কলমের কাছে কখনও কখনও ঠেকে যাই। সত্য প্রকাশের সৌজন্যে, মানুষের বিবেকের দরজায় করাঘাত করার জন্য এসব লিখতে হয়। তাই সাহসে, সংকোচে লিখি এসব।

জুমানা বেগম (ছদ্মনাম) ভার্সিটির আন্তঃযোগাযোগ বিভাগের একজন শিক্ষিকা। কিছুদিন আগে কানাডা থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। সেই ডিগ্রিটাই সম্ভবত তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্য মিথ্যা যাই হোক তার স্বামীর মনে সন্দেহ ঢুকেছিল। সেই সন্দেহ এবং পূর্বপর নানা ঘটনাই তাকে স্ত্রীর প্রতি ক্ষুদ্ধ, ক্রুদ্ধ ও হিংস্র করে তুলেছিল। তিনি তার প্রতিভাধর স্ত্রীর প্রতি খড়গহস্ত হয়েছিলেন। ঘটনার দিন তিনি স্ত্রীর ওপর সর্বশক্তি নিয়োগ করে উন্মত্ত দানবতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যান স্ত্রী জুমানা। প্রতিহত বা প্রতিরোধ করার আগেই তিনি চরম সর্বনাশের শিকার হন। স্বামী তাকে বিছানায় ফেলে চোখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে চোখের মনি বের করে ফেলে। মুহূর্তের ঘটনা। স্ত্রী জুমানা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মূল্যবান অঙ্গ চোখের জ্যোতি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান।

মানুষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নেয়ামত হচ্ছে তার চোখ। মনে পড়ে গেল গ্রীসের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকিম জালিনুস (খ্রীস্টপূর্ব

২০১-১৩১ অব্দ) এর কথা। হাকিম জালিনুস চিকিৎসাশাস্ত্রে চোখ বিষয়ে তার লেখা গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন,

بَخِلْتُ عَلَى النَّاسِ بِذِكْرِ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَخْلِيقِ الْعَصَبَيْنِ الْمُجَوَّفَيْنِ مُلْتَقِيَيْنِ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ يَا جَالِينُوسُ، إِنَّ إِلَهَكَ يَقُولُ: لِمَ بَخِلْتَ عَلَى عِبَادِي بِذِكْرِ حِكْمَتِي؟ قَالَ: فَانْتَبَهْتُ فَصَنَّفْتُ فِيهِ كِتَابًا

আমি যখন অল্প কটি কথায় চোখের বিবরণ শেষ করলাম, তখন দেখতে পেলাম যেন আসমান থেকে একজন ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়ে বলছেন, হে জালিনুস! তোমার প্রভু বলেছেন, 'আমার হেকমত উল্লেখের ব্যাপারে আমার বান্দার সাথে কৃপণতা করছ কেন?' তিনি বলেন, আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চোখের উপকারিতা ও অবদান সম্পর্কে দীর্ঘ একটি কিতাব সংকলন করলাম। [তাফসীরে রাযী : ১/২৫]

বস্তুত চোখ এমনই মহামূল্যবান সম্পদ। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা জুমানার এই মহামূল্যবান সম্পদকে নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিয়েছিল। স্বামীর অভিযোগ, স্ত্রী জুমানা কানাডায় যখন ডিগ্রি নিতে গিয়েছিলেন তখনই ইরানী এক যুবকের (নাভেদ) সাথে তার পরিচয় হয়। তার বক্তব্যানুযায়ী তারা নাকি সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন যাপনও করেন। সে সময় তিনি স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে জুমানা তাকে পাত্তা দিতেন না। কথা বলতে গেলে দুয়েক মিনিট কথা বলে তড়িঘড়ি করে মোবাইল রেখে দিতেন।

এমনকি ছোট্ট মেয়েটির সাথেও কথা বলার সুযোগ দেয়া হতো না।

এমনি এক অসুস্থ, অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটে যায় ডিগ্রি আনার সময়গুলো। দেশে ফিরে আসার পরও এই ধারা বহাল থাকে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ কায়িকভাবে এখন দূরে থাকে। মনের দিক থেকে তো আর নয়! তাই ইরানী যুবকের সাথে এখনও চলে ইন্টারনেট চ্যাটিং, মোবাইল ম্যাসেজিং ইত্যাদি। তার স্বামী অসুস্থতা, বেকারত্ব ইত্যাদি কারণে ছিলেন মানসিক রোগী। কিন্তু পৃথিবীতে বোধ হয় একটা ক্ষেত্রে এসে সব রোগের কার্যকারিতা থেমে যায়। সকলেই তখন স্বপ্রতিভ হয়ে ওঠেন। তাই এই লোকটি আর দশটি ক্ষেত্রে মানসিক রোগী হলেও স্ত্রীর এই আচরণের কারণে ঠিকই ক্রোধে, ক্ষোভে ঝলসে ওঠেন। ঘটনার দিন ইরানী যুবকের মোবাইল থেকে জুমানার নাম্বারে একটি ম্যাসেজ আসলে তার স্বামী তা মুছে ফেলেন। পরে এ নিয়েই শুরু হয় বিবাদ এবং বিবাদ থেকে এই অস্বাভাবিক পরিণতি।

জুমানা একজন পরিণত বয়স্কা ভার্সিটির অধ্যাপিকা। তার মতো ব্যক্তি যদি ডেটিং আর ম্যাসেজিংয়ের ফাঁদে পড়ে এভাবে নিজেকে ধ্বংসের হাতে সঁপে দেন তবে আমরা কার ওপর ভরসা করব, কাদের ব্যাপারে আশাবাদী হবো? তরুণ-তরুণীদের উত্তপ্ত খুনে কি সঞ্চালিত করা সম্ভব হবে নৈতিকার জোয়ার?

জুমানা হারিয়েছেন তার মহামূল্যবান দুটি চোখ। আর স্বামী হাসান সাঈদ আজ প্রয়াত ইতিহাস। ঢাকা মেডিকেলে অবহেলা আর অযত্নে তিনি মারা গেছেন। এমনিতেই ছিলেন মানসিক বিকারগ্রস্ত**। স্ত্রী নির্যাতনের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর বোধ**-অনুভূতিটুকু সমূলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এই নিঃস্ব, অসহায় অবস্থাতেই তিনি পরপারে পাড়ি জমান। অথচ কত মধুর ছিল তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক! সপ্তায় প্রায় তিন-চার দিন তারা হোটেলে গিয়ে খাবার খেতেন। স্ত্রীকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন হাসান আবূ সাঈদ। কিন্তু স্ত্রীর এই আচরণ তাকে চরমভাবে নিষ্ঠুর করে তুলেছিল।

হাসানের পরিবারের অভিযোগ, কানাডা থেকে দেশে ফেরার দিন জিয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করে জুমানা প্রথমে মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করেন এবং কিছুক্ষণ পরই ইরানী যুবক নাভেদের কাছে ফোন দেন। কিন্তু নাভেদ ফোন না ধরায় 'নাভেদটা ফোন ধরছে না কেন- বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। স্বামীর সামনেই ঘটছিল এসব। কষ্টে তার বুকের হাড্ডিগুলো জমে যাওয়ার অবস্থা। স্থির নয়নে তাকিয়ে শুধু দেখে যাচ্ছিলেন তিনি। প্রায় বিশ মিনিট পর একান্তই দায়ে ঠেকে জুমানা তাকে জিজ্ঞেস করেন- ওহ তুমি?...

স্ত্রীর এই অবহেলা, অনৈতিক সম্পর্ক, ভালোবাসায় বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি তাকে সীমাহীন ক্রুদ্ধ ও নির্মম করে তুলেছিল। তাই সেদিন বিমানবন্দরে নেমে মাতৃভূমির সবুজ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হতে পারলেও পরের বার যেদিন ভারত থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে

ফিরে আসলেন সেদিন মাতৃভূমির সৌন্দর্য দেখা হলো না। এমনকি একমাত্র মেয়েটির চেহারা দেখারও সৌভাগ্য হলে না। তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা আর্তনাদ করে বললেন, মা! আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না!

হায়! হিজাব থেকে জিন্স এভাবেই একটি সংসারকে তছনছ করে দিলো। জুমানার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলো আর সাঈদের নিলো প্রাণ!

শক্তিপ্রয়োগ : এ গন্তব্যের সরল পথ নয়!

দেশের নানা প্রান্তে ঘটমান হাজারও অবাঞ্ছিত, অযাচিত, দুঃখজনক, বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক, অনভিপ্রেত সব ঘটনাই মুক্তবাসিনী বইটির প্রধান উপজীব্য বিষয়। জানি, এসব ঘটনা শুনতে ভালো লাগে না। ভালো লাগার বিষয়ও না। অপ্রীতিকর ঘটনা শুনিয়ে মানুষের কান ভারি করতে তাই কষ্টও হয় বৈকি। তাছাড়া এসব ঘটনা এখন এত ঘটছে যে, অনেকের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশি। এক তরুণের কথা শুনেছি, সে মুক্তবাসিনী প্রথম খণ্ডের করুণ আখ্যানগুলো পড়ে মন্তব্য করে বলেছে, এসব কাহিনী আমার ঢের জানা আছে! তাই এগুলো শুনতে বা বলতে ইচ্ছা করে না। তার কথা অবশ্যই সত্য। তারুণ্যের সাথে অভিজ্ঞতার এই মিশ্রণ সত্যিই রোমাঞ্চকর ও কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু কথা হলো, তারুণ্যমিশ্রিত এই অভিজ্ঞতার ফলাফল কোথায়? ফলাফলশূন্য অভিজ্ঞতা কি জাতির ভবিষ্যত সমৃদ্ধ করবে? তাই আমি ফলাফলশূন্য অভিজ্ঞতার পক্ষপাতি নই। আমি চাই কিঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ যেন শিক্ষা নেয়, সরল পথের পথিক হয়।

সে যাকগে, এবার আসল কথায় আসি। মানুষের 'মনুষ্যস্বভাব' আছে একটি। বল প্রয়োগ ও জবরদস্তি। সবকিছু মানুষ শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতার দম্ভে হাসিল করতে চায়। শক্তির এই অপপ্রয়োগ যে সব সময় শুভ ফল বয়ে আনে না মানুষ তা স্বীকার করে কই?

সমাজের সাথে মিলেমিশে চলা, সামাজিক আচারগুলোর ক্ষেত্রে সহনশীল ও সংবেদনশীল হওয়া সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া উচিত। অন্যের সম্ভ্রমের মূল্য দেয়া একজন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যথায় সমাজে কেবল মানুষই বাস করবে কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে নিজেকেই পস্তাতে হবে। নিজের হাতেই নষ্ট হবে নিজের আখের।

বিয়েশাদীর ব্যাপারগুলোতে মানুষ এমনিতেই সহনশীল থাকে এবং তাই থাকা উচিত। এক বড়লোকের কাণ্ড শুনেছি। জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওই বড়লোকের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রস্তাবকের পরিচয় ও তার দারিদ্রের কথা জেনে অগ্নিশর্মা হয়ে কষে একটা থাপ্পড় দিলেন তিনি ঘটকের মুখে। এই ঘটনার বহুদিন পর জেনেছি যে মেয়ের জন্য প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই মেয়েটি এখনও বাবার হোটেল ব্যস্ত রেখে চলেছেন। ঘটনা শোনার পর কোনো ঘটক কিংবা অন্য কেউ প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার সাহস পাননি। বাবার দাম্ভিকতা, বড়লোকী আর অহংকারের বলি হয়ে মেয়েটিকে এভাবেই দিনের পর দিন বছরের পর বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছিল। অবশ্য দূরে থেকে শোনা এই ঘটনা কোনো অবাঞ্ছিত পরিণতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল কিনা তা বলতে পারি না। তবে খুব কাছ দেখে দেখা এধরনের একটি ঘটনার সমাপ্তি ঘটেছিল চরম অবমাননা আর লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। বলি সেই ঘটনা :

সদ্য দারিদ্র থেকে উঠে আসা একটি পরিবার। বঞ্চনার পাহাড় মাড়িয়ে আসা সানজিদাদের (ছদ্মনাম) পরিবারে এই কেবলই ঐশ্বর্য্যের ছোঁয়া লেগেছে। সংসার জীবনে নতুন যৌবন পাওয়ার মতো অবস্থা। সে সময় সবকিছু গোছালোভাবে ও সংযত উপায়ে করা সবার সাথে যায় না। গেল না সানজিদাদের সাথেও। মেয়েটার মা-ও অনেকটা অহংকারী হয়ে উঠছেন। পিছে ফেলে আসা অতীত যে পাড়া-প্রতিবেশীদের স্মৃতিতে ভোলার মতো সুদূর নয়, তা তিনি বুঝতেই চান না। সেই না বোঝা থেকে সৃষ্ট দাম্ভিকতা অন্যের হাসির খোরাক হয়। কোনোটা হয়তা তার নিজেরই কাল হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে মানুষ এমন কোনো দাম্ভিকতা আর অহংকার দেখেছে কি যার পতন নেই? অহংকার আর দাম্ভিকতার পতন তো আবশ্যকীয় সত্তা। কিন্তু মানুষের বড় দোষ এই যে, অকাট্য শিক্ষণীয় বিষয় থেকেও তারা শিক্ষা নেয় না। ইতিহাসের পথ বেয়ে সেই চিরচেনা মানবিক নির্বুদ্ধিতার শিকার হলেন সানজিদার মা। সানজিদা তখন ছোট। বালিকা। মেয়েটা সুন্দর ও চঞ্চল। মায়া করে যে দেখে সেই। ওর দুই ফুফুর বিয়ে হয়েছে একই গ্রামে। একদিন সানজিদার ছোট ফুফা আসলেন একটা প্রস্তাব নিয়ে।

প্রস্তাবের বিষয়টি শাশ্বত, তবে সময়টা অগ্রিম হয়ে গেছে। প্রস্তাব ছিল সানজিদার ফুফাতো ভাইয়ের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে রাখার। প্রস্তাবটা যিনি দিলেন তিনি পর কেউ নন। সানজিদারই ফুফুর স্বামী, সানজিদার মায়ের স্বামীর ভগ্নিপতি। তাই খুব

সহজেই প্রস্তাবটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। একেবারেই দুধের বাচ্চা বলে হেসেই উড়িয়ে দেয়া যেত প্রস্তাবটা। তাতেও সাপও মরত, লাঠিও বাঁচত। কিন্তু তিনি তা করলেন না। ঐশ্বর্য্যের উষ্ণতা তার দেমাগ ছুঁয়ে গেল। তিনি নিদারুণ অপমান করলেন প্রস্তাবদাতাকে। 'কত বড় সাহস', 'কী স্পর্ধা, আমার মেয়ের সাথে অমুক ছেলের বিয়ের প্রস্তাব' ইত্যাকর কথা বলে বড়ত্বের এক শেষ দেখালেন।

অথচ নরম ব্যবহার আর কোমল আচরণ মানুষের সৌন্দর্যের অলঙ্কার। পৃথিবীর তাবত জালেম আর ঘৃণিত ব্যক্তিদের সাথেও আল্লাহ তাআলা নরম ও কোমল ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। মনে পড়ে কি কুরআনের সেই আয়াতটির কথা, যেখানে মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের মতো অভিশপ্ত কাফেরের প্রতি কোমল ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন?

﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ۞ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٤٣، ٤٤]

'এবং তোমরা তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে, যাতে সে স্মরণ করে অথবা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।' {সূরা ত-হা, আয়াত : ৪৩-৪৪}

কিন্তু কোথায় সেই মুসা, আর মুসার আদর্শ? সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে যে আজ সানজিদার মায়েদের বসবাস! এদের কঠোরতায় নির্মিত ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আমরা কেবলই খুঁজে বেড়াই অতীতের সেই সোনালী অধ্যায়!

যাহোক, অপমানিত হয়ে লোকটি তখনই বিদায় নিলেন। মুসাবিহীন সানজিদার মায়েদের এই সমাজে আসমানী দাবিদার ফিরাউন যে কোমলতা পেয়েছিল, একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি হয়েও সেই কোমলতাটুকু তিনি পেলেন না। সেদিন তার আত্মায় অপমানের কী দাগ কেটেছিল তা কেউ তালাশ করতে যায় নি। কিন্তু এক যুগ পর ঠিকই প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মার সেই অভিশাপ। বড় অপমান আর কষ্টের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে একটা করুণ ইতিহাস।

সানজিদা উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তাকে ঢাকায় চাকুরে এক পাত্রের সাথে পাত্রস্থ করা হলো। নবপরিণিতা সানজিদার জীবন স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে চলছিল। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে কী ভয়ানক পদক্ষেপ নিয়ে বসে আছে। এভাবে প্রায় তিন বছরের মতো কেটে যায় তাদের দাম্পত্য জীবন। চাকুরে স্বামী ছুটিছাটা পেলে বাড়ি যেত এবং শ্বশুরালয় থেকে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেত। এমনি একটি ছুটি আসল সানজিদার স্বামীর জীবনে। যেই ছুটি তার স্বামীর মৃত্যুপরওয়ানা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। বাড়ি যাওয়ার আগে সে শাশুড়ীর কাছে ফোন দিয়ে বলল, আমি আজ আসছি। আপনি কষ্ট করে সানজিদাকে অমুক জায়গায় নিয়ে আসুন। আমি ওখান থেকে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবো।

সানজিদার মা সরল মনে মেয়ের জামাইয়ের কথায় সাড়া দিলেন। কিন্তু এর আগের দিন ছিল সানজিদার অন্য রকম ব্যস্ততা। তাই মা যখন তাকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রস্তাব দেন তখন সে সানন্দে

রাজি হয়ে যায়, এধরনের ঘটনা আগে কখনও না ঘটায় তার মাও বেশ অবাক হয়ে যান। মায়ের সাথে বাড়ি থেকে বের হয়েই সানজিদা বলে, মা! এই সামান্য একটু পথ। তোমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব! মেয়ের কথায় মা কথা বাড়ালেন না। সন্দেহ করার কোনো উপাদানও খুঁজে পেলেন না তিনি। তাই সরল মনেই তিনি তাকে একা ছেড়ে দিলেন।

সময় বলে চলে আপন গতিতে। বয়ে যায় নির্দিষ্ট বেলা। কিন্তু সানজিদার দেখা নেই। স্বামী তার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বহুক্ষণ পর সে শাশুড়ীর কাছে ফোন দিয়ে সানজিদার অবস্থান জানতে চাইলে সানজিদার মা অবাক হয়ে বললেন- কেন, সে যায়নি?

স্বামী ততধিক উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন- কই, নাতো!

নিজ হাতে বিদায় দেয়ার পর যতক্ষণ অপেক্ষা করলে মেয়ে স্বামীর কাছে পৌঁছতে পারবে বলে অনুমান করা যায় তার চেয়ে বহুগুণ সময় বেশি গত হয়েছে। অতএব এখনও না পৌঁছা স্বাভাবিক কোনো ঘটনার প্রমাণ বহন করে না। তা সানজিদার মা উদ্বিগ্ন হলেন। মুহূর্তের মধ্যে সারা এলাকায় হইচই পড়ে গেল। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে সানজিদার অবস্থান জানার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। আতংক, উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। কিন্তু তবু সানজিদার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশেষে তার সন্ধান মিলল এবং তা বড়ই অপ্রীতিকর জায়গায়! যে ফুফাতো ভাইয়ের সাথে বহুদিন আগে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছিল সেই ফুফাতো ভাইয়ের কাছেই ঠিকানা খুঁজে

নিয়েছিল সানজিদা। বাপ-চাচাসহ বহু আত্মীয় তাকে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু সকলের সামনে দরবারের মধ্যে সে বলেছিল, বাপ-চাচার সাথে সানজিদা যাবে না, গেলে তার লাশ যেতে পারে! সেদিন তার বাপ-চাচারা বোনের বাড়িতে গিয়ে আপ্যায়িত হয়েছেন অবমাননা আর লাঞ্ছনা দ্বারা। কন্যা জন্ম দিয়ে কি এভাবে আপ্যায়িত হওয়া কাম্য কোনো পিতার?

বর্বরতার কারিগর!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় মানুষকে কুরআনের প্রতি আহবান করতে শুরু করলেন। বুদ্ধিমান, সত্যান্বেষী একদল মানুষ তার আহবানে সাড়াও দিলেন। তাদের সততা, চরিত্রমাধুর্যে সুন্দর হয়ে উঠতে শুরু করল মক্কার পরিবেশ। যুবকরা চরিত্রবান হওয়া শুরু করল। নারীরা পেতে শুরু করল তাদের কাঙ্ক্ষিত অধিকার। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের জন্মই হয়েছে সত্যের বিরুদ্ধে লড়বার, মিথ্যার ডামাডোলে নিজের জীবন গড়বার জন্য। সঙ্গত কারণেই মক্কাতেও এর ব্যতিক্রম দেখা গেল না। আল্লাহ তা'আলার কুরআনের বিরুদ্ধে, তার আদেশের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল মক্কার ক্ষমতাসীন নেতারা। তারা শুধু কুরআনের বিরুদ্ধে কথাই বলল না বরং জাতির সামনে তারা কুরআনের বিকল্প রূপও পেশ করল। সেই ঘটনাটিই বর্ণিত হয়েছে সূরা নামলের ৬নং আয়াতে-

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦ ﴾ [لقمان: ٦]

'আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব'। {সূরা লুকমান, আয়াত : ৬}

উতবা নামক মক্কার এই প্রভাবশালী নেতা পারস্য দেশে গিয়ে সেখান থেকে একটা নর্তকী কিনে এনে মক্কার যুবকদেরকে উস্কে দিল। সে নর্তকীকে কুরআনের বিকল্প হিসেবে পেশ করে যুবক ও মক্কাবাসীকে কুরআন শোনা থেকে নিবৃত রাখার চেষ্টা করল। ক্ষমতা আর দাপটের মদমত্তে উন্মাদ হয়ে ভুলেই গেল যে, সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এই লড়াইয়ে তার ব্যর্থতা, পরাজয়, লাঞ্ছনা আর অভিশম্পাত অবশ্যাম্ভাবী। ক্ষমতা মানুষকে এভাবেই উন্মাদ করে দেয়?

বলতে পারেন, পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তপ্ত পাত্র কোনটি? তেলের কড়াই? লোহা জ্বালানোর ব্রয়লার? কিংবা অন্য কিছু? এর কিছুই নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তপ্ত পাত্র হচ্ছে ক্ষমতার মসনদ। স্বর্ণখচিত আর রেশমের ঝালরযুক্ত এসব মসনদ দূর থেকে দেখতে খুব চমৎকৃত মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর কত শাসক, রাজা বাদশা আর দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ক্ষমতার অধিকারী যে এই উত্তপ্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে পুড়ে ছাই হয়েছেন- কয়জন 'দর্শক' সেসবের খবর রাখেন? আসনের উত্তপ্ততায় বিমূর্তরূপ ধারণ করেছিল ফিরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ, হামান, আলেকজান্ডার, গণেশ, দাহিররা। কোথায় গেল তাদের প্রতাপ? আজ যে তাদের উত্তপ্ত আসনে উপবেশনের খাকটুকুরও চিহ্ন নেই! ইতিহাস তাদেরকে মানুষের শ্রদ্ধার দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেছে। আজ তারা হারানো ও ঘৃণ্যঅতীত। কারণ, তারা ক্ষমতার অস্থায়ীত্ব

অনুধাবন করেনি, রাজাসনের ধ্বংসযজ্ঞ উত্তপ্ততা টের পায়নি। আজও আছে এমন শাসক, যারা সাময়িক ক্ষমতার উষ্ণতায় আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে, আল্লাহর বিধানকে তাচ্ছিল্য করে চড়া গলায় কথা বলে। ফলে ধ্বংস হয় নিজে। ধ্বংস করে দেশ, জাতি ও মানবতাকে।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ এদেশের মানুষের দুধে চিনির মতো ব্যাপার। একারণে এদেশে ইসলামবিরোধী শক্তি বহু আগ থেকে তৎপর হলেও আশানরূপ ফলাফল পায়নি। আলেম-উলামা, তালাবা-মাশায়েখ, দাওয়াত-তাবলীগ ইত্যাদি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের কারণে মুসলিমরা এখনও তাদের শিকড়ের সাথেই যুক্ত থাকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে চলেছে। কিন্তু সময়ের স্রোতে ভেসে যেতে বসেছে এমন গৌরবময় হাজারও ঐতিহ্য। ক্ষমতার মদমত্তে আক্রান্ত এক শ্রেণীর মানুষ জাতিকে বিভ্রান্ত করতে বেছে নিয়েছে ফিরাউন নমরুদদের ভূমিকা। কথা বলছে তাদের সুরে, তাদেরই ভাষায়।

১৫ই জুলাই ২০১১ইং সালে দেখা গেল এমনি এক দাম্ভিকতা। এ দাম্ভিকতা কোনো সাধারণ শাসকের বিরুদ্ধে নয়। অস্থায়ী ক্ষমতার সাময়িক কোনো শাসকেরও বিরুদ্ধে নয়। স্বয়ং আহকামুল হাকিমীনের বিরুদ্ধে এই দম্ভোক্তি, ফিরাউনী উচ্চারণ। সেদিন নরসিংদীর টাউন হল মাঠটি আসমানী গযবের আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল নিশ্চয়। কেননা, 'বুদ্ধিমান' মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো মাখলুক তা পারে না। সে সাহস

তারা করে না। আল্লাহর ভয় তাদের নির্বিঘ্ন থাকতে দেয় না। আসমানী শক্তি ও নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চারণ হলে তারা নিশ্চিন্তও থাকতে পারে না। সেদিন জনৈক মন্ত্রী হাজারও জনতার সামনে আল্লাহর বিধান পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কৌশল বাতলে দিয়ে বলেন- 'বোরকা থেকে বাঁচতে হলে ছেলেমেয়েদেরকে নাচগান শিক্ষা দিন।'

কত বড় স্পর্ধা! ফিরাউন, নমরুদ, কারুন, আবূ জাহলরা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করত তা আমরা জানি, কিন্তু কোন্ ভাষায় কোন্ স্পর্ধায় তা করত তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে কখনও সাক্ষাত ঘটেনি। এই মন্ত্রীর কথায় সেই অভিজ্ঞতা হলো। একটি মুসলিম দেশের মন্ত্রী হয়ে হাজারও মুসলিম জনতাকে সম্বোধন করে কোন্ জ্ঞানে তিনি কথাটা বলার সাহস করলেন তা ভাবতেও কষ্ট লাগে। এদেশটা তবে এতই স্বাধীন হয়ে গেল যে, যে যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলবে? পর্দা তো তাদের দৃষ্টির কোনো মাওলানা মুফতীর কথা না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কথা।

তবে কি তিনি জাতিকে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই ম্যাসেজ দিলেন যে, মাওলানা মুফতীদের সাথে লড়াইয়ের দিন শেষ। এবার লড়াই হবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে? তিনিও কি তবে আগের যুগের নির্বোধ বাদশাহদের মতো আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি সঞ্চয় ও তার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং এখন সেই অসম যুদ্ধে লড়বার জন্য লোক সংখ্যা বাড়াচ্ছেন?

ফিরাউন, নমরুদরা যেভাবে প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়ে নিজেদের দল ভারি রাখতে সচেষ্ট থাকত তেমন করে? এযুদ্ধে পরাজয় যে অবশ্যাম্ভবী! ব্যর্থতা অবধারিত! লাঞ্ছনা অত্যাবশ্যক!

দেশ এমনিতেই রসাতলে যাচ্ছে। বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খলা আর মুক্তবাসের ছোবলে নিত্যদিন পুড়ছে হাজার তরুণী-যুবতীর জীবন। লাঞ্ছনার শিকার মেয়েগুলো 'ঘরে' ফেরার আকুতি জানাচ্ছে, অভিশপ্ত জীবনের গ্লানি মুছে পবিত্র জীবনে ফিরে আসার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বখাটেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শিক্ষকদের হাতে সম্ভ্রম খুইয়ে দিশেহারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠছে। ভিকারুননিসার ঘটনায় সারা দেশে যখন তোলপাড় চলছে সেরকম একটি নাযুক মুহূর্তে তিনি এই ঘোষণা দিলেন? এর অর্থ তিনি বখাটেদেরকে আরও উস্কে দিতে চান? পর্দাহীন মুক্তবাসের একজন তরুণী-যুবতীর উদ্বাহু নৃত্য, অর্ধনগ্ন দেহের যৌবনদীপ্ত নারীর কোমর সঞ্চালন কি যুবকদের সাধু বানিয়ে দেবে? নাকি তাদেরকে আরও বেসামাল করে দেবে? একজন রিক্সাচালক ভোটার কথাটা বোঝেন আর ভোটগ্রহীতা মন্ত্রী তা বোঝেন না, একথা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে? আসলে তারা সবই বোঝেন। কিন্তু ক্ষমতার মসনদের সাময়িক উত্তেজনায় তারা চিরস্থায়ী বাদশাহ আল্লাহর রাজত্বের মর্যাদার কথা ভুলে যান এবং সে কারণেই স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখান।

বোন! নালায়েক এসব মন্ত্রীদের কথায় কান পেত না। যিনি পর্দা পালনের আদেশ দিয়েছেন তিনি আল্লাহ তা'আলা, তিনি স্রষ্টা।

আর যিনি পর্দার পরিত্যাগ করার আদেশ দিচ্ছেন তিনি সামান্য মন্ত্রী, তিনি সৃষ্ট। তুমি কার কথায় কান দেবে? মাখলুকের না খালেকের? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»

'আল্লাহর নাফরমানীতে মাখলুকের আনুগত্য নেই।' [তাবরানী : ৩৮]

একটা কথা বলি, আল্লাহ তা'আলার বিধানে তোমার শান্তি অনিবার্য। কিন্তু এসব মন্ত্রীদের আদেশে কী তাই হবে? শোনো, তুমি যদি এদের কথায় কান দাও এবং তাদের আদেশ মোতাবেক নর্তকী হয়ে যাও তখন তোমার পরিণতি কী হবে জানো? তোমার উদ্বাহু নৃত্যের অনৈতিক বিমুগ্ধতায় যুবকরা যখন তোমার সম্ভ্রমের দেহে লাঞ্ছনার নখর বসিয়ে দেবে তখন কিন্তু তারা তোমার আক্রান্ত দেহে প্রলেপ দিতে আসবে না বরং আক্রমণকারীর নখ সুস্থ আছে কিনা সেই চিন্তা করবে।

বিশ্বাস হয় না? তবে কষ্ট করে একবার তাকিয়ে দেখ ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এণ্ড কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ আর জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। ওদের ছেলেরা এসব প্রতিষ্ঠানে কী ঘটিয়েছিল এবং পরে ঘটনার নায়কদের কীভাবে প্রশ্রয় দিয়ে তাদেরকে উল্টো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সে সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি গ্রুপ বিশেষ নাম কুড়িয়েছিল। রেপিস্ট গ্রুপ এবং কিলার গ্রুপ। প্রথম গ্রুপের কাজ ছিল জ্ঞান আহরণ করতে আসা ছাত্রীদের শিকারে পরিণত করা। শুধু কি

তাই? তারা যার ভক্ত, অনুসারী তার মৃত্যুমাসেই তারা ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপন করেছিল! মনে রেখো, ওদের আদর্শের ছেলেগুলো ব্যাটসম্যান লারাদের মতো অপরাজিত ইনিংসে বিশ্বাসী। তাই মানিকরা সেঞ্চুরিতে থেমে থাকবে মনে করে প্রতারিত হয়ো না। হয়ত জুনিয়ররা মানিকের রেকর্ড এতদিনে ভেঙেও ফেলেছে। অতএব সাবধান! তুমি যেন ওদের সেঞ্চুরির রেকর্ডে পরিণত না হও।

তোমাকে নগদ একটি উদাহরণ দিই। তারা তোমাদেরকে নাচগান শিখিয়ে কার উপকার করতে চাচ্ছে সেটার উদাহরণ। জানোই তো, রাজনীতি করতে লোক পুষতে হয় এবং পোষা লোকদের বিভিন্নভাবে চাহিদা পুরণ করতে হয়। আর জৈবিক চাহিদার চেয়ে কঠিন ও অপ্রতিরোধ্য চাহিদা পৃথিবীতে আর কি থাকতে পারে? সেই চাহিদাও ওরা আমাদের বোনদের থেকে উসুল করতে চায় এবং এজন্যই ওরা এই দীক্ষা দিচ্ছে!

সাতক্ষীরা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ খুলনার আযম খান কমার্স কলেজের বিবিএর ছাত্রী লুনা (ছদ্মনাম)। সাথে স্বামীও আছে তার। নাচের বাহারীতে মুগ্ধ করেছেন আগত দর্শকদের। এর প্রতিক্রিয়া লেগে আছে প্রতিটি দর্শকের চোখে-মুখে। উন্মত্তনাচের আগুনের জ্বলছে প্রতিটি লোকের প্রবৃত্তি। নেশায় চুর হয়ে আছে তারা। সবাইকে ছাড়িয়ে আছেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান এবং সম্পাদক পলাশ। রাত এগারটায়

অনুষ্ঠান শেষ হলে জুয়েল লুনাকে হোটেলে পৌঁছে দেয়ার কথা বলে জোর করে মোটরসাইকেলে উঠায়।
স্বামী বাধা দিলেও তাতে কাজ হয় না। স্বামীর কাছ থেকে জোর করে ওই নেতা লুনাকে হোটেলের কথা বলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। অসহায় দর্শকের মতো স্ত্রীর সম্ভ্রমলুটের যাত্রাপথে তাকিয়ে থাকেন তিনি। বাড়িতে নেয়ার পর জুয়েল তাকে ধর্ষণ করে এবং খবর পেয়ে রাস্তার টহল পুলিশের সহায়তায় তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জুয়েল ও পলাশ পালিয়ে যায় আর থানায় গিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন লুনা। [তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন ও অন্যান্য জাতীয় দৈনিক ০৬/০১/১২ ইং]
এবার বুঝলে তো ওরা কেন তোমাদেরকে নাচগান শিখতে বলে? আচ্ছা বোন, আরেকটি কথা বলি। তুমি যদি গান শেখো আর নাচ রপ্ত করো তবে এতে তোমার উপকারিতা কী হবে? লোকে তোমাকে নর্তকী বলবে, গায়িকা বলবে। যুবকরা তোমার মোহনীয় ভঙ্গির নাচে মুগ্ধ হবে, চোখ শীতল করবে আর গান শুনে কানে মধু ঢালবে। আর যদি বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করতে পারো তবে কিছু পয়সা কামাতে পারবে। কিন্তু কী ছেড়ে কী ধরছ সেটারও তো হিসেব করতে হবে, নাকি বলো? তাই ওদের কথায় কান দেয়ার আগে তুমি পর্দার কিছু উপকারীতা জেনে নাও।

১. পর্দা নারীর সম্মান ও ইজ্জত আব্রুর হিফাযত করে। লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। বাঁচিয়ে রাখে ফিতনা-ফাসাদের শিকার হওয়া থেকে।

২. পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের অন্তরকে পবিত্র রাখে। উভয়কে তাকওয়ার ওপর অবিচল তাকতে সহায়তা করে। কথাটি বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿٥٣﴾ ﴾ [الاحزاب: ٥٣]

'এই পর্দা ব্যবস্থা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা বিধায়ক।' {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৩}

পর্দা যদিও বাহ্যিক বিষয় কিন্তু বাহ্যিক এই পরিশুদ্ধিই আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির পরিচায়ক। আর আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি ও নিষ্কলুষতা নারীর সবচেয়ে ঈর্ষণীয় গুণ। যে নারীর আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জিত হয়, সে নারীর সতীত্বও রক্ষিত হয় এবং সেই নারীর সংসারে শান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়।

৩. পর্দা কতিপয় চারিত্রিক গুণাবলীকে সমুন্নত করে। শালীনতা, লজ্জাবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি পর্দারই সুফল। আর বাঁচিয়ে রাখে ঘৃণিত অনেক স্বভাব থেকে। যেমন, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা ইত্যাদি।

৪. পর্দা নারীর আভিজাত্যের প্রতীক। এটা একথার প্রমাণ বহন করে যে, পর্দানশীন নারীটি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত। আপত্তিকর জীবনাচার থেকে সে বহু দূরে।

৫. পর্দা শয়তানের প্ররোচনার দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়। নারী-পুরুষ উভয়কে আত্মিক ব্যাধি ও যন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা দেয়। তাদেরকে অপবিত্র লালসা ও লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। উভয়ের মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ রক্ষা করে।

৬. পর্দা 'হায়া' তথা লজ্জাশীলতা ধরে রাখে। 'হায়াত' (জীবন) শব্দটি এসেছে 'হায়া' থেকে। এর দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, হায়া ছাড়া জীবন চলতে পারে না। অতএব সুন্দর জীবনাচারের জন্য হায়া বা লজ্জাশীলতা অপরিহার্য। আর এই অপরিহার্য গুণ অর্জিত হয় পর্দার দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা যাকে মর্যাদা দিতে চান তাকে লজ্জাশীলতার গুণ দ্বারা গুণান্বিত করেন।

৭. পর্দা নারীকে নির্লজ্জভাবে বাইরে বের হওয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে সমাজ রক্ষিত হয় নারীঘটিত নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে। আজকাল নারীর উদ্ভট চলাফেরার কারণেই তো সৃষ্টি হয়েছে বিপর্যয়, দেখা দিয়েছে নানা রকমের জটিলতা।

৮. পর্দা একটি সুদৃঢ়দূর্গ। যা নারীকে ব্যভিচার, ধর্ষণ এবং এসিডে দগ্ধ হওয়াসহ নানা রকম ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করে। আর তাকে রাখে বখাটে-লম্পটদের কদর্য আচরণ থেকে নিরাপদে।

৯. আরবীতে নারীকে 'আওরাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যার অর্থ লুকায়িত বস্তু। কথাটার অর্থ হচ্ছে; মূল্যবান ও দামি বস্তুর মতো নারীও লুকায়িত ও গুপ্ত থাকা সত্তা। এতেই তার নিরাপত্তা ও সম্মান। এটাই তাদের তাকওয়া ও আল্লাহভীতির দাবি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ۝٢٦ ﴾ [الاعراف: ٢٦]

'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও বেশ-ভূষার জন্য পোশাক দিয়েছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক।' {সূরা আরাফ, আয়াত : ২৬}

১০. পর্দার বিধান পালনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে এবং নিয়মিত পর্দাপালনে তা সুদৃঢ় হয়। মর্যাদাহানীকে মর্যাদাহানী বলেই বুঝতে পারার উপলব্ধি শক্তিকে বলা হয় আত্মমর্যাদাবোধ। রাস্তায় সেজে-গুঁজে বের হবে আর পুরুষরা তার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে থাকাবে এটা নারীর আত্মমর্যাবোধে আঘাত না করে পারে না। আর এই উপলব্ধি শক্তি আসবে পর্দা বিধান পালনের মাধ্যমে।

বোন! আমি তো কথাগুলো বললাম। এবার তুমি এর সত্যতা যাচাই করে দেখ। যদি সত্যতা খুঁজে পাও তবে নিজের মনের সাথে শলাপরামর্শ করো এবং কেবল তখনই এসব লোকদের কথায় কান দিও। নিজের বিবেককে ব্যবহার না করে কারও কথায় কান দেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ?

কারও সমালোচনায় তো আমার লাভ নেই। সেটার অভিপ্রায়ও নেই আমার। কেউ ধর্ম চর্চা করুক বা না করুক, পর্দা মেনে চলুক বা না চলুক সেটা তার নিজের ব্যাপার। কিন্তু নিজের ধ্বংসের ব্যাপারেও কি কেউ আপসকামী হতে পারে। আমি তোমাকে বিশেষ ভাবে বলছি কথাগুলো। কেননা তুমি আমার

বোন। মূল সূত্রে আমরা অভিন্ন। যে দেশ বা ধর্মেরই হও না কেন মূল সূত্রের এই সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তোমার কল্যাণকামী ও উপদেশদাতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষী হতে পারো না। ‘উমর রাদিআল্লাহু ‘আনহু বলেন-

لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا يحبون الناصحين

‘সেই কওমে কোনো কল্যাণ নেই যেখানে কোনো উপদেশদাতা নেই এবং যারা উপদেশদাতাকে পছন্দ করে না।’ [রিসালাতুল মুস্তারশিদীন]

বিখ্যাত বুযুর্গ হারেছ মুহাছিবী রহ. বলেন-

من اوصاك فقد احبك

‘যে তোমাকে উপদেশ করে মনে রেখো সে তোমার কল্যাণ কামনা করে।’

অতএব আমার কথাগুলো তুমি ভেবে দেখ। আচ্ছা, তুমি কি একথা ভাবছ কিংবা মন্ত্রীরা তোমাদেরকে ভাবাচ্ছে যে, পৃথিবী আজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সাফল্য ও সমৃদ্ধির চূড়া ছুঁয়ে ফেলেছে। ধূলির ধরা ছাড়িয়ে মানুষ এখন পৌঁছে গেছে নানা গ্রহে-উপগ্রহে। সারাবিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। সুতরাং এই যুগে পর্দা করা যাবে না। কেননা পর্দা করা মানে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া! নিজেকে সুখসাগর থেকে বঞ্চিত করা। আমাদের মুক্তিতো নারী স্বাধীনতায়, ইসলাম উপক্ষোয়!

‘শিক্ষিতা বোনটি আমার! তুমি পাশ্চাত্যের জাল স্বাধীনতায় প্রলুব্ধ হয়ো না। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর হৃদয়কাড়া চিত্র দেখে

নিজেকে প্রবঞ্চিত ভেবো না। ওদেরকে সুখসাগরে ভাসতে দেখে নিজেকে হতভাগী মনে করো না। পশ্চিমা নারীদের ভেতরের খবর নাও। তবেই তাদের সুখের মাজেযা ধরা পড়বে। তোমাকে হলফ করে বলতে পারি, ওরা মোটেও ভালো নেই।

নিয়মিত পত্রিকায় সংবাদ আসছে, পশ্চিমা নারীরা তথাকথিত স্বাধীনতার বোঝায় নুয়ে পড়ছে। সব ছেড়ে ছুটছে ইসলামের রুজ্জুর দিকে। এভাবে ইসলাম গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। Daughter of another নামক বইয়ে (বইটি 'অন্যপথের মেয়েরা' শিরোনামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে) চল্লিশজন মার্কিন তরুণীর কথিত নারী স্বাধীনতার ধর্ম পরিহার করে পর্দার ধর্ম ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস লেখা হয়েছে। তারা সবাই নারী স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ দেখে আসা মানুষ। তাদের কাছ থেকে দীক্ষা নাও। বৃটেনের সান ডে এক্সপ্রেস পত্রিকার নারী সাংবাদিক রিডলি আফগান নারীদের বোরকা নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নিজেই সেই পর্দার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যে ভারত তসলিমার মতো একটা কুলটা নারীকে আশ্রয় দিয়েছে সেই ভারতেই আরেক নারী মালায়লম ও ইংরেজি ভাষায় খোলামেলা ধরনের লেখিকা কমলা দাস এখন সে সব লেখেন না। লেখেন পর্দার কথা। কেননা তিনিও পর্দার আশ্রয়ে খুব ভালো আছেন এখন। মনে রেখো এদের কেউই অশিক্ষিত নয়। শিক্ষিত এবং জেনেবুঝেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এখন পর্দা করছেন।

উচ্চাভিলাষী বোন আমার, ইসলামের সীমানায় থেকে তুমি সবই করতে পার। যদি পড়তে চাও তবে যত ইচ্ছে পড়তে পার। ব্যবসা, চাকুরি কিংবা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পার। শুধু পর্দা লঙ্ঘন করো না। শরীয়তের গণ্ডি অতিক্রম করো না। মনে রেখো, ইসলাম তোমার অগ্রযাত্রায় বাধা নয়। পর্দাও অন্তরায় নয় প্রগতির পথে। ইসলাম চায় তুমি যেখানেই থাক তোমার সতীত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান রক্ষা হোক। তোমার কোমলতা, সৌন্দর্য এবং ভদ্রতা বজায় থাকুক। ইসলাম তোমাকে বন্দি করতে ইচ্ছুক নয়। কোনো চরিত্রহীন যেন তোমাকে কলংকিত না করতে পারে, ছলে-বলে-কৌশলে তথা কোনোভাবেই তোমাকে অপমানিত না করতে পারে- এই ইসলামের অন্বেষা।

আমার স্কুল-কলেজগামী বোন, বখাটেদের ইভটিজিং থেকে বাঁচতে চাও? এসো পর্দার আশ্রয়ে। অমানুষদের এসিড সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে চাইলেও এসো পর্দার নিরাপত্তায়। যৌতুক তোমাকে দিতে হবে না বরং নগদ মোহরানা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে যদি তুমি হিজাবে সুশোভিত হও। এ আমার দাবি নয়; বাস্তবতা। পরিসংখ্যান দেখলেই জানতে পারবে পর্দানশীনদের অল্পজনই এসব অমানবিকতার শিকার হয়।

বোন, আধুনিকতার নামে তুমি নিজেকে অসম্মান ও অনিরাপদ করো না। হেদায়েতের আলো বঞ্চিতদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ো না। ওরা বুঝাতে চায়, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উৎকর্ষের এই যুগে আবার ধর্ম কেনো? সভ্যতাগর্বী এসব মানুষের

অপপ্রচারে তুমি প্রভাবিত হয়ো না। ওরা জানে না এর আগেও পৃথিবীতে তাদের মত সভ্যতাগর্বী জাতি ছিল। তারা আজ কোথায়? বল, সপ্তমাশ্চর্যের তাজ মহল এবং পিরামিড যারা গড়েছে তাদের কেউ কি পৃথিবীতে বেঁচে আছে? দয়াময় আল্লাহ কত সুন্দর করে ইরশাদ করেছেন-

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ [غافر: ٨٢]

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে নি, তাহলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? তারা পৃথিবীতে ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক। আর শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়ে অধিক প্রবল। অতপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কাজে আসে নি। (গাফির : ৮২)

আমার প্রিয় বোন, রূপ বা তারুণ্যের জোয়ারে ভেসে যেও না। দেহের শক্তি ও সৌন্দর্যের কোনো স্থায়ীত্ব নেই। তিনি চাইলে যে কোনো সময় তা কেড়ে নিতে পারেন। দেখ কত সুন্দরী রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে চিরবিদায় নেয়। কতজন না মরে পঙ্গুত্ব বা অন্ধত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকে। তুমি যে এর অসহায় শিকারে পরিণত হবে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? পৃথিবীতে কত সুন্দরীই তো ইতিহাস হয়ে আছে; কিন্তু তারা কি কেউ মৃত্যুর দংশন থেকে বাঁচতে পেরেছে? হৃদয়কাড়া চেহারা দেখিয়ে অহংকারের সঙ্গে পথ চলো না। জগতঅধিপতির ভাষায় :

﴿ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا ٣٧ ﴾ [الاسراء: ٣٧]

তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো ভূমিতে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং কখনো পাহাড় সমান উচ্চতায় পৌঁছতেও পারবে না। {সূরা আল-ইসরা : ৩৭}

প্রাণপ্রিয় বোন, তুমি কি জান বেপর্দার কুফল কী? পর্দার প্রতি যত অবহেলা করা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ততই বাড়ছে। জাতি হিসেবে আজ আমরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। কিন্তু বল, নারীদের প্রতি সামাজিক অনাচার বেড়েছে না কমেছে? নিত্য-নতুন পন্থায় নারীদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। এই পর্দা লঙ্ঘনই কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্কের প্রথম ধাপ আর নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশাই যে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এইডস্-এর মতো নানা রোগ ডেকে আনে, তা তো আজ অমুসলিমরাও স্বীকার করছে।

অতএব এসো মুক্তির পতাকাতলে। নিরাপত্তার সুরক্ষিত গণ্ডিতে। পর্দা শুধু তোমার ইহকালীন জীবনকে নিরাপদই করবে না, নিশ্চিত করবে তোমার সম্মান-সমৃদ্ধি। আখিরাতে নাজাত পাবে তুমি জাহান্নামের কল্পনাতীত শাস্তি থেকে। মনে রেখো :

﴿ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ٨١ ﴾ [التوبة: ٨١]

'জাহান্নামের আগুন অনেক কঠিন। যদি তারা বোঝে। {সূরা আত-তাওবা : ৮১}

জাহান্নাম থেকে তো বাঁচবেই সেই সাথে চির শান্তির ঠিকানা জান্নাত হবে তোমার আবাস। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন। (আলী হাসান তৈয়ব, মুসলিম বোনদের প্রতি খোলা চিঠি, সূত্র : www.islamhouse.com)

মুক্তবাসের শিক্ষালয়

শিক্ষাকে আমরা জাতির মেরুদণ্ড জ্ঞান করি। সে শিক্ষা নারীর হোক বা পুরুষের। পৃথিবীতে শিক্ষাবিদ্বেষী কোনো লোক আছে বলে আমার জানা নেই। তবে শিক্ষাটা কোথায় হচ্ছে, কারা দিচ্ছেন এবং শিক্ষার ফলাফলটা কী হচ্ছে- তা ভেবে দেখা বা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা কিন্তু মোটেই অযৌক্তিক নয়। কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় যদি নারীর সম্ভ্রম হারানোর ব্যবস্থা থাকে কিংবা সম্ভ্রম রক্ষার নিশ্চয়তা না থাকে তবে সেই ব্যবস্থাকে জাতির মেরুদণ্ড বললে ইনসাফ করা হবে কিনা- সেটাও কিন্তু ভেবে দেখা আমাদের দায়িত্বের আওতায় পড়ে। আমরা সেই দায়িত্ব পালন করছি কিনা এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান হালতের ওপর সন্তুষ্ট থাকা যায় কিনা সে যাচাইয়ের জন্য নিম্নে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরছি।

‘ঘটনা : ১

এক তরুণ আলেমের বক্তব্য। একদিন তিনি টঙ্গীর স্টেশন রোড থেকে বেবি ট্যাক্সিতে ওঠেন কামারপাড়ার উদ্দেশে। তার মুখোমুখি সিটে বসা এক তরুণের সঙ্গে দুই তরুণী। ইজতেমা-ময়দানের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি চলা শুরু করার খানিক বাদে তরুণীদ্বয়ের একজন আচমকা ওই আলেমকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হুজুর, কিছু মনে না করলে আপনার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে একটু দেবেন।’

-কেন? জানতে চান ওই আলেম।

-আমার কিছু প্রাইভেট প্রশ্ন আছে। আমি একান্ত ভাবে তা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব। বললেন তরুণী।

একটা ট্যাক্সিতে বসে এভাবে অপরিচিত একজন তরুণীকে নাম্বার দেয়াকে উচিত মনে করলেন না তিনি। তার ইতস্ততা দেখে তরুণীর কণ্ঠ থেকে অনুরোধ ঝড়ে পড়লো, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মতো। ভয়ের কারণ নেই। একটি সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার সাথে খোলাখুলি কিছু কথা বলা দরকার বলে নাম্বারটা চাইছি। যদি মোবাইল নাম্বার না দিতে চান তবে অন্তত গাড়ি থেকে নেমে মিনিট পাঁচেক সময় দেবেন আমাকে। আমি মানসিকভাবে খুবই অশান্তিতে আছি, দয়া করে আপনি আমাকে হতাশ করবেন না।'

একজন মানুষের এত কাকুতি-মিনতি দেখে না করে পারা যায় না। তাই তিনি তাকে সময় দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ট্যাক্সি থেকে নেমে তার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন।

তরুণীটি যে সমস্যার কথা বললেন, তার সূত্রপাত কবে ঘটেছে, এর গভীরতা কত- তা আমাদের মতো ঘরকুনে লোকের পক্ষে জানা কঠিন। আমরা শুধু দূর থেকে অনুমান করতে পারি কিন্তু গভীরতা যাচাইয়ের মতো ডুবুরীর দৃষ্টিতো আমাদের চোখে নেই। তাই মেয়েটির কথা ও সমস্যা সমাজের আরও দশটি ঘটনা ও সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করলেও তরুণ আলেম তা শুনে বেদনায় থমকে গেলেন। মেয়েটি বললেন- 'বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লিভ টুগেদার

করায় পেটে সন্তান এসেছিল। কয়েকদিন আগে আমি সন্তানটি নষ্ট করেছি। তারপর থেকে মানসিক পীড়ায় ভুগছি, আমার শান্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমার এই কাজটি ইসলাম সমর্থন করে কিনা- তা জানার জন্যই আপনাকে বিরক্ত করলাম! বলুন তো আমার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? এখন আমার করণীয়ই বা কী?'
আলেম বললেন, 'সন্তান নষ্ট করার কথা বলছেন! এতো অনেক পরের প্রশ্ন। একটি ছেলের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন তো দূরের কথা তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করাই অপরাধ। আর গর্ভজাত সন্তান নষ্ট করা সম্পর্কে আল্লাহ তো কুরআনে স্পষ্টই বলেছেন কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা তাকবীর, আয়াত : ৯)
আপনি এতগুলো স্তর পার করে এসে শুধু সন্তান হত্যা করার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন!
তরুণ আলেমের বিস্ময় দেখে যুগ সম্পর্কে তার ধারণার প্রতি করুণা হলো তরুণীর। তিনি তাকে ততধিক বিস্মিত করে বললেন- 'হুজুর, এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন?। আমাদের সোসাইটিতে ওতো হরহামেশাই ঘটে চলেছে! আমাদের ইউনিভার্সিটির (নাম উহ্য রাখা হলো) শতকরা পঁচানব্বই ছাত্রছাত্রীই তো লিভ টুগেদার করে! আমরা কেউ তো এটাকে সমস্যার কারণ বলে মনে করি না! তবে আমার খারাপ লাগছে গর্ভজাত সন্তানটাকে নষ্ট করলাম বলে। বাচ্চাটির জন্য মায়া হচ্ছে। ইস্, পূর্ব সতর্কতা সত্ত্বেও কীভাবে যে বাচ্চাটি আমার গর্ভে

স্থান লাভ করলো আর নিষ্ঠুর হাতে তাকে হত্যা করতে হলো!’

ঘটনা : ২

বর্তমান প্রজন্মের নারীদের প্রতি ক্রমেই আস্থা হারাচ্ছে আমাদের যুবক সমাজ। হয়ত চোখের সামনে ঘটা নানা ঘটনাই তাদেরকে আস্থাহীন করে তুলে থাকবে। বিশেষ করে স্কুলকলেজের ছাত্রীদের কথা বলতেই হয়। অনেককে তো তাদেরকে... বলে বকা দিতেও শোনা যায়। যদিও এতে নিরাপরাধ অনেক মেয়ের ব্যাপারে অন্যায় ধারণা করা হচ্ছে কিন্তু করার কিছু নেই। কয়েকটি লজ্জাজনক ঘটনার পর এধরনের ধারণা পোষণকারীদেরকে খুব বেশি দোষারোপও করা যায় না। বিশেষ করে ইডেন কলেজ আর ভিকারুননিসার মতো বিখ্যাত স্কুল-কলেজগুলোতে যা ঘটে গেল তাতে খোদ অভিভাবকরাই কন্যাদের ব্যাপারে সন্দিহান। সেখানে অন্যকে দোষারোপ করতে যাওয়া কি ইনসাফ হবে?

আমার বন্ধুর বন্ধুর কথা। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ছাত্র তিনি। বয়সে আমার বন্ধুর কয়েক বছরের বড়। হাফেজ মাওলানা হয়ে এখন তিনি অনার্স করছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তীক্ষ্ণ মেধা ও সুন্দর মনের অধিকারী এই কলেজ ছাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুর সাক্ষাত ঘটে ঈদুল ফিতরের কোনো এক ছুটিতে। তারপর বগুড়ার বিখ্যাত সাতমাথার অদূরে খোকন পার্কে গল্পের পসরা নিয়ে বসেন তারা। দরকারি-অদরকারি নানা প্যাচালের ভিড় ঠেলে অবশেষে আসে আসল প্রসঙ্গ। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তা পণ্ডিত মহাশয়, বিয়েথার কী খবর? কথা শুনে কেমন যেন ভাবনার

জগতে মিলিয়ে গেলেন কিছু সময়ের জন্য। তারপর বললেন, 'ভাই, ও কথা আর বলো না। আমার কপালে কি বিয়েথা আছে! কবে কোথায় চাকরি পাবো, তারপর যদি কোনো 'ভাবি শ্বশুর আব্বার' দয়া হয় তবেই না বিয়ে!' বন্ধু বললেন, আরে ওই সব বিনয়ী ডায়ালগ অন্যদের জন্য রিজার্ভ রেখে বন্ধুদের কাছে আসল কথা বলো। বন্ধুদের সাথে ভনিতা চলে?

বন্ধুত্বের কসমের কাছে তিনি হার মানলেন। এবার তার মুখ থেকে সত্য কথাটাই বেরুলো। তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কী, আমি কোনো অশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না। এদিকে শিক্ষিত মেয়েদের যা দেখছি, তা না বলাই শ্রেয়।' জোর করে ধরলাম, বলতেই হবে। বললেন, 'আমি আসলে কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করতে পারব না।' বললাম, এসব অতি ভালোমানুষী উক্তি যত কম বলা যায় তত ভালো। বললেন, 'ডায়লগ নয়; সত্যি বলছি। আমি তো নিজের কানকে আর অবিশ্বাস করতে পারি না। এই তো কিছুদিন আগেই একদল মেয়েকে বলতে শুনলাম, তারা দেহ ব্যবসা থেকে ফিরে এসে ছেলেদের ওপর ক্রোধ উদ্গীরণ করে বলছে, 'তোরা আমাদের থেকে যৌতুক নিবি না? নিস্, আমরা যৌতুকই কামাই করছি তোদের জন্য!' বললাম, দেখেন ভালো-মন্দ সব জায়গায়ই আছে। সবাই তো এক রকম না। বললেন, আমি শুধু নিজের ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, ওখানকার নব্বইজন ছাত্রীরই আছে বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্কের অভিজ্ঞতা।

আর আমি যে ওই বাকি দশ পার্সেন্টের একজনকে পাবো তার নিশ্চয়তা দেবে কে? অতএব যেমন আছি তেমনই ভালো!

ঘটনা : ৩

কোনো এক রমযানের ঘটনা। ক্রমেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠা ঢাকা শহরে চলাফেরা করা আর দুর্গমগিরি কান্তার মরু পাড়ি দেয়া সমান ব্যাপার হয়ে উঠেছে। রমজান মাস আসলে তা বহুগুণে বেড়ে যায়। ঢাকার রাস্তাগুলো তখন মানুষের কাছে পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার মতো কঠিন বলে মনে হতে থাকে। এমনি এক দিনে মানুষ যখন যানজটের জাহান্নামে ভারি ভারি শ্বাস নিচ্ছে তখন দেখা গেল সত্যিকার এক নারকীয় দৃশ্য। ঘটনাটা কাকলীর। গাড়ির ভ্যাপসা গরমে আর মানুষের ঠাসাঠাসিতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় যাত্রীরা গাড়ির জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে তাকাচ্ছে। সেই তাকানোতেই ধরা পড়ল ঘটনাটা। মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠল।

অনেকগুলো র‍্যাবের গাড়ি। র‍্যাব আর জনতার সংখ্যা হাতে গোনার মতো নয়। ঘটনার মূল নায়ক কয়েকজন ললনা। তারাই সব কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। দেখা গেল, ‘হোটেল ঢাকা ইন’ থেকে বেরিয়ে আসছেন একদল মুখ আড়াল করা ললনা! পোশাকই বলে দিচ্ছে এরা ঢাকার বিভিন্ন কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রী। শিক্ষাঙ্গন আলোকিত করা বাদ দিয়ে তারা কলুষিত করতে এসেছিলেন ঢাকার চেনাজানা কয়েকটি আবাসিক হোটেল। সেখান থেকেই অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করে

থানায় নেয়া হচ্ছে! আহ্! যে ওড়না দিয়ে তারা মুখাবয়ব ঢেকে রেখেছে তা এসব আল্ট্রা মডার্নদের দৃষ্টিতে অন্য সময় তো চক্ষুশূল। কিন্তু আজ কেন তা যক্ষের ধন!

হ্যা, এভাবেই মুক্তবাসের উচ্ছলতা আর যৌবনের পাগলা হাওয়ায় উড়তে থাকা টিনএজাররা রসাতলে যাচ্ছে। চারদিকে চলছে জাতির সবচে মূল্যবান সম্পদ যুব সমাজকে ধ্বংস এবং আদর্শিকভাবে পঙ্গু করার নানা আয়োজন। মুক্তবাস যার পথকে করেছে উন্মুক্ত। পর্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এই সমাজের চিন্তা আর পরিকল্পনার বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে তরুণ-তরুণীদের এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়ার নানামুখী তৎপরতা। একসাথে ক্লাস, একসাথে আড্ডা, একসাথে পরীক্ষা ও একসাথে চলাফেরা। সর্বোপরি লেখাপড়ার অজুহাতে ব্যবধানের সব দেয়াল তুলে দেয়া। সর্বত্র পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার রমরমা কারবার। আছে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির সম্ভাব্য সব আয়োজন। এদিকে ক্লাসে আলোচনা প্রেম নিয়ে, গল্প-উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়ও অভিন্ন। নাটকে-সিনেমায় এবং বন্ধুদের আড্ডাতেও সেই উচ্ছসিত জীবনের মধুর অধ্যায়!

এত কিছুর যোগফলে যখন তরুণ-তরুণীদের স্বভাবজাত বাসনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, টাইগার-স্পীড খাওয়া টগবগে যুবকরা যখন রিপুর দংশনে ছটফট করতে থাকে, তখন তাদের সামনে পেশ করা হয় প্রতিষ্ঠিত হয়েই বিয়ে করার অমূল্য উপদেশ। ‘এত অল্প বয়সে বিয়ে নয়। মাত্র ত্রিশ বছরে বিয়ে! সে তো গ্রাম্য কালচার!

অথচ এই বয়সের লোকদের পবিত্রতা ও চরিত্র সংরক্ষণের তাগিদ দেয়া হয়েছে তীব্রভাবে। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু 'আনহু এই সময়ের সমস্যার কথা ব্যক্ত করলেন এভাবে-

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا

আমরা কিছু যুবক ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সময়ে যারা বিবাহ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য রাখতাম না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ؛ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা এটা দৃষ্টির হেফাযত এবং লজ্জাস্থান পবিত্র রাখার সর্বোত্তম উপায়।' [বুখারী : ১৯০৫]

কিন্তু আমাদের সমাজ চলছে উল্টোস্রোতে। উন্মত্ত যুবককে যৌবনের সূচনাকালে নিবৃত রাখা হয় নাবালেগ বলে আর পূর্ণযৌবনে আটকে রাখা হয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে। তাহলে অধপতিত এই সমাজের চারিত্রিক অবস্থা ধরে রাখার উপায় কী?

আগুনের কাজ দহন করা। এটা তার ধর্ম। ভিন্ন যুক্তি বুঝিয়ে তো বস্তু বা কোনো সত্তার স্বীয় ধর্ম বদলানো যায় না। যৌবনের ধর্মও তো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। বিপরীত লিঙ্গকে কাছে পেতে যা দরকার তা-ই করা। এত কিছুর মাধ্যমে তরুণ-

তরুণীদের সহজাত যৌন লালসাকে উস্কে দেয়া হচ্ছে ঠিক। কিন্তু এ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের বৈধ দরজা আটকে রাখা হয়েছে শক্ত খিল দিয়ে।

বাল্য বিয়ে ঠেকাতে গিয়ে যৌবনের বিয়ে ঠেকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এমনকি আইন করে ঘোষণা করে হচ্ছে, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে শিশুই থাকে! কথাটা একেবারেই ফালতু। আজকের এই যুগে ১৮ বছরেও কেউ শিশু থাকে একথা শুনে শিশুরাও খিলখিল করে হাসবে!

স্বাভাবিক পথে বৈধ কাজ করলে নিন্দা কুড়াতে হয়। তিরস্কার ও ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়। অথচ চোরাইপথে অন্যায় করলেও তাতে দোষের কিছু নেই! এমনই যে সমাজের নিয়ম সেখানে আর শান্তি থাকে কী করে। যা হবার তাই হচ্ছে। আগুন নিভছে না। আরও উত্তপ্ত হচ্ছে। বিবাহপূর্ব ভালোবাসা, লিভ টুগেদার ও পরকীয়ার ঘটনা বেড়েই চলেছে। অহরহ জ্বলছে সুখের ঘরে দুখের অনল। পাপে তো বাপকেও ছাড়ে না। এরা পাপ করতে করতে হারিয়ে যাচ্ছে পাপের চোরাগোলিতে। এসব বখে যাওয়া ‘সন্তানকে নিয়ে অভিভাবকরা যে কী বিপদে আছেন, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবে ভাবার তালিকায় কিন্তু মুক্তবাসের কুফলটাই আগে থাকা চাই!

পাপের অনুভূতি ধীরে ধীরে এত ক্ষীণ হতে চলেছে যে, এখন ভদ্র ঘরের মেয়েরাও ইদানীং অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এসব কথা কী ঘটনা হাতেনাতে না ধরা পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায়! বেশ

কয়েক বছর আগে র‍্যাবের অভিযানে ইয়াবা সুন্দরীরা একের পর এক ধরা পড়েছিল। অভিজাত পাড়ার কান্তদর্শন যুবক-যুবতীদের মন্দদর্শন কীর্তিকলাপ মিডিয়ায় আসতে শুরু করেছিল। সবাই তখন বিস্মিত স্তম্ভিত হয়েছিলেন। অবস্থার কিন্তু উন্নতি হয় নি। অবনতিই হয়েছে ক্রমশ। সন্ধ্যার পর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আপনাকে কোনো কলেজ-ইউনিভার্সিটির আশপাশের রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, তাহলে কারও পক্ষ হতে চোখে আঙুল দেয়া ছাড়াই নিজেই দেখতে পারবেন আমাদের টিনএজাররা কোন পথে তাদের সহজাত চাহিদা মেটাচ্ছে। হুডফেলা রিকশায় উন্মত্ত তরুণ-তরুণীদের অশোভন আচরণ দেখে আপনি কি একথা ভেবে অবাক হন না যে, এদের নিয়েই তাদের পরিবারের লোকেরা স্বপ্ন দেখে? আমরাও এদেরকে ভবিষ্যতের সম্বল বলে মনে করি? কেউ হয়ত কলেজ-ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে এসব লেখায় আমার প্রতি রুষ্ট হবেন। কিন্তু এই লেখা তো এই প্রথম নয়। সেই ছাত্র যমানাতেই আমরা 'ভার্সিটির মেয়েরা' বইটিতে এসব করুণ উপাখ্যান পড়ে আফসোস করার অভ্যাস করে এসেছি। কিন্তু সেই লেখা আর এই লেখার মধ্যে পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য নিহিত। এই লেখা তো জাগ্রত করার জন্য, এখানে দ্বেষ-বিদ্বেষের কোনো প্রশ্ন নেই। আছে কল্যাণকামিতা, মঙ্গলের প্রত্যাশা। দ্বীন হচ্ছে কল্যাণকামিতার নাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»

দ্বীন হচ্ছে কল্যাণকামীতার নাম।' [মুসলিম : ৫৫]
এতএব সেই কল্যাণকামিতার উৎস থেকে কোনো লেখা আসলে সেই লেখাকে কি উপেক্ষা করা যায়?
একটু ভেবে দেখুন প্রথম ঘটনার কথা। ব্যভিচার কতোটা ব্যাপকতা পেলে এমন উক্তি করতে পারে একটি মেয়ে? ব্যভিচারের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'ও তো হয়েই থাকে। ও কোনো সমস্যা না।' আর দ্বিতীয় ঘটনায় এক আল্লাহভীরু যুবক যা বলেছেন তা শুধু এক খোকনেরই উক্তি নয়। যারা নির্লজ্জতায় গা ভাসিয়ে দিতে পারেন না, এরকম হাজারও সচেতন যুবকের কথা এগুলো। যিনা-ব্যভিচার এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মেয়েরা ছেলেদের কাছ থেকে কামাই করে ছেলেদের যৌতুক দেয়ার কথাও সদম্ভে ঘোষণা করছে! তৃতীয় ঘটনায় আমরা দেখতে পাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার অবিশ্বাস্য চিত্র। অবশ্য যারা পত্র-পত্রিকা পড়েন তারা জানেন, ঢাকার বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের এ ধরনের নিকৃষ্টকর্মে জড়িয়ে পড়ার খবর বিরল নয়।
সময় হয়েছে ভেবে দেখার কেন এসব হচ্ছে। সেই সাথে প্রতিরোধের চিন্তাটাও করতে হবে যত্নসহকারে। সবার মধ্যে, বিশেষত টিনএজারদের মধ্যে দ্বীনদারি ও আল্লাহভীতির প্রভাব বাড়ানো ছাড়া যৌবনের এই পাগলা ঘোড়াকে থামানো সম্ভব নয়। তরুণ-তরুণীদের দেহ-মনের সুস্থতা ও ক্রমান্নতি ধরে রাখতে ইসলামেই রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর ও সাবলীল দিকনির্দেশনা।

সমাজে আল্লাহর ফরজ বিধান পর্দার চর্চা বাড়াতে হবে, তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে, প্রাপ্ত বয়স্কদের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য থাকলে দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যাদের সামর্থ্য নেই তাদের রোজার মাধ্যমে আপন জৈবিক চাহিদাকে সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

‘হে যুবসমাজ! তোমরা যারা সামর্থ্য রাখো, তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। যারা সামর্থ্য রাখো না, তারা রোজা করো। কেননা তা প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখে।’ [বুখারী : ১৯০৫; মুসলিম : ১৪০০]

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ ٣٣﴾ [النور: ٣٢، ٣٣]

‘আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।’ {সূরা আন-নূর : আয়াত ৩২-৩৩}

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার এবং ইহ ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনের তাওফিক দিন। মুক্তবাসের

অকল্যাণ আর ক্ষতির দিক চিন্তা করে তা থেকে দূরে থাকার হিম্মত দিন। আমিন (আলী হাসান তৈয়ব, যৌবনের মৌবনে, সূত্র : মাসিক রাহমানী পয়গাম)

জীববৈচিত্রে বিলুপ্ত নৈতিকতা

২৬-০৭-২০১১ইং সালের ঘটনা। ঘটনাটা পড়ার পরই অন্য আরেকটি পত্রিকায় প্রসিদ্ধ প্রাণী মাছির জীবনবৈচিত্র সম্পর্কে একটা তথ্য পেলাম। নিকৃষ্টতার ক্ষেত্রে মাছি উপমাতুল্য। ঘৃণ্য স্বভাব, ঘৃণ্যবস্তু আহার হিসেবে গ্রহণ এবং ঘৃণ্য স্থানে মাছির অবাধ যাতায়াত। এমনি একটি প্রাণীর সাথে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া সত্যিকার অর্থেই দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু মানব চরিত্রের অব্যাহত পতন, নৈতিকার স্খলন আর মানবতার সুন্দরতম গুণাবলীর দ্রুত পতনে আমরা ক্রমেই সৌন্দর্যের কাতার থেকে সরে এসে যতসব জীবজন্তুর কাতারে শামিল হতে শুরু করেছি। আমাদের এই পতন, ধ্বংশের পথে এই অভিযাত্রা মনুষ্যসত্তাকে কলঙ্কিত ও মানবপরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করছে কিনা সে কথা কিন্তু অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। সারা জীবন তো শুধু ভোগে, বিলাসে আর স্বপ্নেই কেটে গেল। কিছু সময় কি গত হওয়া জীবনের হিসেব কষায় ব্যয় করা দরকার নয়?

সাহাবী হাসান বসরী রহ. বলতেন, যারা দুনিয়াতে জীবনের হিসেব কষবে আখেরাতে তাদের হিসেব সহজ হবে। আর যারা হিসেব কষবে না, নিজের জীবনের ভালোমন্দ ঘটনাগুলোর বিচার করবে না, সভ্যতার সৌন্দর্যে শামিল হওয়ার ব্যাপারে তৎপর হবে না, হিসেবটা তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

আগে মাছি চরিত্রের কথাটা বলি। পৃথিবীতে বহু রকমের মাছি আছে। এক প্রকার মাছি হলো স্ট্যাগ ফ্লাই। এরা মারামারি করতে খুব পাকা। আর তা বড় অদ্ভুত কারণে। যৌন আধিপত্য বিস্তার করার জন্য! এদের শিংগুলো সৃষ্টিই নাকি একারণে! পুরুষ মাছির সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় হলে স্ত্রী মাছিরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে থাকে। এরপর স্ত্রী মাছির সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ্রহী পুরুষ মাছিরা মারামারি শুরু করে। ওই মারামারিতে বিজয়ী পুরুষই কেবল সেই স্ত্রী মাছিদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। আর যাদের ক্ষমতা নেই, শক্তিতে দুর্বল তারা বড়দের অনুপস্থিতির সুযোগ নেয়। তাদের অনুপস্থিতিতে তারা স্ত্রী মাছির সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে!

মালয়েশিয়ায় এক ধরনের মাছি আছে, যারা জলপ্রবাহের ধারে গাছের শিকড়ে জমায়েত হয় একটি পুরুষ মাছির কাছে। এর মধ্যে অন্য কোনো পুরুষ মাছি যদি গোলমাল বাধাতে আসে তাহলে পুরুষদ্বয় চোখে চোখ রেখে যুদ্ধে আহবান জানায় এবং যুদ্ধে বিজয়ী পুরুষ স্ত্রী মাছির সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। মজার ব্যাপার হলো যৌন আধিপত্য বিস্তারের জন্য এরকম মারামারি কিংবা মাস্তানি করা শুধু মাছির মধ্যেই সীমিত নয়। জীবজগতের আরও অনেক প্রাণীর মধ্যেই তা দেখা যায়। এক্ষেত্রে পুরুষরাই মারামারি করে আর স্ত্রী মাছিরা বিজয়ী পুরুষকে কাছে পেতে চায়। এই নিয়ম কি প্রকৃতি প্রদত্ত নাকি প্রবৃত্তির সৃষ্ট? কিংবা তা চিরন্তন স্বভাব? সেটা বলার সুযোগ নেই।

তবে কথা হলো এই স্বভাব মানুষের মধ্যেও আছে। কিন্তু মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি আর নিয়মকানুন দিয়ে অনেকটাই সংযত। তবে সব সময় নয়।

জীবজগতের এই 'পশুসভ্যতাই' এখন পুরোদস্তুর ভর করেছে মানবসভ্যতায়! দেশের আনাচে-কানাচে ঘটমান হাজারো ঘটনা আমাদেরকে একথা বলতে বাধ্য করছে। ঘটনাটা কুমিল্লার। ঠিক একই রেখায় দাঁড়িয়ে, বলা যায় যৌন আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করেই ঘটল এধরনের একটি ঘটনা। কুমিল্লা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রেখা (ছদ্মনাম)। ভালোবাসা করে বিয়ে করেছেন আপেলকে। বিয়ের মাত্র চার মাস গড়িয়েছে। এরই মধ্যে ঘটল চরম নির্মম ঘটনা। কেননা, এসব মাছির মতো কিছু লোক ছিল যারা আপেলকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করেছিল এবং তারাও রেখাকে নিজেদের করে পেতে চেয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতা চর্চা হওয়ায় জীবন দিতে হলো রেখার সঙ্গী আনসারকে। তারা তাকে হত্যা করে যৌনলালসায় হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিল। এই ঘটনাটি পাঠ করতে গিয়ে বারবার মনে পড়ছিল মাছিদের এই যৌন আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা এবং একে কেন্দ্র করে এক অপরের জীবননাশ করার ট্রাজেডি। [তথ্যসূত্র : আমার দেশ ২৬/০৭/১১ইং]

স্কুলে যৌন নিপীড়ন বাড়ছে

জানি এমন শিরোনাম পছন্দ হবে না অনেকের। শুনতেও শ্রতিকটু সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তারপরেও যে বিশ্বাস করতে হয়, শুনতে হয়!

স্কুল হলো পবিত্র স্থান। এখানে এসে মানুষ নৈতিকার শিক্ষা পাবে, চরিত্রমাধুর্য হাসিল করবে এবং অনৈতিকার বিরুদ্ধে লড়ার দুরন্ত সাহস অর্জন করবে, এই বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যের বিপরীত সেই পবিত্র স্থানই যদি যৌনসর্বস্ব হয় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে? ১০ই অগাস্ট ২০১১ইং সালে বাংলাদেশ প্রতিদিন নামের দৈনিক পত্রিকাটি এই শিরোনামেই কথাটা লিখেছে, আমি তা নকল করলাম মাত্র।

'সুমন আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। জানি আমাকে তুমি মনে রাখবা না। তাই মনে রাখার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।'

মারজিয়া জান্নাত সুমা। জাহানারা ইমাম হলের ৩২৩ হলের ছাত্রী। শিক্ষিকা হতে চেয়েছিলেন। অনার্সে প্রথম ক্লাশে প্রথম হয়েছিলেন। একবছর ধরে বোটান বিভাগের প্রভাষক মনিরুজ্জামান শিকদার সুমনের সাথে প্রেম। মাস্টার্সের পর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে সুমন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন সুমা। বাড়ি জামালপুরের উত্তরকাচারিপাড়ায়। পিতা আব্দুস সামাদ। তিনি ভাইবোনের মধ্যে

প্রথম। মেধাবী ছাত্রী। অনার্সে জিপিএ ৩.৫৬ পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময় পরিবারের চাপে খালাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু ওই খালাতো ভাইয়ের সাথে অন্য একটি মেয়ের সম্পর্ক থাকায় বিয়ে ভেঙে যায় এবং মাত্র ৫-৬ মাস পরই ডিভোর্স হয়ে যায়।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর তিনি আবার পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ভর্তি হওয়ার পর পরিচয় হয় শিক্ষক মনিরুজ্জামান শিকদার সুমনের সাথে। শিক্ষক তাকে শিক্ষক হওয়ার প্রলোভন দেখান। এতে আগ্রহ আরো বেড়ে যায় সুমার। তার আগ্রহকে পুঁজি করে সুমন তাকে প্রেমের জালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হন। প্রেমের অস্বচ্ছধারা এগিয়ে চলে আপন গতিতে। নিয়ে যায় নালা-নর্দমায়। এই সম্পর্কের টান এত প্রবলভাবে সুমাকে আচ্ছন্ন করে যে, এক গ্রীষ্মকালীন পুরো ছুটি তিনি তার সাথে কাটান, স্বামী-স্ত্রীর রূপ ধারণ করে!

সুমার সহপাঠীরা জানিয়েছে, তারা রাতে একত্রিত হতেন। সুমা যে ডিভোর্সী তা সুমনকে জানানো হয়েছিল। তাতে আপত্তি করেননি সুমন। কিন্তু স্বার্থ ফুরিয়ে যাবার পর, সুমার কাছ থেকে পাওনা আদায় করে নেয়ার পর এই অজুহাতেই তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যাত নারীর শেষ সম্বল বুঝি জীবননাশ! তাই সুমা এই পথই অবলম্বন করেন। নিজ হলের সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে

জীবনের পাওনা পরিশোধ করেন। যাবার আগে লিখে যান দুটি চিরকুট। দলীয় ও প্রভাবশালী লোক হওয়ায় সুমনের চেষ্টায় সেই চিরকুট দুটি গায়েব করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরপারের বাসিন্দার বিদেহী আত্মার সেই বাসনার কাছে হেরে যায় সুমনের অপচেষ্টা। উদ্ধার করা হয়ে চিরকুট দুটি। এতে সুমা লিখেছেন- 'সুমন ভাই, জানি মনে রাখবেন না। তাই সারাজীবন অনুতপ্ত হবেন এমন কাজ করে গেলাম।'

আরেকটিতে লিখেছেন- 'সুমন আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। জানি আমাকে তুমি মনে রাখবা না। তাই মনে রাখার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।'

আর মা-বাবাকে উদ্দেশ্যে করে লিখেছেন- আব্বা, আমি তোমাদের অনেক ভালোবাসি। আমি তোমাদের যোগ্য সন্তান হতে পারলাম না। জানি আমাকে ক্ষমা করবে না। তবু ক্ষমা চাচ্ছি।'

সুমনকে জাগাতে গিয়ে, তার স্মৃতির পাতায় অমর হয়ে থাকার বাসনায় সুমা জীবন দিয়ে গেলেন। কিন্তু সুমনরা কি মনে রাখবে একটি বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা নারীর কথা? স্বার্থ যেখানে মুখ্য, স্মরণিকা সেখানে গৌণ। তাই বৃথাই গেল সুমার জীবনদান! [তথ্যসূত্র : আমারদেশ ১১/০৮/১১ইং]

বিচারকের বিবেকে বন্দি বিচার

ঘটনাটা শুনেছিলাম এক বক্তার মুখে। নাম মনে নেই। আর ঘটনাটাও আমি এ পর্যন্ত কোনো কিতাবে পাইনি। তবে ঘটনার মর্ম যে সত্য এতে সন্দেহ নেই। সেটা মুসলিম রেঁনেসা আর মুসলিম স্বর্ণালী যুগের কথা। তখন এধরনের ঈমানদীপ্ত ঘটনা বিরল ছিল না। বরং তা ছিল স্বাভাবিকতার চাদরে মোড়ানো সাধারণ সত্য ঘটনা। তখন মুসলিম শাসক আর বিচারকদের ঈমান, সততা ও নৈতিকতা এত প্রখর ছিল যে, ইতিহাসের কোনো পাতায় এধরনের ঘটনা উল্লেখ না থাকলেও ঘটনার মর্মার্থের সত্যতা সম্পর্কে কেউ আপত্তি করবে না। এক বিখ্যাত ফকীহর সময়কার ঘটনা। সে সময়ের মুসলিম খলীফা একদিন স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী কথা প্রসঙ্গে স্ত্রী বলে ফেললেন, আরে তুমি তো জাহান্নামী!

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে এমন কথা কার ভালো লাগে? তাই খলীফা রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি যদি জাহান্নামী হই তবে তোমার মতো জান্নাতী স্ত্রী আমার দরকার নেই! তুমি তালাক। কথাটা বলেই খলীফার চৈতন্য ফিরে এলো। এবার স্ত্রী রক্ষার পালা। সে সময়ের অনেক মুফতী, ফকীহর দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু কেউ সমাধান দিতে পারলেন না। কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী- এই ফয়সালা দিতে গিয়ে কে বিপদে পড়তে চায়! সে ফয়সালা যে আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কারো হাতে নেই! অতএব এর ভিত্তিতে

ফাতাওয়া দেয়া সম্ভব নয়। খলীফার এমন নাযুকতম মুহূর্তে এগিয়ে এলেন যুগের সেই বিখ্যাত ফকীহ। তিনি একদিন খলীফাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, বলুন তো আপনি এমন কোনো নেক কাজ করেছেন কিনা যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দি? খলীফা অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, তেমন নেক কাজের কথা মনে পড়ে না। তবে জীবনে বড় একটা গুনাহ ছেড়ে দিয়েছিলাম সেরেফ আল্লাহ তা'আলার ভয়ে। ফকীহ বললেন, ঘটনাটা খুলে বলুন।

'আমার একজন ফুফাতো বোন ছিল। খলীফা বলা শুরু করলেন- আমরা ছোটকালে এক সাথেই বড় হয়েছি। রূপে ছিল সে অপ্রতিদ্বন্দ্বি, সেরা এবং অনন্য। তাকালে সৌন্দর্যের আগুনে চোখ ঝলসে যায় যেন! কিন্তু যখন বয়স বাড়ল এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হলাম তখন আমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হলো এবং আমরা পর্দা করতে শুরু করলাম। সে ছিল আমার জন্য দিওয়ানা। কিন্তু পর্দা ভেদ করে কখনও সে আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারত না। ফলে তার অন্তরের দহন আরো বেড়ে গিয়েছিল। বহুদিন ধরে সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং একদিন সে সুযোগটা পেয়েও গেল। একাকী পেয়ে সে আমাকে অভিযোগ আর অনুযোগের বানে জর্জরিত করে বলল, জানো না তোমায় আমি কত ভালোবাসি? এরপর সে তার ভালোবাসার নগদ ফল তুলে নিতে চাইল। আমিও তার আহ্বানে সাড়া দেয়ার উপক্রম করলাম। ঠিক সে সময়ে জানি না কোথা থেকে এলো আওয়াজটা। কে যেন আমাকে

বলছে, হায়! একদিন তুমি বিচারক ও শাসক হয়ে যে অপরাধের বিচার করবে, দোররা লাগাবে আর মৃত্যুদণ্ড দেবে, সেই তুমিই আজ সেই পাপে লিপ্ত হতে চলেছ?

খলীফা বলেন, এর পর আমি আর আগে বাড়িনি। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সাথে সাথে আমি তাওবা করেছি। ফকীহ বললেন, আপনার স্ত্রী তালাক হয়নি। অন্য সাধারণের জন্য তো এক জান্নাত। আপনার জন্য দুই জান্নাত। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ۝٤٦ ﴾ [الرحمن: ٤٦]

'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দুটি জান্নাত।' {সূরা আর-রহমান, আয়াত : ৪৬}

অতএব আপনি দুই জান্নাতের অধিকারী। তাই স্ত্রী তালাক হয়নি। একজন মুসলিম শাসক ও বিচারকে জীবনে এধরনের ঘটনা আসলে এভাবেই তা ব্যাখ্যায়িত হবে, চর্চা হবে নৈতিকার, বিজয় হবে সততার এটাই স্বাভাবিক কাম্য ব্যাপার। কিন্তু কেন যেন তা আর হয় না। ফিরে আসে না সেই সোনালী ইতিহাস। বরং রচিত হয় ঘৃণিত ইতিহাস। সত্তা তো এক, কিন্তু ইতিহাস আর ইতিহাসের জনকেরা ভিন্ন!

বরিশালের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ আমিন উল্লাহ (ছদ্মনাম)। ছেলে শহিদ উল্লাহ। বাকেরগঞ্জের নিয়ামতি এলাকার সাবেক মেম্বার মন্নুজান চৌধুরী তার বোনকে ওই বিচারকের ঘরে গৃহপরিচারিকার কাজ জুটিয়ে দেন। সে সময় কিন্তু ঘুণাক্ষরেও

মুন্নাজান তার বোনের সতীত্ব আর সম্ভ্রমের ব্যাপারে চিন্তা করেন নি। কেন করবেন? একজন বিচারকের ঘরে কোনো নারীকে অনিরাপদ ভাবা যায়? নাকি তা ইনসাফে পড়ে? কিন্তু মুন্নাজানের সেই সরল বিশ্বাস গরল হয়েছে। তিনি যে সেই শাসক আর বিচারকের যুগের বাসিন্দা না, সে কথাই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। বিচারক চাকরির প্রলোভন দিয়ে মেয়েটিকে নিয়মিত লাঞ্ছিতা করতে থাকেন। পিতার কর্মে পুত্র! তাই পুত্র বাদ যাবেন কেন? বিচারক বাবার দেখাদেখি ছেলেও মেয়েটিকে নিয়মিত ধর্ষণ করতে থাকে! এই না হলে আধুনিক সভ্যতা, প্রগতির দমকা হাওয়া!

পিতাপুত্রের উন্মাদনার ভার সইতে পারেন না গৃহপরিচারিকা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পেটে ধারণ করেন অবৈধ ফসল। কার? পিতার না পুত্রের তা তিনি নিজেও জানেন না! তবে টনক নড়ে বিচারকের। পাপের অনাকাঙ্ক্ষিত আগাছাটাকে অংকুরেই ধ্বংস করার জন্য ২০০৯ইং সালের ৭ই জুলাই মেরি স্টোপসে গর্ভপাত করানো হয়। সে যাত্রায় বেঁচে যান বিচারক পিতাও পুত্র। মেয়েটি অনাহুত অতিথিকে বিদায় করে দিয়ে স্বস্তি পাওয়ার নূন্যতম ফুরসতই পান না। আবার তিনি বিচারকের আদিম উন্মদনার শিকার হন। আবার ধর্ষণ করা হয় তাকে।

একটি পরিবারের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবারের সকলকে সচেতন থাকতে হয়। নারীরা তো এসব ক্ষেত্রে অতন্দ্রপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করে থাকে! কোনো নারী তো স্বামীকে অন্য নারীর দিকে 'হঠাৎ

দৃষ্টিতেও’ তাকালে একে তিল থেকে তাল বানায়। স্বামীকে পুরোদস্তুর শাসন করে। বিষয়টি কখনও কখনও বাড়াবাড়ির মাত্রায় গেলেও এর উপকারী দিকও আছে বটে। এতে স্বামী বাছাধনেরা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকেন। কিন্তু কোনো সংসারের নারী যদি এতটুকু দায়িত্বও পালন না করে একেবারে উদাসীন থাকেন, স্বামীর অনাচার দেখেও কোনো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করেন তাহলে সেই সংসারের পতন আর পচন ঠেকাতে যাবে কে? বিচারকের আলয়টা যে প...লয়ে পরিণত হয়েছে তা দেখেও কোনো প্রতিবাদ করেন নি তার স্ত্রী। দেখেও না দেখার ভান করেছেন। স্বামী-সন্তানকে এক পাপের নৌকায় ডুবতে দেখেও তাদেরকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন নি। এমন উদাসী গৃহকর্ত্রী সংসারের বর নয়, শাপ।

এভাবে চলতে চলতে এক সময় ছন্দপতন ঘটে। বিচারক বদলী হয়ে চট্রগ্রামে চলে যান। তখন মেয়েটিকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মেয়েটি তখন সতীত্বের বিনিময় দাবি করেন। যে চাকরির কথা বলে তার সর্বস্ব লুট করে নেয়া হয়েছে সেই চাকরির খবর জানতে চান। বিচারক মানুষ তো! মানুষকে ভেজে খাওয়া তাদের পেশা। তাই ভাজতে বেগ পেতে হয় না ধর্ষিতা মেয়েটিকে। চাকরি দিতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে এবং তা নিজ বাড়ি থেকে দিতে হবে বলে তাকে বিদায় করে দেন এবং বলেন, আমার বাসায় থেকে পরীক্ষা দিলে বদনাম হবে এবং চাকরি না পাওয়ারও আশঙ্কা থাকবে।

কিন্তু এ ছিল তার কেবলই মৌখিক সান্ত্বনা। কাজের কাজ কিছুই না। মেয়েটির সম্ভ্রমের কোনো মূল্য না দিয়েই তিনি চট্রগ্রামে চলে যান। কথাটা জানতে পেরে ধর্ষিতা আদালতের ক্যাশরক্ষক সরকার দীন মুহাম্মাদের শরণাপন্ন হন। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলে এক শ্রেণীর মানুষকে উদ্ধার তৎপরতার নামে ভিন্ন চেহারায় দেখা যায়। আহত-নিহত যাত্রীদের উদ্ধার ও সেবার নামে তাদের পকেট হাতড়ায়, সবকিছু লুট করে নেয়। তাই এই শ্রেণীর মানুষ মনেপ্রাণে এমন দুর্ঘটনারই আশা নিয়ে বসে থাকে। ধর্ষিতা মেয়েটি যে দীন মুহাম্মাদের কাছে বিচার দায়ের করেন সেই দীন মুহাম্মাদ এই শ্রেণীর মানুষদেরই একজন। তিনি সুযোগ হাতছাড়া করেন না। 'ঝামেলা' মিটিয়ে দেয়ার নাম করে তিনি বিচারকের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করেন। বিচারক বেচারাও ঝামেলা বাঁধার ভয়ে তাকে চাহিদা মোতাবেক টাকা পরিশোধ করেন।

এবার মেয়েটির কাছ থেকে অগ্রিম 'বিনিময়' পাওয়ার পালা। কিন্তু একজন হতদরিদ্র আর অসহায় নারীর বিনিময় দেয়ার সাধ্যই বা কতটুকু? একমাত্র সম্বল যে তার দেহ আর সতীত্ব! কিন্তু তাতে সমস্যা নেই সম্ভ্রমখেকো বণিকদের**। তাদের কা**ঙ্ক্ষিত 'পণ্যই' যে এটি! তাই এই পণ্যের ওপরেই চুক্তি সংঘটিত হয়। বিচার পাইয়ে দেয়ার কথা বলে সেও মেয়েটিকে ধর্ষণ করে! জানি না কতদিন চলত এই ধারা। তবে দীনের স্ত্রী এক্ষেত্রে বিচারকের স্ত্রীর চেয়ে আলাদা ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ব্যাপারটি জানতে

পেরে মেয়েটিকে ঘর থেকে বের করে দেন। অসহায় নারী আরও অসহায় হয়ে পড়ে। দুর্ভোগ কমে না তার। শনৈঃ শনৈঃ বাড়তে থাকে দুর্ভোগ। অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তারাও মেয়েটিকে ধর্ষণ করে! এভাবে এক পাপ ডেকে আনে হাজার পাপ। এক মুক্তবাস সৃষ্টি করে হাজার অপরাধ। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ ১০-০৮-১১ইং]

এই যদি হয় ইনসাফ, তবে জুলুম কাকে বলে? যদি এই হয় বিচার তবে প্রহসন কাকে বলে? যদি এই হয় বিবেকের আদালত তবে শয়তানের আদালতের খবর কী? মানবতা, মনুষ্যত্ব যদি বিচারকদের দ্বারা এভাবে পদদলিত হয় তবে বিচারপ্রার্থী কার দরজায় করাঘাত করবে?

মুক্তবাস! এ এক নিষ্ঠুর, নিরস পুতুল খেলা বোন! সন্ধ্যায় যখন খেলা শেষে ঘরে ফিরবে তখন দেখবে ফলাফল শূন্য। আর গায়ে লাগানো কিছু ধূলোবালি ছাড়া তোমার আর কিছু পাওনা নেই। এই মরিচিকা ইতিহাসের কত কাতর পথিকের যে জীবননাশ করেছে তার ইয়াত্তা নেই। তুমিও কি তবে সেই হারিয়ে যাওয়া মরিচিকার খোরাকদের একজন হতে চাও? ফিরে এসো বোন! ইফফত আর সতীত্বের রাজপথে তোমাকে সুস্বাগত!

মুক্তবিহঙ্গ

মাওলানা হাবিবুস সুবহানী রহ.-এর কথা খুব বেশি মনে পড়ে। এক অসম বয়সী বন্ধুর চিরপ্রস্থানে আমি মাঝেমধ্যে নিজেকে চরম নিঃসঙ্গ ভাবি। অভিজ্ঞতায় ভরপুর এই মানুষটিকে নিয়ে যখনই অভিজ্ঞতা বিনিময় করতাম তখনই বিমুগ্ধ হয়ে যেতাম। দেশ-বিদেশের হাজারও অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শোনাতেন তিনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তার সে সব কথা শুনতাম। আজ তিনি নেই- আল্লাহ তা'আলা তার রুহের মাগফিরাত করুন- কিন্তু তার বলা একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে আমার। তিনি সম্ভবত কোনো পত্রিকায় পড়েছিলেন বা সাংবাদিকের মুখে শুনেছিলেন ঘটনাটি।

ঢাকা ভার্সিটির এক ছাত্রীর অভিভাবক। ছাত্রীদের পার্কে বা ভার্সিটির বিভিন্ন স্থানে ছেলে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়া কতটুকু ঠিক? এই প্রশ্নে তিনি প্রশ্নকারীর প্রতি চরম ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার মেয়ে যখন উপযুক্ত বয়সে উপনীত হবে, ভালোমন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান অর্জন করবে তখন সে যা ইচ্ছা তাই করবে। আর এটাও এক ধরনের অভিজ্ঞতা। আমার মেয়ে কি তবে অভিজ্ঞতাশূন্য থাকবে!

জবাব শোনার পর প্রশ্নকারী ভদ্রলোক আর কথা বাড়াননি। কথাটা একজন বাঙালী মুসলিমের মুখে উচ্চারিত হলেও আসলে কথাটা তরঙ্গমালায় ভেসে এসেছে আরও পূর্বদিক থেকে। বিত্তে উন্নত মালয়শিয়ার কথাই ধরুন। বিশ্বে অর্থনীতিতে এই দেশটি একটি

শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং দেশটি অন্যতম মুসলিমরাষ্ট্র হিসেবেও পরিচিত। মালয়েশিয়ায় সফরকারী এক লোকের মুখে শুনেছি ঠিক এধরনের কথা! তিনি একবার তার পরিচিত এক মালয় মুসলিমের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এই যে তোমাদের মুসলিম ছেলেরা খিস্ট্রান মেয়েদের সাথে এবং মুসলিম মেয়েরা অমুসলিম ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে, কখনও তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসে এক সাথে রাত যাপন করে কখনও আবার তাদের বাড়িতে গিয়ে রাত যাপন করে- এতে তোমরা আপত্তি করো না?

তার কথায় মালয় লোকটি খুব সরলভাবে বলেছিলেন- 'নাহ্। আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে বিবেক দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন সেই বিবেক ও জ্ঞান তাদের পথপ্রদর্শক। এ অনুযায়ী ওরা যদি কোনোকিছুকে ভালো মনে করে তবে তা করবে! এতে আমরা আপত্তি করব কেন?'

মালয়শিয়া আর বাংলাদেশ উভয়টি মুসলিম রাষ্ট্র হলেও উভয় দেশের মধ্যে ধর্ম পালনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ দেশ হিসেবে সারাবিশ্বে সমধিক পরিচিত। মালয়েশিয়া কিন্তু তা নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এখানেই যে, আমরা ক্রমেই নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা ও কঠোর পর্দাপালনের সুনাম থেকে 'ফিরে আসা অসম্ভব দূরত্বে' সরে যেতে শুরু করেছি এবং আমাদের এই যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

তারই ফলাফল এই যে, একজন পিতা তার কন্যাকে পার্ক বা বাগানের আড়ালে, ঝোঁপঝাড়ে আড্ডা দেয়া, মাখামাখি ও ঢলাঢলি করাকেও খারাপ নজরে দেখছেন না। এগুলো তাদের বিবেকের পরাকাষ্ঠায় ছেড়ে দিচ্ছেন এবং উন্নতি ও প্রগতির ধারক বলে জ্ঞান করছেন। কিন্তু পারিবারিক এই শিথিলতা কি মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে? হাজারও কলঙ্কজনক ঘটনা কি এই পারিবারিক শিথিলতার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে না? কত ঘটনা আর কত উদাহরণ পেশ করতে হবে মানুষকে জাগ্রত করতে? মানুষের এই কাঁচাবুদ্ধির জন্য? নিচের ঘটনাটা দেখুন :

ঢাকা সিটি কলেজের মেধাবী ছাত্রী শামীমা নাসরিন সুইটি (২১)। বিবিএ মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এই মেধাবী ছাত্রী সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করার পথে সুন্দর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক শিথিলতা আর শাসনের দৈন্যতা তাকে বেশি দূর অগ্রসর হতে দিল না। ভাগ্নের (বড় বোনের ছেলে) সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে একুশটি বছরের তিলে তিলে গড়ে ওঠা সাধনা নিমিষেই আর অতি নিষ্ঠুরভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল। ভাগ্নের সাথে সুইটি অনেকদিন ধরেই এধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে এসেছিলেন।

পরিবারের লোকেরাও তা জানতেন। সুইটির বড়বোন জানান, 'তাদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্পর্কে ভাগ্নে-খালা হওয়ায় আমরা এটাকে খারাপ চোখে দেখি নি। তারা প্রায়ই ঘুরতে যেতো, ভাগ্নে এসে এখানে দুইতিন দিন করে

থাকত, কখনও সুইটি ভাগ্নের বাসায় গিয়ে কয়েকদিন ধরে থাকত। কিন্তু আমরা ওই এক কারণে তাদেরকে বাধা দিইনি এবং এটাকে খারাপও মনে করিনি।'

কিন্তু তাদের এই মনে না করা এবং খারাপ না জানার ফল মোটেও শুভ হয়নি। শরীয়ত যেটাকে খারাপ বলতে বলেছে এবং 'কিছু মনে করতে' বলেছে সেটাকে খারাপ না জানলে এবং কিছু মনে না করলে বিপর্যয় আবশ্যক সেটা যেন নতুন করে জানলেন সুইটির পরিবার। কথিত ভাগ্নে খালাকে আগের মতোই বেড়াতে নিয়ে গেল নিজ বাড়ি নিকুঞ্জে। বাবা মাকে বলে এবং তাদের দু'আ নিয়েই সুইটি 'ভাগ্নের' সাথে চললেন তাদের বাড়িতে।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার আজ দুদিন হয় কিন্তু সুইটির কোনো খবর বা যোগাযোগ নেই। একদিন বাসা থেকে তার নাম্বারে ফোন দেয়া হলো। ফোন রিসিভ করে 'মেয়েটি' বলল, আমি ভালো আছি। সমস্যা নেই। এইতো বাসায় আসব। কথাগুলো খুব দ্রুত বলে ফোন রেখে দিল 'সুইটি'। এরপর আরও কয়েকবার তার নাম্বারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু এর পরে আর ফোনটি খোলা পাওয়া গেল না। অবশেষে নিকুঞ্জের সেই বাসায় এসে দেখা গেল এক বীভৎস দৃশ্য। দুইদিন যাবত সুইটি তার ভাগ্নের ঘরে লাশ হয়ে পড়ে আছেন। লাশ পঁচতেও শুরু করেছে। ঘরের সবাই পলাতক। সেই ভাগ্নেও নিখোঁজ। তথ্য নিয়ে জানা গেল যে মেয়ে ফোন ধরে নিজেকে বলে সুইটি পরিচয় দিয়েছিল সে ছিল ভাগ্নের ভাড়াটে লোক। তাকে সুইটির অভিনয় করে কথা

বলতে বলা হয়েছিল। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ ২৪/০৯/২০১১ ইং]

একটা মুসলিম পরিবারের লোকেরা কী করে পারল ঘুণে ধরা এই সমাজে কেবলই দূরতম খালা-ভাগ্নের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের মেয়েকে এভাবে ছেড়ে দিতে? আমাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ কি এতই মজবুত ও সুদৃঢ় যে, ক্ষীণ সুতার ওপর টাঙানো এই একটিমাত্র পরিচয়ই আমাদের যুবকদেরকে নিবৃত রাখবে? পাপের যেখানে এত আনাগোনা সেখানে এই আত্মতৃপ্তি কিন্তু মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। কখনও কখনও আত্মতৃপ্তি ধ্বংস আর বরবাদীর বার্তা নিয়ে আসে সে কথাও মনে রাখতে হবে।

আইনের হাত কোথায়!

লেখাটা লিখতে গিয়ে পাকিস্তানের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও পাকিস্তান স্বাধীনতার পথিকৃত কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ- এর কথা এসে গেল। ১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের করাচীর খারাদার নামক স্থানে ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত বর্ণাঢ্য এক মুসলিম পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বোম্বের গকুলদাস স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি কিছুদিন করাচীর সিন্ধু মাদ্রাসায় ও পরে খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে পড়ালেখা করেন। এর পর বিলেত গমন করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র হিসাববিজ্ঞানে লেখাপড়া করবেন। পিতার ইচ্ছা মোতাবেক তিনি লন্ডনের কোনো এক স্কুলে হিসাব বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছিলেন। বিকেলে তার হাঁটাহাটির অভ্যাস ছিল। লিঙ্কন্স ইনের সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন একদিন। লিঙ্কন্স ইনের ফটকে খোদাই করা ছিল -

'Mohammad (S), the greatest lawyer of the World' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও গ্রেট আইনবিদ।' ব্যস, এই একটি কথা, বিধর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিহাসের অন্যতম সত্য তথ্যের দ্বিধাহীন অলঙ্করণ দেখে মুগ্ধ হলেন কায়েদে আযম। সিদ্ধান্ত নিলেন মহানবীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করবেন। ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি লিঙ্কন্স ইনে ভর্তি হলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটিমাত্র তথ্য কায়েদে আযম ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাকে এক শাশ্বত বিপ্লবের পথে নিয়ে এলো। এমনি মহান মহানবীর আদর্শ, ইসলামের দর্শন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও ইনসাফগার আইনবিদ, বিচারক। নীতি-নৈতিকতা ছিল তার আইনের প্রধান ভাষ্য। মানবতাকে সারা জীবন তিনি আইন ও নৈতিকার পথে চলার সবক দিয়ে গেছেন। এতে বিমুগ্ধতা ছড়িয়েছে সারাবিশ্বে। একটি গোঁড়া ইসলামবিদ্বেষী রাষ্ট্রও তা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গাত্রে অংকিত করতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু আপসোসের বিষয় হলো বিধর্মীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের কথা তাদের দেয়ালের গাত্রে অংকন করলেও আমরা আমাদের হৃদয়গাত্রে তা অংকন করতে পারিনি। একারণে সংঘটিত হচ্ছে নানা রকমের অবিশ্বাস্য ঘটনা। যা বিশ্বাস করতেই ব্যয় হয় অনেকক্ষণ।

যারা দেশের মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলবেন, হতভাগা ও মজলুমকে তাদের হক বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট হবেন আমরা তাদেরকে উকিল বা আইনজীবি হিসেবে জানি। মানবতার প্রশ্নে তাদের দায়িত্ব অনেক। তার সততা ও চরিত্রের ওপর নির্ভর করে মজলুমের ভাগ্য। আর অনৈতিকা ধ্বংস করে দেয় মজলুমের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই একজন আইনজীবিকে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া শুধু ধর্মের স্বার্থেই নয়,

মানবতার স্বার্থেও অপরিহার্য। এই অপরিহার্য সত্তার অনুপস্থিতিতে বয়ে আনে চরম দুর্ভোগ। দুর্ভোগের যন্ত্রণায় ছটফট করে মানবতা, অসহায় অনাথ ও শিশু সন্তানেরাও। কথা বাড়াতে চাই না। পাঠক! চলুন আরেকটি অমানবিক ঘটনার ভাঙা ঘাটে আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

গাজীপুর জেলার জজ আদালতের সিনিয়র আইনজীবি ফরিদুল আলম (ছদ্মনাম)। আইন-আদালতে অভিজ্ঞতার ছড়ি ঘুরালেও সমাজ ও ঘরোয়া জীবনে একেবারে জাহিলী যুগের আনাড়ী লোকের মতো একটা কাজ করে বসলেন। কতদিন ধরে তা করে আসছেন তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কিন্তু তথ্য ফাঁস হওয়ার পর মনে হয়েছে দেশটা বুঝি কেবল অবিশ্বাস আর অভিনয়েরই জায়গা। যে লোকটা জনাকীর্ণ আদালতে বিচারক ও হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে নৈতিকার দোহাই দিয়ে বাদী কিংবা বিবাদীর পক্ষে কথা বলেন, সেই লোকটাই যখন আসল বিচারককে অনুপস্থিত ভেবে কারও সর্বনাশের চূড়ান্তটা ঘটান তখন তার ভেতর ও আদালতের সামনে উপস্থিত হওয়া চেহারা দুটোর মধ্যে মিল খুঁজে পেতে নিদারুণ কষ্ট হয়। অভাব আর দারিদ্রের সুযোগে মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে অসহায় অল্পবয়সী মেয়েগুলোকে নিয়ে আসে ঘরের কাজ করার জন্য। আনার সময় মা-বাবাকে আশ্বস্ত করে বলে- এটাতো আমাদেরই মেয়ে। আমাদের ছেলেমেয়ের সাথে ও বড় হবে, খাবে, নাবে ইত্যাদি।

বাক্যের চাণক্যে মুগ্ধ হন গ্রামের দরিদ্র সরল মা-বাবা। শহরের সুখের আশায় মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে মা-বাবা যখন তৃপ্তির শ্বাস নেন তখন সন্তানের ভাগ্যে জোটে খুন্তির দাগ, মালিকের স্ত্রীর চপেটাঘাত, চুলের মুঠির সাথে মালিকার যুদ্ধসহ হাজারও অপরিচিত নির্যাতন। আর কেউ কেউ হারিয়ে বসে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কারটি। যে সম্পদ রক্ষায় গ্রামের সরল বধূ ও মেয়েরা নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়না, শহরে এসে দেখে সেই সম্পদ লুণ্ঠিত হতে মোটেও সময় লাগে না। পৃথিবীর বণিক শ্রেণীরা সম্ভবত দারিদ্রের সুযোগটাই বেশি নেয়। তাই তো দু মুঠো ভাত দেয়ার কথা বলে একটি সম্বলহীন অসহায় নারীর সর্বস্ব কেড়ে নেয় তারা। কেড়ে নেয় দীর্ঘদিনের লালন করা সম্ভ্রম। এমন কুৎসিত ঘটনা যে শহুরে জীবনে সর্বদা ঘটে চলেছে তা প্রকাশ করে রাজধানীর মানুষের প্রতি পাঠকদের বদধারণা তৈরি করতে চাই না। কিন্তু কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যা মানবতার সামনে প্রকাশ করে বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করি না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখি এসব কাহিনী।

আমাদের আলোচিত আইনজীবির কথায় আসুন। সুদূর ফরিদপুর থেকে একটি দশ বছরের মেয়েকে তিনি এনেছেন কাজের মেয়ে হিসেবে। যে মেয়েটির এখনও দুনিয়া চেনারই সময় হয়নি সেই মেয়েটিকেও আইনজীবি তীক্ত অভিজ্ঞতার সবক দিলেন! দশ বছরের শিশুটিকে ভয় দেখিয়ে বারবার ধর্ষণ করলেন! এতে

শহরে এসে সচ্ছলতার স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা নিমিষেই মিশে যায় মেয়েটির। ঈদের দিন যেখানে সারাদেশের শিশু-বুড়োরা আনন্দে মেতে উঠেছে সেদিন একটি দশ বছরের শিশু অমানবিকতার গুয়ান্তানামোবে কারাগার থেকে পালিয়ে বেড়াবার প্রাণপণ কসরত করেছে! কারণ সেই আনন্দও পবিত্র দিনেও তার ওপর চালানো হয়েছে তার সাধ্যের বাইরের নির্যাতন। ঈদের আগের দিন ও পরের দিন দৈনিক ৬/৭ বার করে চালানো হয়েছে দৈহিক নির্যাতন! অপরাগ মেয়েটি জানের ভয়ে পালাতে চাইলে সেই জানটাই কেড়ে নেয়ার হুমকি দেয়া হতো!

অবশেষে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং পালিয়ে গিয়ে জনগণকে পুরো ঘটনা জানায়। ম্যাজিস্ট্রেট শহিদুল হক ঝিনুকের কাছে মেয়েটি জবাববন্দী দিয়েছে। হয়ত ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলেই চিরদিন বন্দী হয়ে থাকবে অসহায় মেয়েটির বিবৃত লোমহর্ষক নির্যাতনের করুণ উপখ্যান। কোনো এক অদৃশ্য শক্তির বলে হয়ত কোনো দিন বেরিয়ে আসবে না সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য। কিন্তু তবু সেই অদৃশ্য ফাইলের অপ্রকাশিত উপাখ্যান থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে চাই। মেয়েটির মতোই পালিয়ে বাঁচতে চাই মুক্তবাস থেকে, আযাদী যিন্দেগীর অভিশাপ থেকে। [তথ্যসূত্র : দৈনিক সমকাল ০৯/০৯/২০১১ইং]

মোহ্! জীবনের কঠিন পুলসিরাত!

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সৌন্দর্যপূজারী। সুন্দর বস্তুর প্রতি মুগ্ধতা সকলের অস্তিমজ্জায় সংযুক্ত স্বভাব! মোহতাড়িত হয়ে জীবনকে বাঁকাপথে নেয়াও দুর্বলচিত্তের দুর্বল দিক। বিশেষ করে নারীর সৌন্দর্য পুরুষকে এক আশ্চর্য ও ভয়ঙ্কর পথে নিয়ে যায়। মানুষের হিসেবে আগে দর্শনদারী পরে গুণবিচারী। একারণে বহু যোগ্য কিন্তু অসুন্দরী নারী সহসা বিয়ের পিঁড়িতে বসার সুযোগ পায় না। অনেকের ধারণা, অসুন্দর স্ত্রী নিয়ে কোথাও চলাফেরা করা ও গৌরববোধ করা যায় না। কালো হরিণ চোখের মধ্যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য লুকানো থাকলেও সৌন্দর্যপিয়াসী পুরুষরা তা দেখতে পায় না। তবে আল্লাহ তা'আলা সব মেয়েকে কালো হরিণ চোখ দেন না। ফলে কালো তথা অসুন্দর মেয়েদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। শরীরী সৌন্দর্য না থাকলে আজকের নারী স্বাধীনতার যুগেও চাকরির বাজার সুবিধার নয়। সুন্দরী মেয়ে তার সৌন্দর্য দিয়ে চারপাশকে মোহাবিষ্ট করবে কামুকদুনিয়ার এটাই বড় প্রত্যাশা। তাই বাণিজ্যিক নারীরা কালো হলে তারা খরিদ্দার পায় না। মোটকথা, সর্বত্রই সুন্দরের জয়জয়কার।

তবে বাহ্যিক শাহপুরুস্তীরা আভ্যন্তরীণ একটা সৌন্দর্যের অন্বেষণ করে। সেটা আলো-আঁধারীর সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের অভাবে অনেক পরমা সুন্দরী নারীও সাধারণ একটা কাজের কালো মেয়ের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। সমাজে এধরনের উদাহরণ খুঁজে

পেতে মোটেও কষ্ট হয় না। বাস্তব ঘটনা বলি। জনৈক ব্যক্তি অনিন্দ্য সুন্দরী উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীকে ছেড়ে যখন একটি কালো মেয়েকে বিয়ে করল তখন সবাই তো হতবাক। ঠিক কী কারণে কাজের মহিলা সমতুল্য মেয়েকে চোখ ধাঁধানো সুন্দরী স্ত্রী ছেড়ে বিয়ে করল তা কারো মাথায় ধরল না।

পরে জানা গেল, প্রকৃতিগত সৌন্দর্যে সে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল না। স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখার সামর্থ্য ছিল না। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকায় এক সময় স্বামী কাজের মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। এখানে এসে সে স্বামী আবিষ্কার করে এক ভিন্ন জগত। আজ নারীসত্তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাইরে আরেকটি সৌন্দর্যের সাথে তার পরিচিত ঘটে। সেই পরিচয় থেকে অবৈধ পথ এবং একদিন স্ত্রী ত্যাগ করে কাজের মেয়ের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ!

নারীর বেলায় কথাটা যেমন প্রযোজ্য, পুরুষের বেলায়ও তাই। স্বামী শহরে চাকরি করে। মোটা মাইনে। স্ত্রী থাকে তিন সন্তান নিয়ে গ্রামের বাড়িতে। একদিন শোনা গেল গ্রামের মাটিকাটা এক লোকের সাথে ভেগে গেছে মহিলাটি। গল্পপ্রিয় নারীদের খোরাক জুটে যায়। তাদের গল্পের রসদ বাড়ে। প্রবীণ মহিলারা টিপ্পনী কেটে বলে, সচ্ছল সংসার, সুন্দর স্বামী ও সন্তান রেখে ওই নারী ভাইগা গেল কেনরে? আরেকজন রস যুক্ত করে উত্তর দেয়- ব্যাটার মর্দামী শক্তির কারণে!

যাহোক, মানুষ সৃষ্টিরই একটা অংশ। আর সৃষ্টিতে আল্লাহ তা‘আলা জৈবিক চাহিদা ও কামনা যেমন রেখেছেন তেমনিভাবে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যপ্রিয়তার স্বভাবও দান করেছেন। কিন্তু সেই সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার আদেশও দেয়া হয়েছে তাকে। কেবল সৌন্দর্যের পেছনে ছোটা আশরাফুল মাখুলকাত হিসেবে একজন মানুষের আদৌ নৈতিক কাজ নয়। তাই সৌন্দর্যের যতটুকু সহজ পথে পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থেকে অবশিষ্ট সৌন্দর্যের জন্য বক্রপথ অবলম্বন না করে ধৈর্য্যধারণ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

‘ডিএইচ লরেন্স বলেছেন, যৌনক্ষুধা পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষুধা। এই ক্ষুধার আবেগ দমন করা মানুষের অসাধ্য। এই ক্ষুধার তীব্রতা এমনই সর্বগ্রাসী যে, মানুষ অনেক সময় অপমানসহ যেকোনো ধরনের কঠিন শাস্তি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত মেনে নেয়। যৌনক্ষুধা ও পেটের ক্ষুধা মানুষের জন্য অপরিহার্য। তবে কঠিন আত্মসংযমের মাধ্যমে যৌনক্ষুধা দমন করা সম্ভব হলেও পেটের ক্ষুধা দমন করা সম্ভব নয়। দুটো ক্ষুধার কারণেই মানুষ লড়াই-সংগ্রাম করে। জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কেউ জয়ী অথবা পরাজিত হয়।’

মিস্টার লরেন্সের প্রায় সবগুলো কথাই মেনে নেয়া যায়। কারণ তিনি যৌনক্ষুধাকে পৃথিবীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বলে উল্লেখ করেছেন সেই সাথে একথাও বলেছেন যে, মানুষ তার কঠিন আত্মসংযম দ্বারা এই ক্ষুধার অবৈধ চাহিদা থেকে বিরত ও বেঁচে থাকতে

পারে। তাই যদি শুধু সৃষ্টিগত সূত্রে প্রাপ্ত জৈবিক চাহিদাকেই গুরুত্ব দেয়া হয় কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংযমের গুরুত্ব না দেয়া হয় তবে বিপর্যয় ঘটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে জৈবিক চাহিদা দিয়েছেন অনেকটা প্রয়োজনে আর কিছুটা পরীক্ষার জন্য। তাই প্রয়োজন ও পরীক্ষা দুটোতেই উতরাতে হবে আল্লাহপ্রদত্ত নীতিমালার আলোকে। একারণেই জৈবিক চাহিদার তীব্রতা স্বীকার করেই তা নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে হাদীসে নববীতে। রাসূলুল্লাহ আলাইহি সালাম ইরশাদ করেন-

«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»

‘যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা যবান ও দুই রানের মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা লজ্জাস্থান হেফাযত করার দায়িত্ব নেবে আমি আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে তার জান্নাতের দায়িত্ব নেব।’ [সহীহ বুখারী : ৬৪৭৪]

ইবন বাত্তাল রহ. বলেন, হাদীসের ভাষ্য মতে দুনিয়ার মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে দুটি অঙ্গ। যবান ও লজ্জাস্থান। অতএব যে এই দুটি অঙ্গের অকল্যাণ থেকে বাঁচতে পারবে সে বড় বিপদ থেকে বাঁচতে পারবে। [ফাতহুল বারী]

এই হাদীস দ্বারা জানা যায়, জৈবিক চাহিদা মানুষের মধ্যে আল্লাহ স্থাপিত গুণ। এটা প্রত্যেকের মধ্যে থাকবেই। কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যথায় সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হবে এবং অবিশ্বাস্য রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হবে।

হয়ত এমনি কোনো অনৈতিক সৌন্দর্য অন্বেষণের কারণেই ঘটল বড় অসম প্রেমের অদ্ভুত একটা ঘটনা।

বৃদ্ধ জনার উদ্দিনের বয়স ৬৩। বার্ধক্যের সবকিছুই তাকে আলিঙ্গন করেছে। মাথার চুল পেকেছে। নাতি-নাতনী হয়েছে। অনেকগুলো দাঁত পড়ে মুখটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। মৃত্যু ফেরেশতা সালাম করি করি করে করেন না! তবু নিবৃত হন না তিনি। সমাপ্তি ঘটেনা সৌন্দর্য অন্বেষণের লড়াইয়ের। বরং প্রেমযুদ্ধে এক শক্তিশালী লড়াইয়ে হিসেবে অবাক করে দেন সকলকে। লড়াইয়ে সকলকে পরাস্ত করে জয় করে নেন এক দুর্লভ ‘পুরস্কার’।

ডালিম বেগম। বয়স মাত্র ১৩। জনারুদ্দিনের প্রায় পাঁচভাগের মাত্র একভাগ। ঝালকাঠির হরিণাকুণ্ড থানায় বাড়ি। নাতনী বয়সী এই মেয়েটাকেও ঘায়েল করেন তিনি। মেয়েটিকে তাকে নানা বলে ডাকত। আর তিনি তাকে ডাকতেন ‘ও নাতনী’ বলে। কিন্তু কী এক সৌন্দর্য অন্বেষণের নেশায় পেয়ে বসে বৃদ্ধ জনারুদ্দিন ও অবুঝ খুকি ডালিমকে। থুবড়ে যাওয়া চামড়ার হাতে কচি-কোমল হাত রেখে অজানার উদ্দেশ্যে হারিয়ে যায় ডালিম। [তথ্যসূত্র : সমকাল, আগস্ট ২০১১ ইং]

অবাক পৃথিবী তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া ডালিমের এই প্রেমআখ্যান দেখে। সত্যি প্রেমের হরণ ক্ষমতা দুর্বার! দায়িত্বের মুখ থেকে করণীয় কেড়ে নিতে পারে। চোখের পর্দা থেকে কর্তব্য সরিয়ে দিতে পারে। আবেগের তাড়না ও

উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বয়সের সীমারেখা তুলে দিতে পারে। যাযাবরী ভাষায়- 'প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যে একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা নিজের মনে মনে মনের মতো করে গঠন করি। যে সৌন্দর্য তার নেই সেই সৌন্দর্য তাতে আরোপ করি। যে-গুণ তার অভাব, সে গুণ তার কল্পনা করি। সে তো বিধাতার সৃষ্ট কোনো ব্যক্তি নয়; সে আমাদের নিজ মানসোদ্ভুত এক নতুন সৃষ্টি। তাই কুরূপা নারীর জন্য রূপবান, বিত্তবান তরুণেরা যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে, অপর লোকেরা অবাক হয়ে ভাবে, 'আছে কী ওই মেয়েতে, কী দেখে ভুলল?' যা আছে তা সে তো ওই মেয়েতে নয়,- সে ভুলেছে তার বিমুগ্ধ মনের সৃজনধর্মী কল্পনায়। আছে তার প্রণয়াঞ্জনলিপ্ত নয়নের দৃষ্টিতে। সে যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে তাহারে রচনা।'

কিন্তু খুকী ডালিমের কতদিন থাকবে সে-অঞ্জন? খুব স্বল্প ব্যবধানেই তা হবে মন থেকে বিলুপ্ত। মন থেকে অপসৃত হবে সে মোহাবেশ। একদিন জগতের সমস্ত কবিকুলের কল্পলোক থেকে আহৃত যে সৌন্দর্য, যে সুষমা, যে বর্ণসম্ভার দ্বারা সে বৃদ্ধ জনারুদ্দিনকে রচনা করেছিল তিলে তিলে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার লেশমাত্রও বাকি থাকবে না। তখন কোথায় গিয়ে উঠবে ডালিম?

তাই একজন মানুষ হিসেবে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। মোহে পড়ে এমন কিছু

করা উচিত নয় যা ভবিষ্যত জীবনে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই মোহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই হবে একজন খাঁটি মুমিনের অন্যতম গুরুদায়িত্ব। যে মোহে পড়ে জনারুদ্দিন আজ ১৩ বছরের একটা কিশোরীকে নিয়ে পথে নামল একদিন এই মোহই তার জন্য কাল হবে। নিশ্চয় মোহ নামের এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুটা সারাজীবন ডালিমকে আচ্ছন্ন করে রাখবে না। জনারুদ্দিনের বার্ধক্যের কাছে হার মানবে এই মোহ। তাই মোহে পড়ে এমন একটি স্থায়ী সম্পর্কে এত ব্যবধান থাকা ঠিক নয়। মানুষের সংযম থাকা যেমন কাম্য তেমনিভাবে সংযমের পথেও হাঁটাও বুদ্ধিমানের কাজ।

বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান থাকা উচিত। তবে তা পরিমিত। যেমন স্বামীর বয়স স্ত্রীর চেয়ে আট-দশ বছর বেশি হতে পারে এবং এমন হওয়াই উচিত। তাই বলে ৫০ বছরের ব্যবধান! কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত উক্তির কথা স্মরণ হলো। তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি হচ্ছে- ‘বহু বৃদ্ধিকে দেখিয়াছি- যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।’

তবে জীবনের প্রয়োজনে যে কোনো মানুষ এই উক্তির বাস্তবায়ন করতে পারে। কিন্তু নিশ্চয় তা সরল পথে হওয়া চাই। ইসলাম কখনই কারো প্রয়োজনকে খাটো করে দেখে না। জনারুদ্দিনের যদি এই বয়সে এসেও সেরকম কোনো প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ইসলাম তার সেই প্রয়োজন পূরণ করবে এবং

এর উত্তম ব্যবস্থা রেখেছে তার পবিত্র সংবিধানে। সে পথে হাঁটলেই তো হয়। কোনো সমালোচনা নেই, নিন্দা নেই কেবলই প্রশংসাই পেতেন তিনি। বৈধ ভাবে ৬৩ বছরে কেন, ১২০ বছরেও যদি কেউ বিয়ের পিঁড়িতে বসে তাতেও বাধ সাধবে না কেউ।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী 'বরের' কথা বলি। আসামের করিমগঞ্জের ষাটঘোড়ি গ্রামের হাজী আবদুন নূর। জীবন ও বয়সের খাতায় যোগ করেছেন দশ দশটি যুগ। ১২০ বছরেও থমকে যায় না তার জীবন। ছয় বছর আগে স্ত্রী সালিমা মারা যাওয়ার পর তীব্রভাবেই অনুভূত হতে থাকে একজন নতুন সঙ্গীনীর। রাখঢাক না করে ছেলেমেয়ে আর নাতীনাতনীর ভরা মজলিসে প্রকাশই করে দিলেন তিনি মনের কথাটা। 'তার দেখাশোনার জন্য একজন লোক প্রয়োজন। আর তাই তিনি আবারও বিয়ে করতে চান।' বললেন ছেলেদের কাছে।

পাক্কা শরয়ীপন্থা। প্রশংসিত উদ্যোগ। ছেলে হাজী আজিরউদ্দিন বলেন, আমরা বাবার প্রস্তাব খুব খুশি মনেই মেনে নিই। কিন্তু শতবর্ষী একজন 'বরের' জন্য পাত্রী পাওয়াও সমস্যা। তবে শরীয়তকে সাথে নিয়ে চললে ভাগ্য ভালো থাকে। সামোনি বিবি নামের ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা আব্দুর নূরের বধূ হতে রাজি হলেন। ৫০০ অতিথির উপস্থিতিতে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী বরের বিয়ের অনুষ্ঠান সংঘটিত হলো। অতীতকে এতদূর ফেলে এসেও শরীয়তের শীতল আবহে

খুশিতে গা জুড়িয়ে যায় আব্দুর নূরের। তিনি বলেন, 'বিয়ের কথা পাকা হতেই অসুস্থতা অনেকটা কমে গেছে।' এদিকে স্বামী আর ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে ও নাতী নাতনীদের নিয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গেই সংসার শুরু করেছেন সামোনি বিবি। [তথ্যসূত্র : দৈনিক সকালের খবর ৩০/১০/১১ইং]

এতো হলো অস্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনায় বয়সের ব্যবধান বেশি হওয়া যেমন উচিত নয় তেমনি একেবারে সমান সমান হওয়াও উচিত নয়। অনেককে দেখা যায় ক্লাসমেট বা সমবয়সী নারী বা পুরুষকে বিয়ে করে। বয়সের সমতাটা এক সময় তাদের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। কারণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই নারীরা দ্রুত বুড়িয়ে যায়। পুরুষের বেলায় তা ঘটে অনেক পরে। ফলে সমবয়সী হলে স্ত্রী আগেই বুড়িয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে স্বামী অতি সংযমী না হলে অন্য নারীর প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে। **তাই সব সত্যের মধ্যে এই বাস্তবতাগুলো মেনে চলারও দরকার আছে। অন্যথায় সংযমের পথ অনেকটাই বাধাগ্রস্থ হতে পারে।**

ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে কথা বলতে হলো। পাঠকগণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বাস্তবতা শুনতে কটু হলেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে তা শুনতে হয় এবং একই কারণে বলতেও হয়। আল্লাহ যেন এই বলার ত্রুটি মার্জনা করে উদ্দেশ্যের সততার কারণে প্রতিদান দেন।

ডাকাতির রকমফের

বাংলাদেশের মানুষের গায়ে দুর্নীতির গন্ধটা বেশি মাত্রায় উৎকট। প্রশাসনের কয়েক শ্রেণীর লোকের দুর্গন্ধটা কারো চোখের আড়ালে নয়। কিন্তু আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাদের দুর্নীতির ধরন ও প্রকার আরও ভয়ানক ও মারাত্মক। কিন্তু মানুষ তা জানে না। আর যারা জানে তারাও একে দুর্নীতি বলে জ্ঞান করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সাধারণ দুর্নীতির চেয়ে ভয়ানক। এদের মধ্যে ডাক্তারদের কথা আসে সবার আগে। বাংলাদেশে চিকিৎসার নামে যে মহাদুর্নীতি হয় তার নযীর পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে বলে মনে হয় না। একজন অসহায়, অভাবগ্রস্থ, নিঃস্বলোকও কোনো কোনো ডাক্তারের কাছে করুণার পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে না! তার কাছে আগে হিসেব অর্থের, তারপরে মানবতার। মানবতার প্রশ্নটা কিছু কিছু ডাক্তারদের কাছে যেন কেমন গুমরে কাঁদে!

কতক ডাক্তারের কাছে জিম্মি মানবতা নামের মহামূল্যবান সম্পদ। আর্থিক অনৈতিকার এই আলোচনা থাকগে। এবার আসল কথায় আসি। মুক্তবাসের এই দুনিয়ায় সমাজের কোনো অংশ নিজেকে পাপের কুফল থেকে দূরে রাখতে পেরেছে বলার সাহস আর হয় না আমার।

সিরাজগঞ্জ : বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোয়ার্টারে এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে মেডিক্যাল অফিসার হাফিযুর রহমান। একারণে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।
পিরোজপুর : পিরোজপুরের শহরের আম্বিয়া হাসপাতালের চিকিৎসক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপারেশন কক্ষে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ অভিযুক্ত চিকিৎসককে রাতেই আটক করেছে। [তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬/০৯/১১ইং]
খুব সংখ্যক ঘটনাই মানুষের দৃষ্টিতে আসে। তাতেই আমাদের দৃষ্টি বিকল হয়ে যায়। কিন্তু ঘটমান সব ঘটনাই যদি আমাদের দৃষ্টিগোচর হতো তবে মানুষ হিসেবে অনেকেই আমরা নিজেদেরকে ঘৃণা করতাম। বড় করে নিজেদের পরিচয় দেয়ার ধৃষ্টতা দেখাতাম না। কত ধরনের অনাচার, গর্হিত কাজ যে আমাদের সমাজের পবিত্রতাকে কলুষিত করছে তা বলতে গেলেও কলম ধরে যায়, বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে আসে।
আধুনিক যুগ বলে কথা। জীবনের সবক্ষেত্রে কৃত্রিমতার ছড়াছড়ি। কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা ভান করে। একাধিক সন্তান নিও না- এ হলো হালআমলের সবচেয়ে বড় হিতোপদেশ! নানাভাবে এর ওপর আমল করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মহিলারা নিজেই কম বাচ্চা নেয়ার জন্য কিংবা শারীরীকি ফিটনেস ধরে রাখার জন্য ডাক্তারের ছুরির নিচে শুইছে। আবার উদ্বুদ্ধ-উৎসাহিত করার সাথে সাথে একাজের জন্য জোরও করা হচ্ছে কোথাও কোথাও।

একারণে কোনো ক্লিনিকে নরমলে বাচ্চা হলেও স্বার্থপর ডাক্তাররা মায়ের পেট কেটে দিচ্ছে সিজার হয়েছে বলে।

প্রসব বেদনায় বেহুঁশ একজন অসহায়, অক্ষম নারীকে নিয়ে ডাক্তাররা কী ছিনিমিনি খেলাই না খেলে থাকে! সিজারের এক রোগীর ভাষ্য। খুব আক্ষেপ করে তিনি মহিলা মহলে কথাটা বলতেন। তিনি নিজের করুণ ইতিহাসের আখ্যান দিতে গিয়ে বলেন, ইঞ্জেকশন দিয়ে পুরো শরীর অবশ করলেও আমি টের পাচ্ছিলাম আমার শরীরের সাথে কী করা হচ্ছে। অপারেশন হলে কোনো মহিলা ডাক্তার বা নার্স নেই। তিনজনই পুরুষ ডাক্তার। একজন সিনিয়র আর বাকি দুইজন শিক্ষার্থী। গুরুর ইশারায় কিছুক্ষণের জন্য ল্যাবের বাইরে চলে গেলো শিষ্যরা। সেই নাযুক সময়ে মুমূর্ষ রোগীর দেহের সাথে খেয়ানত করলেন ডাক্তার!

ঘৃণায় শরীর ফুঁসতে থাকলেও করার কিছু ছিল না মহিলার। প্রতিবাদ করে নরাধমের গালে শক্ত করে একটা চড় বসিয়ে দেবেন সেই শক্তিও কেড়ে নিয়েছে ইঞ্জেকশন। তাই তিনি শরীরের অক্ষমতার কারণে শরীরের খেয়ানত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অক্ষমতার এই লাঞ্ছনাকর স্মৃতি তাকে সাড়া জীবন বিব্রত করে...

হিজাবের ব্যাপারে শিক্ষকরা কেন খড়গহস্ত?

হিজাব মানবজাতির আত্মমর্যাদা রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। নারী-পুরুষ সকলের জন্য তা সমানহারে প্রযোজ্য। কুরআনে পাকে এই উভয় শ্রেণীকে হিজাব বা পর্দার ব্যাপারে তাগিদ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ... ﴿٣١﴾﴾ [النور: ٣٠، ٣١]

'মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। {সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১-৩২}

বস্তুত হিজাবের বিধানটি এত তাৎপর্যপূর্ণ যে, কেউ যদি বিষয়টি নিয়ে গভীর মনোযোগসহ ভাবে তবে সে কুরআনের এই বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেই। হিজাব সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন রকম ভাবনা করে থাকেন। কেউ বিরূপ

মনোভাব পোষণ করেন আবার কেউ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। আসলে এটি এমন এক বিধান যার প্রতি বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা পোষণ করতেই হবে। এখানে হিজাব সম্পর্কে অবসরপ্রাপ্ত একজন বিগ্রেডিয়ার- এর অনুভূতি তুলে ধরা হলো :

সমাজে হিজাব হলো সম্মান, আত্মমর্যাদা ও সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকাল হিজাব বিষয়টি ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সব সময়ই বারবার ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ তথা রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশ্ব রাজনীতিতেও সুবিধাবাদীদের দ্বারা হিজাবের মতো আত্মমর্যাদার প্রতীকটি নিয়ে নিয়মিত টানাহেঁচড়া চলছে।...

শালীনতাবোধের প্রশ্নে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা এখন মোটামুটি ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বলা যায়। এহেন পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবচেয়ে নির্মম শিকার হলো নারীজাতি। আজকের বাংলাদেশে সম্মানিত মা জাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুর্দশা দৃষ্টে 'ধরনী দ্বিধাবিভক্ত হও' বলা ছাড়া উপায় নেই। হিজাব সম্পর্কে প্রথমেই নিবেদন প্রয়োজন যে, হিজাব মূলত মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির বিষয়। তবে একই সাথে নিত্যকর ব্যবহারিক বিষয়ও বটে। কোনো অবস্থাতেই আনুষ্ঠানিক এমন কিছু নয়। হিজাব মানে বিশেষ কোনো পোশাকও নয়। আর হিজাব কোনোভাবেই শুধু নারীর জন্য নয়।

উল্লিখিত আয়াতেই সেটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানে স্বল্পতা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রোণদিতভাবে হিজাব বলতে শুধু বিশেষ পোশাককেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং তা শুধু নারীর জন্যই। অথচ হিজাবের মূল কথা হলো মানুষে মানুষে সম্মানজনক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিন্তু পুরুষদেরকেই আগে হিজাবের আদেশ দেয়া হয়েছে। তারপর নারীজাতিকে। বিষয়টি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, কেউ কেউ ঢালাও মন্তব্য করে যে হিজাব মানেই বিশেষ ধরনের পোশাক এবং তা কেবলই নারীজাতির জন্য।

বর্তমান দিনগুলোতে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি নারী, যুবা মহিলা ও উঠতি বয়সী মেয়েদের ওপর একের পর এক নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনাবলী নিয়ে। যাকে মুখরোচকভাবে ইভটিজিং হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অনেকের অভিমত, বস্তুত: ইভটিজিং শব্দটি প্রয়োগ করে উঠতি বয়সী ছেলেদের আরও বেশি করে নিজের অজান্তেই অনৈতিক কাজে উৎসাহিত করে। যাকে অনেকেই হালকাভাবে বোঝাতে চান, উল্লাস/উৎফুল্লতার অজান্তেই অপরাধ। আমি মনে করি এহেন ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক কাজকে ইভটিজিং নামে অভিহিত করে পাপের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়ার এই প্রবণতা সর্বমহলের প্রচেষ্টায় বন্ধ করা হোক।

হিজাবের যথাযথ গুরুত্ব না থাকায় এমন সব ভয়ানক ও ঘৃণ্য ঘটনা সংঘটিত হতে চলেছে যার কল্পনা করাও এক সময় কষ্ট ছিল মানুষের জন্য। সম্প্রতি পরিমলের ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

এসবের পেছনে মূল কারণ হলো হিজাব সম্পর্কে আমাদের অপরিপক্ক ধারণা অথবা সম্যক-যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব এবং কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চিত অজ্ঞতা। অরেকটি কারণ হলো নিজেকে স্মার্ট ও অতি আধুনিক ভাবার নিম্নমানের রুচির প্রবণতা।

হিজাবের প্রতি অনীহা ও অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা-অবহেলা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই করা হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে আমরা দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছি পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা। পশ্চিমাদের ধারণা ও বিশ্বাস হচ্ছে; 'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছো, খাও-দাও ফূর্তি করো এবং একদিন পৃথিবী থেকে ফুড়ুৎ করে বিদায় নাও।' সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সম্পর্কে তাদের কী জঘন্য অনুভূতি তাই না? আর তাদের এই রুচিহীন অনুভূতি ও দর্শন-বিশ্বাস দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে হিজাবের বিরুদ্ধে কী যুদ্ধই না বাঁধাচ্ছি! কিন্তু আমরা কি কখনও একথা মনে করেছি যে, হিজাবের মূলবার্তা হলো আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা ইত্যাদি কাজে পরিমিতিবোধ ও সন্তুষ্টি।

মানুষের জীবনের অর্থবহ পরিমিতিবোধ ও সন্তুষ্টি থেকেই হিজাবের পরিপূর্ণতা প্রদর্শিত হয়। এই পরিমিতিবোধে অনেকে অস্বস্তি বোধ করেন বলেই হিজাবের বিরুদ্ধে তাদের এত কথা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে শুধু ইসলাম নয় বরং বিশ্বের অবিকৃত সকল ধর্মের বাণী হচ্ছে হিজাবের পক্ষে। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান ধর্মসহ অন্যান্য রক্ষণশীল ধর্মের দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। হিজাবের মূল ও প্রধান কথাই হলো নারী ও পুরুষ

নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। সমাজকে সচেতন করতে হলে ছোট-বড় সকলের সামনে হিজাবের মূল বার্তাকে আনতেই হবে। এহেন সমাজ সচেতনতার মধ্য দিয়েই কিন্তু নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।'

এই হলো একজন বিগ্রেডিয়ারের বক্তব্য। ইসলামের শাশ্বত বাস্তবতার সামনে তিনি অতীত জীবনে অভিজ্ঞতাকে সমর্পিত করে এই অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন। আসলে প্রতিটি মানুষের এমন সত্য অনুভূতি থাকা ও তা প্রকাশ করা দরকার। বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য বিষয়টি আবশ্যক করে নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এখন এর উল্টো ঘটছে সবখানে। যুগটাই যেন পায়ে ছাতা দিয়ে, ঘোড়াকে পিঠ চড়িয়ে আর নৌকাকে শুকনোয় টেনে নেয়ার যুগ। আদর্শ ও নৈতিকতা শিক্ষালাভের প্রাণকেন্দ্র স্কুল-বিদ্যালয়গুলোতে ঘটছে এমন সব অপকীর্তি। স্বয়ং শিক্ষকরা হিজাবের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন। আসলে কেন এসব করছেন তারা তা তলিয়ে দেখা মনে হয় অভিভাবকদের জন্য আবশ্যক করণীয় তালিকায় পড়েছে।

আসলে বর্তমান সময়ে কিছু কিছু শিক্ষক অতিমাত্রায় সম্ভ্রমখেকোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই যে যেভাবে পারছেন শিক্ষার্থীদেরকে লাঞ্ছিতা করতে তৎপর হচ্ছেন। আর পর্দা যেহেতু এই 'কর্মের' পথে প্রধান বাধা তাই তারাই হিজাবের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। নিচের কয়েকটি ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ :

১। নড়াইলের লক্ষ্মীপাশা কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রভাষক শরীফুল ইসলাম গত ৮ই সেপ্টেম্বর দ্বাদশ দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে কলেজে ক্লাশ চলাকালীন হিজাব পরতে বাধা দেন এবং তাকে জোর করে বোরকা তথা মুখের নিকাব খুলতে বাধ্য করেন। আসলে এটা এই মহান শিক্ষকের ভূমিকা। আর কাজের পরিণতি ঘটাচ্ছেন এরাই এবং এদের অনুসারীরাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে- যার খবর আমরা অহরহ পাই দৈনিকগুলোতে প্রতিদিন। তাই জনাব শরীফুল ইসলামের পথ ধরে যারা নিয়মিত ছাত্রীদেরকে লাঞ্ছিতা করে চলেছেন তাদের দুয়েকজনের কাহিনী সম্মানিত পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।
২। ঘটনা রাজশাহীর। জনৈক ভদ্রমহোদয় তার ছাত্রীকে শুধু লাঞ্ছিতা করেন নি বরং শেষে তার জীবনকেও কেড়ে নিয়েছেন। একজন শিক্ষিকের হাতে ছাত্রীর শুধু সম্ভ্রমই অরক্ষিত নয় জীবনও অরক্ষিত! হায় সমাজ! তবে এই সমাজে হিজাবের বিরুদ্ধে লাগবে না কেন?
৩। এই ঘটনাও রাজশাহীর খুব কাছের এক জেলার। ঘটনাটা ধর্মপুর এলাকার হলে কী হবে, ঘটনার মধ্যে ধর্মের ধ-ও নেই। একজন শিক্ষক মাত্র আট বছরের একটা শিশুকে কামনার বাহন বানাবে একথা কি খুব বেশিদিন আগের মানুষ বিশ্বাস করতে পারতো? কিন্তু যুগের সব অসম্ভাব্যতাকে সম্ভব করেই আমরা এগিয়ে চলেছি আগামীর পথে। তাই আমাদের অভিধানে অসম্ভব বলে কোনো বস্তু নেই। সব অসম্ভবকে সম্ভব করে আমরা এক

অজানা পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে চাই! তাই এত সব আয়োজন! শিক্ষক কর্তৃক মাত্র আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ! যাহোক, ঘটনা সুন্দরগঞ্জের। গাইবান্ধা জেলার ধর্মপুর আ: জাব্বার ডিগ্রি কলেজের। এই কলেজের উপাধ্যক্ষ মাহাবুবুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তার অপরাধ খুব 'ছোট'! মাত্র আট বছরের শিশু ফেন্সী (৮) ধর্ষণ ও হত্যা করা! হতভাগা মেয়েটি সম্মানিত শিক্ষকের হাতে সম্ভ্রম খুইয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনটা নিয়েও বাড়ি ফিরতে পারেনি। বরং ওই কলেজের সেফটি ট্যাঙ্কি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। [বাংলাদেশ প্রতিদিনি, ১৬/০৯/১১]

৪। ঝালকাঠির ঘটনা। মেয়েটির বয়স মাত্রই দশ। এরই মধ্যে পেটে টিউমার বাঁধিয়েছে বলে হাসপাতাল, কমপ্লেক্স, ডাক্তার, বদ্যি সবার ধারণা। বিভিন্নজন বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিচ্ছেন। বেশিরভাগ পরামর্শই অপারেশনের। শেষে অভিজ্ঞ একজন ডাক্তারের কাছে নেয়া হলো। তিনি প্রথমে আল্ট্রাসনোগ্রাম করালেন। রিপোর্টটা হাতে আসলে ডাক্তার তো ছানাবড়া! বারবার তিনি রোগীর দিকে তাকাচ্ছেন আর তার বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনোটার হিসেবই মিলছ না তার। দশ বছর বয়সী একজন মেয়ে যদি পাঁচ মাসের গর্ভবতী হয় তবে সেটা সহজে বিশ্বাসই বা হবে কি করে? তাই ডাক্তার সাহেবের হিসেব মিলাতে বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষে হিসেব মিলল। অবসরপ্রাপ্ত ষাটোর্ধ্ব এক স্কুল শিক্ষককে নানা বলে ডাকত সে। টেলিভিশন দেখানোর কথা বলে এই গুণধর শিক্ষকই মেয়েটিকে ঘরে ডেকে

নিত আর পাশবিকতার চর্চা করত। সেই পাশবিক চর্চারই ফল হচ্ছে ডাক্তারের হাতের এই রিপোর্টটি! যা দেখে তিনি বারবার বিস্মিত হচ্ছেন এবং অবিশ্বাস্যভাবে মেয়েটির বয়সের হিসেব মিলাচ্ছেন।

শিক্ষকতা হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানিত পেশা। এর মতো মহান পেশাকে এভাবে কলঙ্কিত করা কি ঠিক হচ্ছে এবং যারা কলঙ্কিত করছে তাদের সুযোগ দেয়া উচিত হচ্ছে? আমরা কেন বুঝি না যে, কিছু শিক্ষক এসব ঘটনা ঘটাবেন বলেই হিজাবের বিরুদ্ধে এত করে লেগেছেন? আল্লাহ মাফ করুন, শিক্ষকরা যেন রক্ষক হন, সম্ভ্রমের ভক্ষক না হন। আর পর্দার বিরুদ্ধে তারা উস্কানি না দেন বরং পর্দাপালনে উৎসাহিত করেন।

নারী নির্যাতন এখন আর গতানুগতিক বা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নয়। বরং প্রযুক্তির ব্যবহারে তা আরও আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। বেড়ে চলেছে এর মাত্রা। প্রযুক্তিবিদ্যায় অভিজ্ঞ চতুররা চালিয়ে যাচ্ছে এসব অপরাধ। মুঠোফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে সামাজিক ভাবে মূল্যবোধবর্জিত এই ব্যধি খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে বলে মত দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ছেলেরা প্রথমে মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা বলে এক সময় প্রেম নিবেদন করে। কতিপয় ছেলে মুঠোফোন মোবাইল ব্যবহার করে এবং কতিপয় ছেলে ইন্টারনেট ফেসবুক ব্যবহার করে মেয়েদের ঘায়েল করতে নিরন্তর চেষ্টা চালায়। বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে প্রথমে মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব পরে প্রেম অতঃপর অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা। এই মেলামেশার এই

স্মৃতিগুলো ধরে রাখতে চতুর ছেলেটি কখনও কখনও মেয়ের সম্মতি নিয়ে কখনও বা গোপনে মোবাইলে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্যাবলী ধারণ করে। পরে প্রতারক ছেলেটি সেই দৃশ্যগুলোকে পুঁজি করে মেয়েটিকে ঘায়েল করে নানাভাবে। নিম্নে মুক্তবাসের এই কঠিন ছোবলের কয়েকটি খণ্ড ঘটনা তুলে ধরছি :

ঘটনা-১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত হোম ইকনোমিক্স কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী শ্রীদেবী (ছদ্মনাম)। পড়াশোনার সুবাদে তার সঙ্গে পরিচয় হয় জামালপুর সদর উপজেলার আরামবাগ বোসপাড়ার প্রদীপ কুমার দে'র ছেলে সঞ্জয় দে রিপনের সাথে। সঞ্জয় শ্রদেবীর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে তার প্রতি প্রেম নিবেদন করে। শ্রীদেবী প্রত্যাখ্যান করায় রিপন তা ভালোভাবে নেয়নি। সে শ্রদেবীকে আলোর ছায়া ম্যাগাজিন (দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার অংশ) অফিসে নিয়ে যায়, সেখানে পরিচয় হয় ম্যাগাজিনের প্রকাশক ও সম্পাদক আবূ রেজার (৩০) সঙ্গে। এক্ষেত্রে শ্রীদেবীকে কাঁটা ভাবে প্রদীপ কুমার এবং কাঁটা তোলার জন্যই আবূ রেজার আশ্রয় নেয় সে।

সম্পাদক আবূ রেজা প্রথম দর্শনেই বিগলত হন, জাতিকে একখানা 'প্রেম আখ্যান ম্যাগাজিন' উপহার দেয়ার উৎসব শুরু করেন। তিনি ভুলে যান যে, যে পদে যে আর যে স্থানে তিনি আছেন, এটা মানুষের বাজার। হাজার রকমের লোক আসবে এখানে। আসবে, যাবে এবং প্রতিমুহূর্তে ঘটবে এসব সাময়ীক ঘটনা। অতএব নিজেকে সবসময় ধরে রাখতে হবে। নিজেকে

রাখতে হবে আবেগ ও ভেঙে পড়া স্বভাবের ঊর্ধ্বে। সাময়িক উত্তেজনাকে কখনই বাস্তবতার মতো অপরিহার্য ভাবা যাবে না। **কিন্তু একটা বড় পদে থেকেও তিনি ন**িজেকে হারিয়ে ফেললেন। একজন ভিন্নধর্মের নারীর কিঞ্চিত রূপ তাকে বিমোহিত করল। আকুণ্ঠে প্রেমে জড়ালেন তিনি। প্রেমের গভীরতা এত বেশি হলো, শ্রদেবীকে পাওয়ার জন্য নিজের ধর্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করলেন!

এভাবে এক অসীম লড়াইয়ে বীরবিক্রমে লড়তে হলো তাকে। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি ফলাফল শূন্য দেখতে পেলেন। শুনলেন অন্য এক ছেলের সাথে শ্রীদেবীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। মাথা ঘুরে গেল তার। প্রতিশোধ নিতে কৌশলের পথে এগুলেন তিনি। কোনো এক সময়ে হয়ত ঘনিষ্ঠ হয়ে শ্রীদেবীর সাথে কয়েকটা ছবি তুলেছিলেন। সেগুলোকে হাতিয়ার বানালেন এই বীরযোদ্ধা! ছবিগুলো এডিট করে, অশালীন ও অন্তরঙ্গ আকারে ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দিলেন। প্রেম প্রেম খেলার সুবাধে ইউটিউবে জমা পড়ল আরো কয়েকটি নোংরা ছবি। ভাঙল ঘর। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল নতুনে শুরু করতে যাওয়া একজন নারীর অনভিজ্ঞ জীবন।

ভাঙছে ঘর

রাজধানীতে পারিবারিক জীবনে সংসার ভাঙার ঘটনা অস্বাভাবিকহারে বাড়ছে। এর বেশির ভাগই হচ্ছে মেয়েদের পক্ষ থেকে। স্ত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামীকে তালাক দিচ্ছেন। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের হিসেব অনুযায়ী মোট তালাকের ৭৫ ভাগই দিচ্ছেন নারীরা। বছরে নগরীতে পাঁচ হাজারেরও বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। দিন দিন এর মাত্রা বাড়ছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক মেহতাব খানম বলেন, দুটি কারণে বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। প্রথমত, মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে। তারা এখন অনেক সচেতন। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য না করে বিচ্ছেদের পথ বেছে নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মোবাইল কোম্পানিগুলোর নানা অফার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, পর্নোগ্রাফি, ফেসবুক ইত্যাদি সহজলভ্য উপাদান থেকে আকৃষ্ট হয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে বিয়ের মতো সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে একটু সংকোচ করছে না তারা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিয়ে বিচ্ছেদের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটছে উচ্চবিত্তদের ক্ষেত্রে। পরকীয়া, পরনারী আসক্তি, যৌতুক, শারীরিক নির্যাতন এবং মাদকসেবনসহ নানা কারণে এধরনের ঘটনা ঘটছে।

বিচিত্র আমাদের দেশ। আমরা আন্দোলন করে রক্ত দিয়ে দেশ থেকে যাদেরকে বিতাড়িত করি, ঝেটিয়ে তাড়িয়ে দেই পরবর্তীতে পরম সম্মান করে সেই তাদের আইনই মাথায় তুলে রাখি, চোখে মাখি এবং শ্রদ্ধায় আইনের সামনে মাথা নত করি। আমরা বৃটিশ বেনিয়াদের বিতাড়িত করেছি কথাটা বলি। কিন্তু বৃটিশরা নিশ্চয় কথাটা শুনে হাসবে। কোথা থেকে বিতাড়ন করেছো! আইন, আদালত বিচার-আচারে, কৃষ্টি-কালচার সব জায়াগায় তো আছি আমরা বাপ!

পাকিস্তানীদের পরাজিত করেছি বলে আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়ন করার সেকি আমাদের গৌরব! কিন্তু কই তারা তো এখনও আমাদের মাঝে রয়ে গেছে! পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানীদের হাতে রচিত ইসলাম ও আলেম-উলামার নিকট ধিকৃত 'আইন মুসলিম পারিবারিক আইন' তো এখনও 'সপদে' বহাল আছে এদেশে। সেই ধিকৃত ও ইসলাম প্রত্যাখ্যাত আইন দিয়েই তো বিবাহ, তালাকের মতো শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো পরিচালিত হচ্ছে! শরীয়ত যেখানে তালাক দেয়ার পর তৎক্ষণাৎ কার্যকর করার কথা বলেছে পাকিস্তানী এই আইনে শরীয়তের ওপর হাত ঘুরিয়ে তালাক দেয়ার পর তিন মাস পর্যন্ত বিলম্ব করে সালিসের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে উপস্থিত করে সেই তালাক কার্যকর করা না করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে! আল্লাহর আইনের সাথে কতবড় ধৃষ্টতা!

যাহোক, ডিসিসির ১০টি অঞ্চলের হিসেব মতে, ২০০৫ সালে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা ছিল ৫ হাজার ৫২৫টি, ২০০৬ সালে ছিল ৬ হাজার ১২০ টি, ২০০৭ সালে এসংখ্যা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৭ হাজার ২০০তে। ২০০৮ সালে অবশ্য এর পরিমাণ কিছুটা কমে আসে। এবছর বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে ৭ হাজার ৭৮টি। ২০০৯ সালে সেই সংখ্যা আবার বেড়ে যায়। এবছর এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ হাজার ৭০৪ টিতে। ২০১০ সালে এর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তখন এর সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৯০৫টি।

বিয়ে বিচ্ছেদের এই প্রবণতা সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজ বিশ্লেষক, গবেষক, নারী নেত্রী ও মানবাধিকার কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের রয়েছে বিচিত্র রকমের অনুভূতি। তবে সবাই একবাক্যে এই তথ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আরও বেশি বিস্মিত হয়েছেন মেয়েদের পক্ষ থেকে এই প্রবণতার আধিক্য দেখে। দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েরাই বিয়ে বিচ্ছেদের দিকে বেশি পরিমাণে ঝুঁকছে। মেয়েদের পক্ষ থেকে ৭৫ ভাগ বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়ে বলে জানা গেছে।

কেস স্টাডি-১ : তানজিমা শবনম (৪৫)। বাসা গুলশান মডেল টাউনে। মিডিয়া কর্মী। স্বামী ব্যবসায়ী। ১ ছেলে ও ১ মেয়ের মা। দেবর ডা. মনজুর হোসেনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। ২০০৯ইং সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন দিবসে স্বামীকে তালাক দিয়ে মনজুরকে বিয়ে করেন। বিয়ের কিছুদিন পর মনজুরের স্ত্রী ঘটনা জানতে পেরে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ

কারণে মনজুর আগের স্ত্রীকে তালাক দেন। একমাত্র মেয়ে পুতুল লন্ডনে এমবিবিএস পড়ছিলেন। বাবার এ কাজে হতাশাগ্রস্ত হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন তিনি। মায়ের সঙ্গে এখন গুলশানে বসবাস করছেন তিনি। ডিসিসির ৯ নং অঞ্চলে এই তালাক কার্যকর করেছেন তিনি।

কেস স্টাডি২-: তাজুল ইসলাম। উত্তরা মডেল টাউনের বাসিন্দা। বনিবনা না হওয়ার অজুহাতে স্ত্রী তাহেরা বানুকে তালাক দেন তিনি। জানা যায়, আরেকটি বিয়ে করার জন্য তিনি এই স্ত্রীকে তালাক দেন। [সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন ০১/১০/১১ইং]

নানা কারণে মানুষের ঘর ভাঙে। সামাজিক অস্থিরতা, মাদকাসাক্তের প্রভাব, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, পরস্পরকে ছাড় না দেয়া ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ির কারণে ঘর ভাঙে। এগুলো হলো অতি সাধারণ ও পরিচিত কারণ, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিশেষ করে আমাদের এই দরিদ্র অঞ্চলে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঘর ভাঙার মাত্রা যেমন বেড়েছে তেমনি এর নয়া নয়া কারণও আবিস্কৃত হয়েছে।

আলোচ্য লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসলামবিমুখ হলেও সমাজের সচেতন মানুষেরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, ইসলামী বিধিবিধান পালনে শিথিলতা এসব ভয়ানক পরিণতির অন্যতম প্রধান কারণ। বিশেষ করে একটা কথা খুবই ভয়ানক মনে হয়েছে একথা শুনে যে, শিক্ষার হার বাড়ার কারণে বিয়ে বিচ্ছেদের মতো সামাজিক অবক্ষয়ের আলামত ও অশান্তির

অন্যতম নিদর্শনগুলো প্রকাশ পাচ্ছে! তাহলে কী আমরা একথা বলব যে, প্রচলিত এই শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? যে শিক্ষা মূল্যবোধ ও পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে ব্যর্থ সেই শিক্ষায় আমরা এত পুলকবোধ করছি? হাজার হাজার কোটি টাকা এর পেছনেই ব্যয় করছি? মাখামাখি আর ঢলাঢলির এই শিক্ষা আমাদের জাতিকে ভবিষ্যতে পুরো অন্ধ করে দেবে নাতো? বড্ড ভয় হচ্ছে যে আমার!

প্রথম ঘটনাই দেখুন। শবনম একজন মিডিয়াকর্মী। যেই মিডিয়াই হোক না কেন মিডিয়ার কাজ হচ্ছে নাগরিকদের সাথে আত্মার যোগসূত্র স্থাপন করা, দেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করা। মিডিয়ার তো আলাদা কোনে অস্তিত্ব নেই। কর্মীরাই মিডিয়ার প্রাণ, তারাই মিডিয়া। সুতরাং একজন মিডিয়াকর্মীর কাছে দেশ ও মানবতার অনেক কিছু চাওয়ার থাকে। সেই চাওয়ার প্রধান বিষয় অবশ্যই নৈতিকতা, সামাজিক মর্যাদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। কিন্তু কী করলেন শবনম? একজন মিডিয়াকর্মী হয়ে তিনি দেশবাসীকে কীসের পয়গাম দিলেন? নিজের ঘর ভাঙলেন, অন্যের ঘর ভাঙালেন এবং অসংখ্য মানুষকে চরম অশান্তির মধ্যে ফেলে সাময়িক আনন্দ লাভ করতে গেলেন। সামান্য এই আনন্দ লাভের জন্য একজন মানুষকে এত নিচে নামতে হলে তার সাথে অন্যান্য জন্তুর পার্থক্য কোথায়? একটি শিক্ষা যদি দেবর-ভাবির মধ্যকার মাখামাখির করুণ পরিণতি

সম্পর্কে সচেতন করতে না পারে তবে সেই শিক্ষাকে সাধুবাদ জানাতে কষ্ট হয় বৈকি!

আমার কাছে বারবার তাজ্জবের কারণ বনছে এই তথ্যটি যে, মানুষ এখন বেশি শিক্ষিত হচ্ছে বলে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে! তাহলে আমরা কি আগের অবস্থাতেই ফিরে যাবো, যেখানে শিক্ষাও ছিল না, ঘর ভাঙারও প্রশ্ন ছিল না? যেই শিক্ষায় ঘর ভাঙায়, সামাজিক অশান্তি ঢেকে আনে সে শিক্ষা না কিছু দিন আমরা বন্ধ রাখলাম! আসলে শিক্ষার তো দোষ নেই। দোষ হচ্ছে যথাযথ শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া। বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশের সাধারণ শিক্ষালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা যদি চরমভাবে নিগৃহিত হয় তবে সেদেশে এ ধরনের করুণ পরিণতি তো হবেই। তাই এখন সময় হয়েছে জাগবার, জাগাবার এবং দেশের কল্যাণ নিয়ে ভাবার। কর্তৃপক্ষের উচিত এমন শালীন পরিবেশে এমন ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে ধর্ম ও নৈতিকতার পূর্ণ দখল থাকে।

সামাজিক এই ব্যধি দূর করতে ইসলামী বিধিবিধান যেমন মেনে চলা আবশ্যক, ঠিক তদ্রুপ সামাজিক কিছু বিষয় মেনে চললে তাদের পরস্পরে মিলঝুল কিছুটা বেশি থাকবে। ফলে তুলনামূলক ঝগড়া-ঝাটির পরিবেশ কমে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করতে পারে। নিম্নে স্বামী-স্ত্রীর করণীয় ও সামাজিক এবং সাংসারিক জীবনে দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

স্বামী স্ত্রীর বিশ্বস্ততা : যে মানুষটির সাথে সারাজীবন ঘর করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংসার রচনা করেছেন সেই মানুষটির প্রতি আস্থাশীল হন। নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বোঝাপড়া সৃষ্টি করুন। যে কোনো সমস্যা দুজন মিলে সমাধান করার চেষ্টা করুন। কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দিলে কিংবা কোনো রকম সংশয় দেখা দিলে একাকী সিদ্ধান্ত না নিয়ে সম্মিলিত ভাবে সমাধানে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, বিয়ের আগের আবেগ-অনুভূতি আর বিয়ের পরের বাস্তবতার মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান থাকে। এই শাশ্বত বাস্তবতা কখনও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। সংসারের অনেক অশান্তির কারণ এই অনুভূতির অক্ষমতা। মানুষ মনে করে বিয়ের আগে কিংবা বিয়ের পরের প্রথম সময়টা যে অবস্থায় কেটেছে তা সর্বদা থেকে যাবে এবং এই থেকে না গেলেই অনেকে চটে যান। ব্যাপারটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন অনেকে। ফলে অনিবার্য রকমের সংঘাতের পথ খুলে যায়।

‘দেখতে সুন্দর, ভালো কথা বলে, না বলতেই সবকিছু বুঝে যায়, কোনো ইচ্ছাতেই বাধা দেয় না। এমন সব গুণসম্পন্ন মানুষই তো ভালো মানুষ। কিন্তু স্বপ্নের এ ছবির সাথে বাস্তবের ফারাক দেখে অনেকটাই হতাশ হয়েছি- এমনটা বললেন ইডেন কলেজের মাস্টার্সের শেষবর্ষের ছাত্রী সুমা। সুমার মতো অনেকেরই স্বপ্ন ভাঙে বিয়ের পর। আর এই স্বপ্নভঙ্গের কারণে সংসারে বিচ্যুতি দেখা দেয়। তাই আগ থেকেই প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন হতে হবে।

কোন ধরনের আবেগ প্রশ্রয় দিতে হবে এবং কোন ধরনের আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না তারও একটা মানদণ্ড কায়েম করতে হবে। সেই মানদণ্ডে ফেলে বিষয়টি পরিমাপ করলে সংসারের অশান্তি বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

আর একথাও মনে রাখতে হবে যে, স্বামী এবং স্ত্রী দুইজনই সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইজন মানুষ। তাদের বেড়ে ওঠা, পরিবার, পড়াশোনা, অভ্যাস একজন থেকে আরেকজনের আলাদা হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কেউ কাউকে বশে আনার চিন্তা না করে প্রত্যেককে নিজের অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উচিত। স্বামী শাসক হয়ে ওঠা এবং স্ত্রী নিজেকে স্বামীর দাসী ভাবা কোনোটাই কাম্য নয়। শরীয়ত কাউকে এমন ভাবার অধিকার দেয়নি। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

‘তাদের জন্য রয়েছে তেমন হক যেমন রয়েছে নারীদের প্রতি পুরুষদের হক।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২৮}

সংসারে, দাম্পত্যজীবনে সমস্যা আসতেই পারে। মতানৈক্য কিংবা মৃদ ঝগড়াঝাটিও হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে এটাকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেয়া কিংবা পরে এটাকে কেন্দ্র করে কটুক্তি করা বা নিন্দার পথে হাঁটা মোটেই কাম্য নয়। আর এতে তৃতীয় কাউকে টেনে তো চরম অরুচিকর ব্যাপার। স্বামী স্ত্রী উভয়কেই মাথা গরম না করে যে কোনো বিষয় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। সংসারী ব্যাপারকে পাড়া-প্রতিবেশী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াও কাম্য নয়।

সাংসারিক টানাপোড়নের অন্যতম হলো স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা করে ফেলার তড়িৎ উদ্যোগ। বিষয়টা একেবারেই অযৌক্তিক। স্বামী যে পরিবেশে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, যে সব মানুষের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন রাতারাতি সেসব বস্তু দূরে ঠেলা দেয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই এক্ষেত্রে নারীকে স্বামীর পরিবার ও অন্যান্য সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এরূপ করতে পারলে অনেক ঝামেলাই নিজ থেকে দূরে সরে যাবে।

আর বিয়ের পর মনের কথা ব্যক্ত করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ব্যক্তি হচ্ছে স্বামী। তবে সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। স্বামীর কাছে শ্বশুরবাড়ির কারো সমালোচনা করা বা কোনো বিষয়কে একেবারে ঘৃণা করা উচিত নয়। এতে স্ত্রীর প্রতি স্বামী মারাত্মক বিরক্ত হয়ে উঠতে পারেন। আবার অনেক পরিবারে পুত্রবধুকে একেবারে দাসি বা কাজের মেয়ের অসম্মান করা হয়। তাদেরকে সারাজীবন একান্নে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়। এদুটির কোনোটাই উচিত নয়।

সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবনে এসব বিষয় মাথা রেখে চলতে পারলে আশা করা যায় আমাদের এই মুসলিম পারিবারিক পবিত্র বন্ধন এতো ঢিলে ও হালছাড়া অবস্থা হবে না। আর দিন দিন বাড়তে থাকবে না বিয়ে বিচ্ছেদের প্রবণতা। মনে রাখবেন যে সমাজে বিয়ে বিচ্ছেদের প্রবণতা বেড়ে যায় সেই সমাজে যিনা-

ব্যভিচারের ছড়াছড়ি দেখা দেয়। পশ্চিমা বিশ্বের ঘরোয়া জীবন আমাদেরকে সেই অশুভ পরিণতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধর্ষিত সভ্যতা এবং লাঞ্ছিত মানবতা

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের হীনমন্যতা সারাবিশ্বে জঘন্যতার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। সারাবিশ্বে যখন ধর্মীয় উৎসব বা আয়োজনগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কমানো হয়, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগিয়ে চরম মুনাফাখোরীতে লিপ্ত হয়। রমযান সারাবিশ্বের মুসলিমের কাছে পরম পবিত্রতা ও সংযমের পয়গাম নিয়ে আগমন করে। কিন্তু বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে তা আগমন করে চরম মুনাফাখোরীর বার্তা নিয়ে। এ এক লজ্জাকর ইতিহাস, জঘন্য মনোবৃত্তি। থাক সে সব কথা।

এবার এমনি এক মুনাফাখোরী সাধারণ ব্যবসায়ীর কথা বলি। লোকটি মোবাইল ফোন ও মোবাইল রিচার্জের ব্যবসা করেন। প্রায় তিন ডজন বাটন টিপে একবার লোড দিয়ে কখনও কখনও মাত্র ২৭ পয়সা কামাই করতে হয় লোডব্যবসায়ীদের। তাই একটু বড় পয়সা বা দুয়েক টাকার প্রশ্ন এলে তাদের কারও কারও ভেতরটা লোভে চক চক করে ওঠে। ফলে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে কখনও কখনও চরম জঘন্য ইতিহাস রচনা করেন তারা।

টুম্পা (ছদ্মনাম) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বেশ দর্শনদারী। মনে হয় বংশীয়। প্রথমে ঢাকায় পা রাখার পর দলে টেনে নেয়ার জন্য যেমন রাজনৈতিক দলগুলো নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তেমনিভাবে প্রথমে ঢাকায় পা রাখা গ্রাম্য সরল মেয়েগুলোকে প্রেমের

ফাঁদে ফেলতে ওঁৎ পেতে থাকে একশ্রেণীর চতুর যুবক। তাদের সেই চাতুর্যে ধরা পড়ে যে সব ছাত্রী, তারা বাকি জীবন ব্যর্থতার বন্দী খাঁচায় ছটফট করতে থাকে। ঢাকায় আসার স্বপ্ন, রাজধানীর ছায়ায় বড় কিছু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে যায় কোন্ অজানা দিগন্তে। আর যারা স্বপ্নকে বাঁচানোর জন্য কঠোর হয়, চতুর কামুকদের পাতা ফাঁদে পা না দেয়ার দুঃসাহস দেখায় তাদেরকেও প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়।

কুজনের চোখ রাঙানী, ভেংচি কাটার মধ্যে কাটতে থাকে তাদের নিঃসঙ্গ জীবন। তবে সাময়িক কষ্ট হলেও তারাই এক সময় সফল হয়। কর্মজীবনে তারা সফলতার উজ্জ্বল তারকা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মোহের কাছে যারা হার মানে, ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয় তারা সাময়িক আনন্দের কাছে সারা জীবনকে বিকিয়ে দিয়ে আসে।

এমনি এক মেয়ে টুম্পা (ছদ্মনাম)। মা-বাবা বড় আশা নিয়ে আদরের কন্যা টুম্পাকে ঢাকা ভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন। টুম্পা উঠলেন এক মহিলা হোস্টেলে। প্রথম দিনেই একাধিক লোভের চোখ তাকে কুণ্ঠিত করল। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ঢাকায় আসার উদ্দেশ্য তাকে সংযত রাখল এসব লোভাতুর চাহনীর অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া থেকে। এগিয়ে চলল তার লেখাপড়ার সংগ্রাম। কিন্তু তাকে বাগে পেতে মরিয়া হয়ে যারা ছুটছিল তারা নিরাশ হওয়ার পাত্র নয়। তারা তার পিছু ছাড়ছিল না। যে কোনো মূল্যে তাকে বশ করা ছিল প্রতারক লোকদের প্রধান লক্ষ্য।

শেষ পর্যন্ত তারা প্রতারণার আশ্রয় নিল। মেয়েটির মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা হিমশিম খেলেও নতুন ও অভিনব পন্থা অবলম্বন করল তারা। খেয়াল করল কোন্ দোকান থেকে মেয়েটি টাকা রিচার্জ করে। কলেজ-ভার্সিটি ও এধরনের জনবহুল এলাকায় মোবাইল ব্যবসায়ীর অনেকেই সামান্য কিছু পয়সার লোভে অতি হীনপন্থা অবলম্বন করে থাকে। এলাকার বখাটেদের সাথে তাদের চুক্তি করা থাকে। দশ/বিশ টাকার বদলায় তারা বখাটেদের হাতে রিচার্জ করতে আসা সুন্দরী মেয়েদের নাম্বার ধরিয়ে দেয়।

টুম্পা পড়লেন এমন এক হীনমন্য প্রতারক ব্যবসায়ীর হাতে। যে দোকানে টাকা রিচার্জ করতে আসলেন তিনি সেই দোকানের সাথে বখাটেদের আগ থেকেই চুক্তি করা ছিল। ফলে মাত্র দশটাকায় সে টুম্পার নাম্বার দিয়ে দিল। হাতে সোনার হরিণ পেল বখাটে ছেলেটি। দীর্ঘদিনের সাধনা পূরণ হওয়ার আনন্দে আজ সে খুশিতে আটখানা।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল মোবাইলের রিংটোনে। চমকে গেলেন টুম্পা। এই সময় তো তার নাম্বারে ফোন আসার কথা নয়! তাও আবার অপরিচিত নাম্বার! বহু সংকোচে কলটা রিসিভ করলেন। অপর প্রান্তের লোকটির বিনয়ী সুর, আমি ...আপনি কি...

উটকো ঝামেলা বলে একবার লাইনটা কেটে দেয়ার উদ্যোগ করলেন টুম্পা। কিন্তু কী এক সংকোচ তাকে জড়িয়ে ধরল। তিনি লাইনটা কাটতে গিয়েও কাটলেন না। বেশ কিছুক্ষণ কথা

বললেন। লজ্জা ও সংকোচ কাজ করলেও কেমন যেন ভালোই লাগে বলে মনে হলো তার। লোকটা কে, টুম্পার কাছে কী চায় সে- ইত্যাদি প্রশ্ন ও কৌতূহল তাকে তাড়িয়ে নিল কৌতূহলের বিরানভূমিতে। কৌতূহলের মধ্য দিয়েই পরের দিনটা কেটে গেল। তিনি অনুভব করলেন তার ভেতরটা যেন এই লোকের কাছ থেকে আবার কল পাওয়ার আশা করছে। রাতে শুতে গিয়ে গতকালের স্মৃতিটা বারবার রোমন্থন করতে লাগলেন। স্মৃতিটাও তার কাছে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হলো। তাই আজ আবার কলটা বেজে ওঠার আগ্রহ তাকে অধীর করে তুলল। তিনি সেই অপরিচিত লোকটির করা একটি রিংটোন শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি করতে থাকলেন।

এক অনিশ্চিত প্রত্যাশার সম্ভাব্য শিহরণে তার সময়গুলো মৃদ মেজাজে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘ হয় আর তার শিহরণগুলো অপ্রাপ্তির আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। এমনি এক দোলাচলে এগুতে থাকে তার এই কঠিন মুহূর্তগুলো। সময়ের আঙিনায় এক সময় যেমন সূর্য উদিত হয়, তেমনিভাবে টুম্পার আকাঙ্ক্ষার সীমানাতেও একবার প্রত্যাশার নবোদয় হয়। চাওয়ার তীব্রতার মধ্যেই হঠাৎ তার মোবাইলটা বেজে ওঠে। তিনি শিহরণে কাঁপতে থাকেন। অপরপক্ষের লোকটিও যেন তার হাতের কাঁপন অনুভব করে। লোকটি বুঝতে পারে টুম্পার মানসিকতা। সেভাবে কথার টোপ ফেলে সে। ফলে বড়শীতে যে শিকার আসতে সময় লাগতো অনেক, সে শিকার খুব কম সময়ের মধ্যেই তার

বড়শীতে আটকা পড়ে। কথার জালে খুব তীব্রগতিতেই জড়াতে থাকেন টুম্পা।

উভয়ের কথা বলা এখন আর শিহরণ বা আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা অধিকারে পরিণত হয়। লোকটি কল দিতে দেরি করলে বা প্রত্যাশিত সময়ে কল না পেলে বড় করে অভিমান করেন টুম্পা। সে অভিমান ভাঙাতে বেশ গলদঘর্ম হতে হয় সেই লোকটাকে।

এভাবে আরো বেশকিছুদিন কেটে যায়। আবেগ-অনুভূতির পাখা একের পর গজাতে থাকে টুম্পার। এক সময়ে ভুলেই যান ঢাকা আসার উদ্দেশ্যের কথা। মা-বাবার স্বপ্ন পূরণের দায়িত্বের কথা। সেই ভুল তাকে কাঁদায়, তার মা-বাবাকে কাঁদায় এবং একটি স্বপ্নকে চূর্ণিত করে।

ঢাকার ছেলেমেয়েদের প্রেম প্রেম খেলার অন্যতম রসদ ও সঙ্গী হলো দুইজন মিলে একসাথে চাইনিজ, ফুসকা, আইসক্রিম খাওয়া আর নানা গহীন জায়গায় আড্ডা দেয়া। চাইনিজ খাওয়া বা আড্ডা দেয়ার এমনি এক প্রলোভনের অফার দিয়ে একদিন টুম্পাকে ফোন করলো সেই লোকটি। ফোনের দাওয়াতে শিহরিত হয়েও থেমে গেলেন টুম্পা। এত রাতে একা বের হওয়া সমীচীন মনে হচ্ছিল না। কিন্তু প্রিয় মানুষের অনুরোধে তার এই ভাবাভাবি পরাস্ত হলো। তিনি তার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হলেন।

আসলে মানুষের আন্তরাত্মা নামের কিছু একটা আছে। না হলে মানুষ যে বিপদে পড়ে আকারে ইঙ্গিতে সে তা প্রকাশ করে

কীভাবে? টুম্পার অন্তরাত্মাও বারবার তাকে নিবৃত করছিল না যাবার। কিন্তু তিনি তার অন্তরাত্মার কথায় কান দিতে গিয়েও দিলেন না। ফলে এক চরম অশুভ পরিণতির জালে পা ফেঁসে গেল তার। লোকটি তাকে এক অজানা ঠিকানায় নিয়ে যেতে লাগল। টুম্পা মৃদ প্রতিবাদ করেও তেমন কিছু করতে পারলেন না।

এক পর্যায়ে লোকটি তার মুখোশ উন্মোচন করল। টুম্পাকে সে লাঞ্ছিতা করার উদ্যোগ নিতেই সে বিস্ময়ে, বেদনায়, ক্ষোভে একেবারে পাথর হয়ে গেল। চূড়ান্ত সর্বনাশ হতে দেখে সে তার কথিত প্রিয় মানুষের পায়ে পড়ে বলল, আমার প্রেমের কসম! বিয়ের আগে এসব নয়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। আমি তো তোমারই থাকব! কিন্তু লোকটি বাজখাই গলায় বলল, প্রেমের কসম! কীসের প্রেম? কার সাথে প্রেম? তুমি আমার দশ টাকার প্রেম! দশ টাকায় আমি তোমাকে বাগে পেয়েছি, তাই আজ...

বড্ড রিক্তহস্তে হোস্টেলে ফিরলেন টুম্পা। বারবার মনের জানালা দিয়ে উঁকি দিতে থাকল গ্রামে ফেলে আসা সরল মা-বাবার কথা। মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন বোনা মানুষগুলো এখন কী করছেন? হয়ত ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়ে নির্বিঘ্নে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। কিন্তু হায়! এই যে বাবা এই মা! তোমাদের টুম্পা আজ শেষ হয়ে গেছে। যাকে নিয়ে তোমরা স্বপ্নের পাখা মেলতে, দেখে যাও আজ সে বড়ই অসহায়। বড় রিক্ত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। সমাজ সভ্যতার

নিষ্ঠুরতা তাকে আজ তোমাদের থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেবে, মা!

সমাজের অনেক মানুষ এখন মেয়েকে নিয়েই স্বপ্ন বোনেন। কন্যার কৃতিত্বে মুখ উজ্জ্বল হবে, দুখ মুছবে, অভাব দূর হবে ইত্যকর আশায় তারা প্রশান্তির নিশ্বাস নেন। টুম্পা সেসব বাবা-মাদেরই একজন মেয়ে। যখন ঢাকায় পা রেখেছিলেন তখন কোটি মানুষের শহর তার কাছে বড্ড অপরিচিত ঠেকেছিল। একজন দুর্বল নারী হয়ে কীভাবে এই নির্দয় শহরে নিজেকে মানিয়ে নিবেন এসব ভাবনাও তাকে তাড়া করেছিল। কিন্তু সেই অসহায় দরিদ্র বাবা-মার দুখ ঘোচানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাকে সেদিন শক্ত করেছিল। তিনি নিঃসঙ্গ মুসাফিরের ন্যায় নিজ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলছিলেন। কিন্তু অচেনা একটা মরুঝড় আজ তার জীবনটাকেই এলোমেলো করে দিল!

বিধ্বস্ত এই সতীত্ব নিয়ে তিনি কীভাবে সমাজের কাছে মুখ দেখাবেন, মা-বাবার সামনে কোন মুখে উপস্থিত হবেন এসব তিক্ত জিজ্ঞাসা তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলল। নিজেকে খুব করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন। কেবল মা বাবার দুঃখমোচন ও তাদের আশা পূরণের জন্য হলেও তাকে শূন্য হাতে নতুন করে শুরু করতে হবে বলে নিজেকে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু পাথরসম বাস্তবতা ছাপিয়ে কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মানুষের গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র।

সদ্যরচিত ও সংঘটিত এই চিত্র তার সুস্থ মস্তিষ্ককে নিষ্ক্রিয় করে দিল। তিনি আজ ভুলে গেলেন নিজেকে, ভুলে যেতে কসরত করলেন জন্মদাতা মা-বাবার স্মৃতি, গ্রামে রেখে আসা হাজারও আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর কথা। নির্জনে, একাকিত্বে অশ্রুপাত করে দূর করতে চাইলেন গ্লানি। কিন্তু অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটা থেকে ঝরে পড়ল কেবলই অভিমান, অনুযোগ, দুঃখ আর বেদনা। নির্ভার হতে পারলেন না কিছুতেই। হালকা করতে পারলেন না মনের ব্যথা। তাই বাধ্য হয়ে অনাগত ভবিষ্যতের কোলে আশ্রয় নিয়ে চিরদিনের জন্য ভুলে যেতে চাইলেন কেবলই ফেলে আসা এই ঘৃণ্য অতীত।

পাঠক! পরের দিন জনকোলাহলে মুখরিত মানবতাশূন্য এই বিশাল শহরের একটি হোস্টেলের নির্জনকক্ষে দুঃখী, অসহায়, বঞ্চিত, অপমানিত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত এক সরল যুবতীর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গিয়েছিল। জানেন কার লাশ ছিল সেটি? [তথ্যসূত্র : যায়যায়দিন]

হন্তারকের অভিষেক

দৃষ্টিপাত বইটি আমি অনেকবার পড়েছি। কতবার হবে তা বলতে পারব না। বইটা পড়তে এখনও মন টানে। সাহিত্যের জন্য একাধিক বই না পড়ে প্রকৃত সাহিত্যের একটা বই বারবার পড়াই বেশি উপযোগী। লেখকের ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া বাকি সবকিছু আমাকে মুগ্ধ করেছে। যাযাবর ছদ্মনামের এই লেখকের শব্দের গাঁথুনি আর বাক্য চয়ন এত চমৎকার যে, বইটি না পড়লে তা উপলব্ধি করা কঠিন। বইটির একজায়গায় তিনি নারীজাতির মূল্যায়ন করেছেন খুব রসালো ভঙ্গিমায়, রসাত্মক ভাষণে। যে কথাগুলো তিনি বলেছেন তারও অবশ্য একটা প্রেক্ষাপট আছে। লেখক একজন হিন্দু লোক হওয়া সত্ত্বেও ভারত উপমহাদেশের নারীরা কীভাবে বিদেশী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করল তা তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করেছেন। তার এসব মূল্যায়নে ধর্মীয় ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি লিখেছেন-

'পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নতুন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন-ভূষণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এতকাল নারীকে কেবল আমরা পুরুষের আত্মীয় রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, পিসি, দিদি, বৌদি কিংবা শ্যালিকা।

কিন্তু জায়া, জননী এবং অনুজা ছাড়াও নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী (গার্লফ্রেন্ড)।

প্রাণীজগতের মতো মনোজগতের বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূল্যের যুগে যুগে তারতম্য হয়েছে। একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিল সর্বপ্রধান। সেদিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশপরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণিত হত মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা ও সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কল ফ্যামিলি বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরানীর মর্যাদা হল অধিক। সাধারণ পরিধি পরিমিত। সংসারের কর্ত্রী হলেন জননী নয় গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউ-এর আঁচলে আত্মসমর্পণ করল।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরে মায়েরা খুশি হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হল না। হার হল তাদেরই। শুধু বউকাঁটকি আখ্য পেয়ে নাটক, নভেলে তারা নিন্দিত হলেন। যারা বুদ্ধিমতী, তারা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে-, কিন্তু স্বচ্ছন্দে নয়। জগতে সমস্ত বিক্ষুব্ধ মাতৃকুলের অনুরক্ত অভিযোগ আজও জেগে আছে বধুশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। ইউরোপ আমেরিকার সমাজে পত্নীকর্তৃত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পর ছেলের সংসারে মায়ের স্থান নেই, কিংবা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য নয়।

এ যুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশি। সে দশটা পাঁচটায় অফিসে যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ারমার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস কিংবা মিটিং। রাত্রিতে সিনেমা অথবা ক্লাব। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্মাচারণ হত। কিন্তু এখন শুধু ইলেকশনে ভোটসংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এ-যুগে সহধর্মিনীকে নিয়ে বেশি রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তার খাওয়ার জন্য আছে রেস্তোরাঁ, শোয়ার জন্য আছে হোটেল, রোগে পরিচর্যার জন্য আছে হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিল, বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেনস হোমের উদ্ভব হয়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশিটা বান্ধবী। সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়- সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যত ছিল ভরণ-পোষণ ও রক্ষাণাবেক্ষণের। কিন্তু এ যুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়। দরকার হলে তারা অফিসে খেটে টাকা আনতে পারে। তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন কর্তারুপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারে নি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার

ক্রমশ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিত বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগর-নগরীর বি¯তৃতি ঘটেছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন জীবন-ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্য। এদেশের পুরুষের জীবনে এবার আভির্ভূত হয়েছে সখী (গার্লফ্রেন্ড) আর নারীর জীবনে সখা (বয়ফ্রেন্ড)।

অবশ্য লেখক মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেছেন, 'কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয়-স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলিম পরিবারেও নয়। সেখানে বন্ধু বা বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথমে যে অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে, তিনি নিজের স্ত্রী।'

লেখক তার বক্তব্যে ভারতবর্ষে মুসলিম নারীদের মানসিক ও নৈতিকাবস্থার পরিবর্তন, পবিত্র সম্পর্কের বাইরেও অনৈতিক সম্পর্কের অনুপ্রবেশের ইতিহাস অত্যন্ত বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। সেই সাথে একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম পরিবারে অনৈতিক সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। এখানে এধরনের সম্পর্ক অস্বীকৃত।

এটা লেখকের আজ থেকে বেশ কয়েক যুগ আগের বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং একটি খাঁটি মুসলিম পরিবার সম্পর্কে ধারণা হলেও এখন অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন গুটিকয়েক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার ছাড়া নৈতিকতার এই শক্ত দেয়াল চোখে পড়ে না। কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতা, পশ্চিমী ধ্যান-

ধারণা আর পাশ্চাত্যীয় জীবনে অভিষেকের নির্দয় আস্ফালন। তাই ঘটছে হাজারও অপ্রীতিকর, জঘন্য ও নারকীয় ঘটনা। পাশ্চাত্যের সভ্যতার সুফল হিসেবে কখনও নারী সখা গ্রহণ করে স্বামীকে করছে পদধূলিত। আবার স্বামী কখনও গার্লফ্রেন্ড গ্রহণ করে নারীর জীবনকে করছে বিষাক্ত। বিষ আর অবিশ্বাসে ছেয়ে গেছে আমাদের সভ্যতা, আমাদের পবিত্র সম্পর্ক।

দিন যত যায় ঘটনার নির্মমতা তত বাড়ে। একদিন হয়ত স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার খবর পাওয়া গেল তো পরের দিন পাওয়া গেল স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে গলা কেটে হত্যা করার নির্মম দুঃসংবাদ। এভাবেই চলছে আমাদের জীবন, আমাদের সভ্যতা, আমাদের জীবনসংসার!

এবারের ঘটনার নির্মমতা অন্য দশটি ঘটনা ছাড়িয়ে যায় কিনা তাই ভাবছি। মাত্র এক বছর হয় বিয়ে করেছেন যুবকটি। ডাক্তার হওয়ার বিরাট স্বপ্ন নিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এবং সেই স্বপ্ন তার পদযুগলে চুম্বনও করেছিল। সেই চুম্বনের আর্দ্রতা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে মৃত্যু এসে চুমো দিয়ে গেল। সে স্ত্রীর কল্যাণে (?)! স্ত্রী কয়েকজন লোককে ডেকে এনেছিলেন স্বামীর 'মালাকুল মাউত' হিসেবে!

মা বাবার অশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা, মেধা ব্যয়, অর্থবিত্ত খরচ করে একজন ডাক্তারকে সমাজে দাঁড়াতে হয়। এই যুবক তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবনের সব সঞ্চয় ব্যয় করার সংকল্প করেছিলেন সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জন্য। কিন্তু কোনো এক মায়ার

টানে পড়ে গেলেন সেই স্ত্রী। মাত্র এক বছরের ক্ষুদ্র জীবনে স্বামীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের লাভা বিচ্ছুরিত হলো সেই স্ত্রীর অপবিত্র মনে। অপবিত্র বললাম একারণে যে, একজন স্বামী বা স্ত্রী যতই অপরাধ করুক না কেন তারা একারণে কেউ কারো থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে না। দাম্পত্য জীবনে কত সমস্যা আসবে, ঝড়-ঝাপটা আসবে, কখনও মনে হবে এই বুঝি গেল রে! কিন্তু সব কিছু জয় করে সংসার নামের ভেলাটাকে গন্তব্যের ঘাঁটে পৌঁছাতেই হবে। তবেই না নারীর স্ত্রী হিসেবে এবং পুরুষের স্বামী হিসেবে সফলতা। এই সফলতা যে অর্জন করেছেন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন আমি তাকে সম্মান করি। তার প্রতি আমার স্বশ্রদ্ধ সালাম!

যাহোক, এই স্ত্রীটি স্বামীকে জীবনপথের কাঁটা মনে করতে শুরু করলেন। জানি না কতদিন এই 'কাঁটা'র সঙ্গে রাত যাপন করেছেন। ভালোবাসার অভিনয় করেছেন। মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাই অভিনয় দীর্ঘায়িত করতে পছন্দ হচ্ছিল না তার। ফলে নিজের মনের মতো করে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ঘটনাটা সেপ্টেম্বর ২০১১ ইংরেজির। সেই দিনটার সমাপ্তির মধ্য দিয়ে আগমন ঘটল একটি নতুন রাতের, নতুন অধ্যায়ের। অন্যদিনের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে ঘুমাতে গেলেন ডাক্তার ও সদ্য বিবাহিত লোকটি। কিন্তু স্ত্রীর মনে স্বস্তি নেই। এক অজানা কর্মতৎপরতা তাকে ব্যাকুল ও অস্থির করে রেখেছে। স্বামীশয্যায় কেবলই তিনি উসখুশ করছেন। আজকের রাতটা যেন তার কাছে

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা রাতের মতো চল্লিশ বছরের রাতের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে। তবে সেই চল্লিশ বছরের সমান রাত যেমন শেষ হবে এই রাতটাও তেমন শেষ হওয়ার পথে এগিয়ে চলল।
রাত তখন মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। জোসনার আলো ছাপিয়ে ধরনী কেবলই নিকষ কালো হতে শুরু করেছে। রাতের কৃষ্ণতা আর নিস্তব্ধতার মধ্যে এগিয়ে চলল কয়েকটি বনী আদম, কাবিলের যোগ্য উত্তরসুরী। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালো তারা ডাক্তার বাড়ির আঙিনায়। মৃদু করাঘাত করল তারা দরজায়। মধ্য রাতের সামান্যতম এই আওয়াজ ঘুমে বিভোর ও স্ত্রীপরশে শয্যাযাপিত ডাক্তার সাহেবের কানে যাওয়ার কথা না। কিন্তু একজন লোক এমন একটি ক্ষীণ শব্দ শোনার জন্যই রাতের শুরু থেকে অধির অপেক্ষায় কালক্ষেপন করছিলেন। তাই শব্দটা শোনামাত্রই ঝড়ের বেগে এসে দরজা খুলে দিলেন তিনি। আগন্তুকদেরকে ঘরে অভ্যর্থনা জানালেন পরমভক্তিভরে।
এরপর ইশারা করলেন বিছানায় পড়ে থাকা নিরাপরাধ লোকটির দিকে। লোকগুলো খুব তাড়াবোধ করছিল। দেরি করল না তারা। ঘুমের বেঘোরে থাকা লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। কয়েক মিনিটের ঘটনা। অপ্রস্তুত অসহায় লোকটি নিজেকে প্রাণঘাতী দুশমনের বেষ্টনে আবদ্ধ দেখতে পেলেন। অদূরেই দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রী। ঘুমের ঘোরে বুঝতে না পেরে তার কাছে সাহায্য চাইতে উদ্যোত হলেন। কিন্তু মৃত্যুর আতংক যখন তার ঘুমের ঘোর কাটিয়ে দিয়েছে তখন দেখলেন স্ত্রী আজ তার

সহায়ক নয়, হন্তারকদের পথপদর্শক! স্ত্রীর কাছে সাহায্য চাওয়া প্রহসন ভেবে নিবৃত হলেন তিনি। একাই কতক্ষণ লড়াই করলেন। এরপর চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী দুর্বল বলে সবলের, মজলুম বলে জালেমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। খুনিরা বিজয়ীবেশে স্ত্রীর সামনে হাজির হলো। সদ্যসমাপ্ত হত্যা অভিযানের 'বিজয়ী বীরদের (?)-কে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উপায়ে পুরুস্কৃত করল স্ত্রী!

এই প্রথম শুনলাম, স্বামীর হন্তারকদেরকে স্ত্রী ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানালেন ও পুরুস্কৃত করলেন!

ভুলটা আসলে কোথায়?

‘আমরা হুমকি পাওয়ার পর থানার পুলিশের কাছে প্রতিকার চেয়েছি। জিডি করতে গিয়েছি। কিন্তু থানার লোকেরা আমাদেরকে বলেছে জসিমের সাথে আপোস করতে। দলীয় লোক বলে তারা জিডি নেয়নি এবং আমার বোনকে রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করে নি।’

কথাগুলো বোনহারা এক নারীর। যার শোকে এখনও ক্ষত থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে নারীটির। মুক্তবাসের বিষাক্ত ছোবলে জীবন আর আপনজন হারানোর কষ্টের ভয়াবহতা কত গভীর তা আজ খুব তীব্র ভাবে অনুভব করছে আগৈলঝরার একটি পরিবার। তাদের স্বপ্নের বীজ অংকুরিত হতে না হতেই দানবীয় চতুষ্পদ জন্তু তা গিলে ফেলেছে। আর গোটা পরিবার কষ্টের দহন কমাতে মরিয়া হয়ে বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করছে। ঘটনাটি বড় মর্মান্তিক :

একজন বিবাহিত নারী। ঘর আছে, স্বামী আছে। এমনকি সংসারের স্থায়ীত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ গর্ভে দাম্পত্যের ঐশ্বর্য্যও আগমন করেছে। এমন একজন নারীকে প্রেম প্রস্তাব করা এবং তাতে প্রত্যাখ্যাত হলে পৃথিবীর কোনো নিষ্ঠুরতম সংজ্ঞা ও মনুষ্যত্বহীনতায়ও ক্ষোভ বা অপমানিত হওয়ার বিধান আছে কিনা তা আমার জানা নাই। কিন্তু শত না জানার মধ্যেই ঘটছে হাজারও

ঘটনা। যা বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস করতে মন মানে না- এমন সব ঘটনাই আজ আমাদের সমাজের নিত্য চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগৈলঝাড়া উপজেলার পূর্ব সুজনকাঠি গ্রামের বামন উদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শারমিন জাহানা সুমু (২৪)। এক বছর আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন উপজেলার মাগুরা গ্রামের সোহেল তালুকদারের সাথে। স্বামী সোহেল তালুকদার সেনাবাহিনীর সিভিল বিভাগে চাকরি করেন। থাকেন চট্রগ্রামে। শিক্ষিকা সুমু স্বামীর বাড়ি অত্যন্ত প্রত্যাঞ্চল হওয়ায় স্বামীর কাছে অনুমতি নিয়ে পাশের গ্রাম গৈলায় বাবার বাড়িতে থেকে শিক্ষকতা করতেন।

পূর্ব সুজনকাঠি গ্রামের আবুল হোসেন গোমস্তা (৩২) তাকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। সে সুমুকে একাধিকবার প্রেম প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সুমু তাতে সাড়া দেননি। ফলে মারাত্মক ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে গোমস্তা। সে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা শুরু করে তাকে। সুমু তার ছোট বোনকে নিয়ে বাসায় রাত যাপন করতেন। ছোট বোন জানান, মাঝেমধ্যেই রাতদুপুরে গোমস্তা এসে বাহির থেকে দরজায় আঘাত করত। কখনও বা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে যেত। আমরা তখন মারাত্মক ভীতসন্তস্ত্র হতাম। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে থানায় জিডি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু থানার কর্তব্যরত ব্যক্তিরা গোমস্তা দলীয় লোক হওয়ায় জিডি নেননি বরং তারা আমাদেরকে আপোস করার পরামর্শ দেন।

আমাদের দেশে মানবতা বস্তুটা বেশি আহত হয় দলীয় বিবেচনায়। যত বড় অপরাধীই হোক না কেন লোকটা যদি দলীয় হয় ব্যস, আর কথা নেই। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে নির্লজ্জভাবে তাকে মাফ করে দিতে হবে- ইত্যকার অনৈতিক চিন্তা আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থাকে অনেকটাই কলঙ্কিত করেছে। সুতরাং এমনি এক বে-ইনসাফের সমাজে বাস করে, ভণ্ড, প্রতারকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সমাজে চললে নিজেকে কতটুকু গুটিয়ে চলা দরকার সেটার ফয়সালা অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজেই করে দেখা দরকার।
যাহোক, গোমস্তা বেচারা দলীয় লোক। দলের জন্য এত খাটাখাটি করে যদি কোনো নারীকে ধর্ষণ কিংবা খুনটা করে মাফটাই পাওয়া না যায় তবে দল করে লাভ কী? গোমস্তা লোকটা তো আর একা নয়। সে আর আগেও নিজের পূর্বসূরীকে দেখেছে ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপন করতে এবং বিনিময়ে দলীয় লোক হওয়ায় পুরস্কৃতও হতে দেখেছে। সে হিসেবে এ কোন্ ছাই! তাই মজলুমের পক্ষ থেকে প্রতিকারের সংবাদ পেয়ে আরো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে সে। তার প্রেমদহন সর্বগ্রাসী দাবানলের রূপ ধারণ করে। এই দাবানলে জ্বলে ছারখার হয়ে যায় মনুষ্যত্বহীন সমাজের নৈতিকার ক্ষীণ ও দুর্বল বৃক্ষ। সে ওঁৎ পেতে থাকে সুযোগের সন্ধানে। ক্লাশ শেষ করে সুমু যে পথে নিয়মিত বাড়ি ফিরতেন সে পথে হিংস্রতার মধ্যমনি গোমস্তা মৃত্যুপয়গাম নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ১২ অক্টোবর বুধবার সুমু বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে কালুরপাড়া

এলাকায় পৌঁছলে গোমস্তা উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে তার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ ও অন্যান্য জাতীয় দৈনিক ১৩/১০/১১ইং]

খুনি, জালেম গোমস্তাকে এলাকার লোকজন ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে। কিন্তু যে পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর কোনো ব্যবস্থা নিল না সেই পুলিশের কাছে খুনিকে আটক থাকতে দেখে কি সুমুর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে? আমাদের দেশের বিচার ও ইনসাফের এমন রুগ্নদশা যে, একে প্রহসন বললেও কম হয়। শুধু দলীয় বিবেচনায় বহু নিষ্ঠুর, নরপশু বর্বরতার একশেষ করেও পার পেয়ে যায়। তাদের দ্বারা বারবার লজ্ঘিত হয় মানবতা। ধ্বংস হয় মনুষ্যত্ব। সমাজে ছড়িয়ে পড়ে পাপের দুর্গন্ধ।

আর আমার বড় আপসোস হয় সুমুর ছোটবোনের কথায়। তিনি বারবার বলেছেন, আমরা পুলিশের কাছে প্রতিকার চাইতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেনি। আসলে কী পুলিশ প্রতিকার করতে পারে? হাজারও সম্ভ্রমখেকোর ভয়ানক থাবা থেকে দেশের নারীসমাজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পুলিশ কি সক্ষমতা রাখে? তারুণ্যের লোমে লোমে যেখানে পাপ ও লালসার অগ্নি বাসা বেঁধেছে সেখানে গুটিকয়েক পুলিশ যদি আন্তরিকও হয় তবু তাদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়।

কারণ বাস্তবতা, অতীত ইতিহাস এবং কুরআন-হাদীসের শিক্ষা আমাদেরকে একথা বলতে বাধ্য করছে। ইসলামের সোনালী যুগে

যেখানে বেইনসাফীর কোনো প্রশ্নই ছিল না, খলীফা ওমরের মতো ইতিহাসখ্যাত মহান শাসকের হাতে ইনসাফের ছড়ি, অপরাধী অপরাধ করে পার পাওয়ার ঘুণাক্ষরেও যখন কল্পনা করতে পারত না তখনও কিন্তু পর্দার বিধান বহাল ছিল এবং তখনও এই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তোমরা সম্ভ্রমের প্রশ্নে সমস্যার সম্মুখীন হলে পুলিশ কিংবা প্রশাসনের আশ্রয় নাও। বরং পর্দার সার্বজনীন কল্যাণ ও সুফলতার কথা বলে তখনকার নারীদেরকে এর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে আবদ্ধ হতে বলা হয়েছে।

সুতরাং আমরা কোথায় ভুল করছি এবং কী করা দরকার সেটা মনে হয় নতুন করে ভেবে দেখা দরকার এবং সে অনুযায়ী আমাদেরকে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

সেই চঞ্চল মেয়েটি

শিমু নামের মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দর ও চঞ্চল। বয়স মাত্র ১৪। এই বয়সী এক স্কুলের ছাত্রীর চঞ্চল হওয়াই বেশি মানায়। বয়সের বালখিল্যতায় দুষ্টামি করবে, দড়ি লাফ খেলবে, পাড়ার মেয়েদের সাথে হইহুল্লোড় করে সময় কাটাবে আর ভবিষ্যতের দিকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে থাকবে ফড়িংয়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে!

কিন্তু আমরা কল্পনার যে রং মাখি তার সাথে বাস্তবতার এখন আর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সবখানে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আর অবিশ্বাস্য ঘটনা কল্পনার চিত্রকে কলঙ্কিত করে যায়। তাই কিশোর শিমুর বেলায় আমরা যে কল্পনা করলাম বাস্তবে তার মিল পাওয়া গেল না। মুক্তবাসের একটা বিষাক্ত ছোবল তার জীবনকে শুধু কেড়েই নিল না, বরং কলঙ্কিতও করে দিয়ে গেল পুরোটা।

ঘটনায় ফিরে আসি। কুমিল্লার তিতাস উপজেলার বাতাকান্দি সরকার সাহেব আলী আবুল হোসেন মেমোরিয়াল উচচবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সায়মা জাহান শিমু। তিতাস উপজেলার দক্ষিণ আকালিয়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে মোবারক হোসেনের সাথে তার দীর্ঘদিন ধরে মন দেয়া-নেয়া চলছিল। কী আশ্চর্য ব্যাপার! মাত্র চৌদ্দ বছরের একটি কিশোরী, তার আবার দীর্ঘদিন ধরে মন দেয়া-নেয়া? তার এই ঘটনা দ্বারা কি একথা প্রতীয়মান হয় না যে, আজকালের মেয়েরা নৈতিক শিক্ষার আগেই প্রেম-ভালোবাসার

শিক্ষা রপ্ত করছে? যে জিনিস বহু বছর পর বুঝে আসার কথা তা তারা ক্ষুদ্রতম সময়ে আত্মস্থ করছে?
সে যাকগে, মোবারক একজন পরিণত বয়সের যুবক। এসব উন্মাদ যুবকদের মনের অভিধানে ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষার চেয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ বেশি গুরুত্ব বহন করে। কেবল ব্যবসায়ী এই মোবারকের সাথে যখন প্রথম দেখা হয় শিমুর তখনই তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলার মরণনেশায় লিপ্ত হয় সে। অল্পবয়সী অবুঝ একটা মেয়েকে বাগে পেতে তেমন সমস্যা হয় না মোবারকের। সে খুব সহজেই ঘায়েল করে শিমুর প্রতিরোধ শক্তিকে। তাই সে সহজেই ধরা দেয় মোবারকের ছলনার জালে। উচ্ছল একটি মেয়ের কাছে প্রেম সত্যিই খেলনার বস্তু।
সেই খেলনার বস্তুর সাহায্যে মোবারক তার স্বার্থসিদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকে অবিরাম গতিতে। শিমুকে নতুন নতুন কল্পনার জালে আবদ্ধ করে সে নির্ভিক পথে এগিয়ে চলে জোর কদমে। কিন্তু বিষয়টা ধরা পড়ে শিমুর মা-বাবার কাছে। তারা মেয়ের এমন সর্বনাশা খেলাকে মেনে নিতে পারেন না। হয়ত বয়স্ক এবং শিমুর জন্য বেমানান মোবারককে ডেকে তারা তাদের অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। মেয়েকেও শাসন করেন তারা এমন নির্বুদ্ধিতা ও খামখেয়ালীর জন্য।
জন্মদাতা মা-বাবার জন্য এটা কিন্তু মোটেই অনাধিকারের কোনো বিষয় নয়। যারা এত কষ্ট করে সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন, হাড়ভাঙা খাটুনির পয়সা দিয়ে লালন-পালন করেছেন তারা সন্তানের

বিপথগামীতায় বাধ সাধবেন না তো চুপ করে সন্তানের জীবনপাড় ভাঙার দৃশ্য অবলোকন করবেন? এতো নৈতিকার প্রশ্ন আর মানবতার যুক্তি। কিন্তু মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত, মুক্তবাসের ছোবলে নৈতিকতা যেখানে বিষাক্রান্ত সেখানে নৈতিকা ও যুক্তির প্রশ্ন ধোপে টিকবে কেন?

তাই মোবারকের বেলায়ও নৈতিকতার প্রশ্ন ধোপে টেকেনি। শিমুর বাবা মা যখন তাকে শাসন করেছেন এবং নিজের মেয়েকেও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন তখন সে মারাত্মক ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেছে। হয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ। তাই মেয়ের বাবা-মার মুখের ওপর বলে দিয়েছে, বাবা মা বাধা দেয়ার কে? সে তাকে উঠিয়ে নিয়ে বিয়ে করবে! কিন্তু মোবারক যা করতে চেয়েছে করেছে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। সে ভালোবাসার মানুষটির সম্ভ্রম ধ্বংস করেছে, তার জীবন কেড়ে নিয়েছে আর মা বাবার বুক খালি করেছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর শিমু প্রতিদিনের মতো কোচিংয়ে যাওয়ার সময় মোবারক কয়েকজন বখাটে বন্ধুকে নিয়ে শিমুকে বিয়ের কথা বলে উঠিয়ে নিয়ে যায়। শিমু তাতে বাধ সেধেছে কিনা তা বলতে পারি না। তবে হয়ত মনের অজান্তেই শিহরিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। প্রিয় মানুষের সাথে কোথাও যাওয়া, এই আর কী! এরূপ ভেবেছে। কিন্তু মনের মানুষ চেনা আজ বড় দায়। এখন আর মনের ভেতর মন বাস করে না, হিংস্রতা আর বর্বরতা বাস করে সেখানে। তাই সরল মনে তুমি যাকে মনের মানুষ ভাববে,

নিষ্ঠুরভাবে সে তোমার সবকিছু কেড়ে নেবে। আমাদের দেশের সাংস্কৃতি আর দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসা নৈতিকতার এই চিত্রই আমরা দেখে আসছি।

যাহোক, বন্ধুদের সহাযোগিতায় মোবারক শিমুকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং ভালোবাসার সাথে প্রতারণা করে তার সম্ভ্রম কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, এরপর সে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রিয় মানুষকে যখমী করে হাসপাতালে রেখে পালিয়ে যায় কোনো অজানার পথে। হাসপাতাল থেকে শিমুর মায়ের কাছে একটি নির্মম দুঃসংবাদবাহক ফোন আসে। ফোনে তাকে জানানো হয় তার মেয়ের লাশ থানা গৌরীপুর হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে আছে। হাসপাতালে গিয়ে সত্যিই মেয়ের লাশ দেখতে পান শিমুর মা সাহিদা বেগম। রাতে খুনী মোবারকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলার রূপ পাল্টে দেয়। খুনিকে বাঁচানোর জন্য তারা অপমৃত্যুর মামলা নেয়। [আমার দেশ ১৩/১০/২০১১ ইং]

মানবতার রুদ্ধদুয়ার!

মানুষ সময়ের আগেই অনেক কিছু করে ফেলা পছন্দ করে। এটা তাদের প্রকৃতিগত স্বভাব। প্রকৃতির এই হেয়ালীপনায় কত কৃতিত্ব আর কত অপ্রীতিকর ঘটনাই যে ঘটে তার ইয়াত্তা করা কঠিন। প্রেম-ভালোবাসা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। যে মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে পদার্পণ করেছে সে এসব গুণ নিয়েই পদার্পণ করেছে। কিন্তু এসব গুণের বহিঃপ্রকাশের একটা সময় আছে। একটা শিশু জন্মগ্রহণ করেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যেমন দৌঁড়াতে পারে না তেমনিভাবে একজন নারী কিংবা পুরুষ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আল্লাহপ্রদত্ত এই গুণাবলীর প্রকাশ ঘটাতে পারে না। আমরা বাংলায় অকালপক্ক বলে একটা কথা বলি। অর্থাৎ যে বস্তু যখন করা বা হওয়া দরকার তখন না হয়ে তার আগেই হলে বিদ্রূপ করে একথাটা বলা হয়।

বোঝা গেল বয়সের আগে বা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোনো বিষয়ে আগ বাড়াতে নেই। তাতে সেটা সুন্দর হয় না বরং অযোগ্য ও খারাপ হয়। সুতরাং বাবা মা অনেক কষ্ট করে যখন সন্তান লালন-পালন করেন তখন এই চিন্তাও তাদের মধ্যে থাকে যে, সন্তানকে তারা এমন ঘরে তুলে দেবেন যে ঘর তার জন্য সুখের চাদর হবে। এমন পরিবেশে মেয়ে বিয়ে দেবেন বা ছেলেকে বিয়ে করাবেন যে পরিবেশ থেকে শান্তির সুবাতাস ছুটে আসে। এমন কোন দুর্মুখ সন্তান আছে যারা মা-বাবার এই চিন্তাকে অস্বীকার

করে তাদের অপমান করে? পিতৃ ও মাতৃদৃষ্টিতে দেখা ভবিষ্যত চিন্তাকে অবমূল্যায়ন করে?

হ্যাঁ, যারা বিয়ের আগেই নিজেদের সুখনীড় রচনা করতে নিজ পথে হাঁটে, পিতা-মাতার চাওয়ার অবমূল্যায়ন করে নিজেই রচনা করতে চায় ভবিষ্যত তারাই এই শ্রেণীর মানুষ। ব্যর্থতা তাদের নিত্যসঙ্গী, লাঞ্ছনা তাদের নিঃশ্বাসের মতো আবশ্যক হয়ে যায়। প্রেমের আবগাহনে বিভোর থাকা কল্পিত স্বপ্নের সাথে যখন বাস্তবতার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না তখনই আত্মপোলব্ধি জেগে ওঠে। কিন্তু তখন তাতে লাভ কী? সমাজের আজ যে অবস্থা, তাতে অতি বিদগ্ধ আর পোড়খাওয়া ব্যক্তি ছাড়া কারো আসল চেহারা বের করে আনা সম্ভব নয়। আর বয়সন্ধিক্ষণের উত্তেজনায় তড়পাতে থাকা কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীদের তো কথাই নেই।

তুমি কাউকে ফুলের চেহারায় দেখবে তো সাহস করে প্রথম পাতাটা উল্টাও। বিস্ফারিত হওনা যেন, সেখানে বিষের কালি থাকার সম্ভাবনা আছে! হয়ত কথার ছাঁচে তোমার চিন্তার জগত বদলে দেবে, তোমার সুখ নিশ্চিত করার গল্প বলার সময় পৃথিবীর সব কালি দিয়ে তোমার সুখকাহিনী রচনা করবে, চেরাগটা এনে দিতে বললে চাঁদটাই এনে দেয়ার কথা বলবে, ছোট্ট একটা সুখনীড়ের কথা বললে প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখাবে, গল্পোচ্ছলে বিস্কুট খাওয়াতে বললে হয়ত পিজা খাওয়াবে। এভাবে তোমার চোখের সামনে তোমার প্রত্যাশার চেয়ে সবকিছু বেশি দেখিয়ে

তোমার মন কিনে নেবে। পরে যখন তুমি তার হাতে ন্যস্ত হবে তখন ভালোবাসার এসব সওদাগররা সুদাসলে উঠিয়ে নেবে। সেখানে তুমি ভালোবাসার বদলে দেখবে মুনাফাখোরী ব্যবসায়ীর লালসার চাহনী।

তোমার যৌবনের গুরুত্ব শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে নিক্ষেপ করতে চাইবে কোনো পরিত্যক্ত ডাস্টবিনে। তখন তুমি তাকে ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বাগে আনতে যাবে? ভুল। সেটা অতীত। আর মুক্তবাসের অনৈতিক পথে অগ্রসরমান ভালোবাসার এমন মানুষেরা অতীত স্মৃতিচারণকে ভয় পায়, লজ্জা করে। তাই সুখচিন্তার অগ্রিম চেষ্টা না করে কষ্ট হলেও জড়োসর হয়ে ঘরেই থাকো, কিছুদিনের কষ্ট তোমাকে স্থায়ী সুখ পাইয়ে দিতে সাহায্য করবে। আবেগ প্রশ্রয় দিয়ো না, বিশ্বাসের পথে চলো।

আবেগী ও অবিশ্বাসী এমন মানুষের অনেক ঘটনা আমাদের চোখের সামনে। আজ তারা দেউলিয়া, সব হারিয়ে তারা মা-বাবাকেও হারিয়েছে। কত ঘটনা বলব তোমায়? তোমার শ্রবণশক্তির ধৈর্য্যচ্যুতির ব্যাপারে যে আমার সংশয় হয়! তবু শোনো :

উম্মে হাবিবা বাপ্পি। আপনজনের শোকে কে না কাতর হয়? মা বাবা, ভাই-বোনের সাথে তো মানুষের নাড়ির সম্পর্ক। এমন কেউ যদি মারা যায় তবে কেউ কি সুস্থির থাকতে পারে? বিশেষ করে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে যদি আপনজনের কেউ মারা যায়? মানবতার কোনো বিচারে কি তাদেরকে তখন ঠেকিয়ে রাখা যায়?

কিন্তু পৃথিবীর মানবিকতার সব সংজ্ঞা অতিক্রম করে গেল উম্মে হাবিবার জীবনে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ভাইটিকে দেখতে গিয়ে হারালেন শ্বশুরবাড়ি প্রবেশের দরজার গেট পাশ। তিন বছরের একমাত্র মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এখন কেবলই উদাস নয়নে বিচিত্র এই ধরনীর দিকে তাকিয়ে কার বিরুদ্ধে যেন উষ্মা প্রকাশ করেন। হয়ত বা নিজের বিরুদ্ধেই।

নিজ কল্পনাশক্তি ব্যয় করে যে সুখনীড় রচনা করেছিলেন বিয়ের আগে, এটাই কি সেটার প্রতিচ্ছবি? বঞ্চিতা হাবিবার মনে বারবার দোলা দেয় এসব অবাঞ্ছিত প্রশ্ন। তিনি স্মৃতি হাতড়িয়ে আগে চলে যান, স্মৃতির সেই সবুজ আঙিনায় দেখতে পান স্বামী ফিরোজকে। মনে পড়ে আগের সেই কথাগুলো। সবুজের সে সময়কার কথাগুলো আজ সবচেয়ে বড় প্রহসন ও ছলনা বলে মনে হয় উম্মে হাবিবার কাছে। যে লোকটা তাকে এত ভালোবেসেছিল, বিয়ের পর ভালোবাসায় সিক্ত করতে চেয়েছিল যে, আজ সেই তাকে এভাবে বঞ্চিত করল? বঞ্চিত করতে পারল?

সে তো এই ফিরোজের ভরসাতেই ২০০৪ইং সালের ২০ মার্চ নিজের ঘরের দরজায় নিজে তালা দিয়ে পথে নেমেছিল। ফিরোজের ভালোবাসাকে মূল্য দিতে গিয়ে মা-বাবা ও গোটা পরিবারকে অসুখী করে নিজের মতে তাকে বিয়ে করেছিল। তাকে ভেবেছিল পরম আশ্রয়, যে শত ঝড়ঝাঁপটায় তাকে আগলে রাখবে, আশ্রয় দেবে মমতার কোলে। কিন্তু সেই লোকটাই কি করে পারল তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে?

স্মৃতির সাথে যত ঘনিষ্ঠতা হয় উম্মে হাবিবার কষ্ট ততই গভীর হয়। আরে এতো সেই ফিরোজ, সংসারের সবাইকে ছেড়ে বড় আশা নিয়ে যাকে বিয়ে করার জন্য ঘর ছেড়েছিল সে; আর মাত্র তিনদিনের মাথায় এর প্রতিদান দিয়েছিল স্বামী ফিরোজ। ফিরোজ অনেক কষ্ট করে তিনদিন পর্যন্ত তার আসল চেহারা গোপন করে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ভেতরের পরিচয়টা যখন ফেঁপে উঠে ফেটে যেতে থাকে তখন নিজ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে সে।

মানবজীবনের এ এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। এই তিনদিন আগেও যে মস্তবড় ভালোবাসার লোভ দেখালো সেই লোকটাই হঠাৎ কি হলো যে পুরো পরিবর্তন হয়ে গেল? শুরু হলো অমানুষিক নির্যাতন। উম্মে হাবিবার এসব বিশ্বাসই হতে চায় না। সে বারবার তাকায় ফিরোজের দিকে। এই কি সেই লোক, আড়ালে-আবডালে যাকে নিয়ে সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনত? ভবিষ্যত কি তবে মানুষের সাথে এভাবেই ছলনা আর প্রতারণা করে?

বিবাহপূর্ব জীবনে উম্মে হাবিবা অনেক ভালোবাসা পেলেও বিয়ের পর তিনি স্বামীর কাছ থেকে কোনো ভালোবাসা পাননি। বরং পেয়েছেন বঞ্চনা, হয়েছেন ক্ষতবিক্ষত। আজ মনে ভালোবাসার স্মৃতির বদলে সারা গায়ে কেবলই দগদগে ক্ষত। ভালোবাসার এই লোকটিই তাকে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বেদম প্রহার করত। শুধু ২০০৭ইং সালেই উম্মে হাবিবাকে কমপক্ষে দশবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্বামীর আঘাতে জর্জরিত হওয়ার পর! মৃত্যুর সাথে কাইজা করে ঘরে ফিরেছেন স্বামীর সেই ধূসর

ভালোবাসার স্মৃতিকে স্মরণ করে। কিন্তু আবার সেই স্মৃতি বাস্তবতার পাখায় ভর করে উম্মে হাবিবার জীবনডালে ডানা মেলেনি। তাই আবার হতে হয়েছে নির্যাতিতা।

পাষণ্ড স্বামী তথা এককালের ভালোবাসার মানুষটি উম্মে হাবিবার দাঁতগুলোর ওপরেও চালিয়েছে নির্যাতন। ভালোবাসার শক্তি প্রয়োগ করে সে স্ত্রীর দাঁতগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সীমাহীন এই নির্যাতনের মধ্যে এগিয়ে চলে উম্মে হাবিবার অবাঞ্ছিত ভালোবাসার অনাকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবন। এগিয়ে চলে প্রজন্ম বিস্তারের প্রকৃতির খেলা। অন্তঃসত্ত্বা হন উম্মে হাবিবা। তার আশার পালকে পর গজিয়ে ওঠে যেন। এই বুঝি ভালোবাসার মানুষ স্বামীটি তাকে সন্তানের উসিলায় ভালোবাসবেন, আগের মতো আদর করবেন আর নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই দেবেন।

তার ভাবাটা যেন মরীচিকাই হয়ে থাকে। স্বামীর মন গলে না। দুনিয়া আলো করে একটা কন্যাসন্তান আগমন করলেও ফিরোজের মনে ফিরে আসে না আগের সেই ভালোবাসার উত্তাপ। তাই নিয়মিতই চলতে থাকে নির্যাতন। এমনকি তিন বছরের অবুঝ সন্তান ফারজানার সামনেই চলত অকথ্য নির্যাতন। এভাবে চলতে চলতে একসময় চলার গতি থেমে যেতে চায় উম্মে হাবিবার। এক সময় মনে হয় আগের গৃহে ফিরে যাবে, যে গৃহে বাল্যকাল কেটেছে, শৈশব আর কৈশর কেটেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙে তার। সে নিজেই তো সে পথ বন্ধ করে এসেছে! ফিরোজের সাথে যেদিন পথে নেমেছে সেদিনই তো

বাড়ি থেকে বলে দেয়া হয়েছে যে, আর কোনোদিন তাকে এই বাড়িতে আশ্রয় দেয়া হবে না। তাহলে সে আজ কোথায় আশ্রয় নেবে? ভালোবাসার মর্যাদা দিতে গিয়ে ভালোবাসার মানুষের আশ্বাসে যিনি সব ছেড়ে পথে নেমেছেন সেই আশ্বাস আজ ধূসর স্মৃতি, মলিন ইতিহাস! তাই ঘরে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিতে হয় উম্মে হাবিবাকে।

এরই মধ্যে গত ৭ই সেপ্টেম্বর উম্মে হাবিবার ছোট ভাই হাফিয অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঢাকায় মারা যায়। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ উম্মে হাবিবার দুঃখ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তিনি ভাইকে একনজর দেখার জন্য বাড়িতে আসার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সেই ভালোবাসার মানুষ স্বামী তাতে প্রবল আপত্তি করে। তার সাফ কথা, কোনো কারণেই সে বাবার বাড়ি যেতে পারবে না। কিন্তু শোক আর আপন ভাইয়ের দগ্ধমুখটি শেষবারের মতো দেখার তীব্র বাসনা উম্মে হাবিবাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তিনি এই প্রথম স্বামীর কথা অমান্য করেন। দেখতে যান ভাইয়ের লাশটি।

প্রথম যখন বাবার বাড়ি থেকে ফিরোজের সাথে পথে নেমেছিলেন সেদিনই বাবার বাড়ির দরজা তার জন্য চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আর আজ যখন ফিরোজের বাড়ি থেকে মৃত ভাইকে দেখার জন্য বাবার বাড়ি আসলেন তখন ফিরোজের বাড়ির দরজা তার জন্য চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হলো। এই হচ্ছে মুক্তবাসের খেলা, প্রেমের প্রকৃতি! ভাইকে দেখে স্বামীর বাড়িতে ফিরে গেলে সে বাড়ির দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেয় হয় উম্মে হাবিবার জন্য।

স্বামী ফিরোজ তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে উম্মে হাবিবার জন্য এই বাড়ির দরজা চিরতরে বন্ধ! [তথ্যসূত্র : আমার দেশ ১৩/১০/২০১১ইং]

তিন বছরের একমাত্র কন্যাসন্তান ফারজানাকে নিয়ে ভাগ্যের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গিয়ে ঠেকে উম্মে হাবিবার জীবন সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে সেটা তো ভবিষ্যতের কথা। উম্মে হাবিবার অতীত কিন্তু মোটেই সুখকর নয়। আর সুখকর নয় মুক্তবাস আর বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন।

মুক্তবাসের দেনা শোধ

বিশ্বের সব জায়গার অবস্থা একই। দর্শনীয় স্থানগুলো দখল করে রাখবে বিলবোর্ড এবং অবশ্যই তা নারীর শোভায় সুশোভিত। অশ্লীল ও অর্ধউলঙ্গ নারীর ছবিসম্বলিত এসব বিলবোর্ড টাঙিয়েই পুঁজিপতিরা নিজেদের পকেট ভারি করে। মাঝখান থেকে মডেল নারীরা পায় সামান্য কিছু পয়সা আর দর্শকরা পায় চোখ কপলানোর সুযোগ! রাজধানী ঢাকার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। সবকিছুতে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার যে চর্চা শুরু হয়েছে তার প্রধান চিত্র ফুঠে ওঠে এসব বিলবোর্ডের গায়ে। কোনো কোনো কোম্পানি এমন সব বিলবোর্ড দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যা দেখে মনে হয় আমরা বোধ হয় পাশ্চাত্যের কোনো উলঙ্গদেশের বাসিন্দা!

নারীদেরকে এভাবে নগ্নদেহে প্রকাশ করার হীনকর্মে লিপ্ত হয় সাধারণত ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্টমিডিয়া। সুন্দরী কোনো মডেলের একটা মাত্র নগ্ন ছবির পোজ বদলে দিতে পারে তাদের জীবন। হু হু করে বাড়বে গ্রাহক। কাটতি হবে পত্রিকার। আর যে মিডিয়া তা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে দর্শক-শ্রোতা। প্রচুর বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। স্ফীত হবে ব্যাংকের একাউন্ট। এসব স্বার্থচিন্তা থেকেই তারা মডেলদের পেছনে লাগে। তাদেরকে উত্যক্ত করে এবং প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত উলঙ্গ হওয়ার ছাড়পত্রই আদায় করে ছাড়ে।

আর যারা এভাবে বিলিয়ে দেয় নিজেদেরকে, কয়েক মুঠো পয়সার কাছে কাবু হয়ে নিজেকে উপস্থাপন করে বিকৃতি ভঙ্গিতে তারা কি সত্যিই সুখী? বিলবোর্ডে টাঙানো হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মতোই কি তাদের আভ্যন্তরীণ জীবন, ভেতরের অবস্থা? নাকি বিলবোর্ডের গায়ে টাঙানো পণ্যের মতোই ঠিকানাহীন ছন্নছাড়া তাদের জীবন?

বর্তমানে মডেলিংয়ের রকমফেরের অভাব নেই। র‍্যাম্প মডেলিং এগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে খুব বেশিদিন হয়নি এর আগমন ঘটেছে। অতিমাত্রার আধুনিকতা বলে এদেশে প্রবেশ করতে সময় নিয়েছে এটি। এখনও তা সংকুচিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু দিন দিন বাড়ছে এর পরিধি। কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু বাজারে নিয়ে আসলেই গ্রাহকদের কাছে যাওয়ার আগে ছুটে যাচ্ছে মডেলদের কাছে। বিবসনা একজন মডেলের বস্ত্র কোম্পানীর মডেল হওয়ার যৌক্তিকতা কতখানি সে কথা কিন্তু আমরা কখনই ভাবি না। আর এই না ভাবার সুযোগে স্বার্থন্বেষী মহল তাদের স্বার্থ পুরে নিচ্ছে যাচ্ছে তাই ভাবে।

তাহিয়া তাবাস্সুম আদৃতা। শোবিজ জগতের পরিচিত মুখ। টানা দুই বছর তিনি র‍্যাম্প মডেলিংয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। বহু কোম্পানিকে করেছেন পরিপুষ্ট। কিন্তু যখন চলে গেলেন তখন একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তার প্রস্থানপথে কেউ আলোর মশাল নিয়ে আসেনি। আঁধার রাতের চলার উপকরণ সঙ্গে দেয়নি। একেবারে নিষ্ঠুর নির্মমভাবে তাকে চলে যেতে হয়েছে। যে মডেলিংয়ে নিজেকে জড়িয়েছিলেন এবং যারা তার দ্বারা

ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছে তারাই তার চলে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ বলে কথা উঠেছে।
০১/১১/২০১১ইং রোজ সোমবার রাতে মুহাম্মাদপুরের ১২/৬ তাজমহল রোডের একটি বাসার চারতলার দরজার সামনে অজ্ঞাত হিসেবে আদৃতার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনদিন তিনি অজ্ঞাত হিসেবেই পড়েছিলেন আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের লাশের হিমাগারে। র‍্যাম্পে যিনি এত মানুষের সামনে উপস্থাপিত হতেন, যার পারফর্ম দেখে দর্শকরা হাতে তালি দিতে তিনি আজ বেওয়ারিশ লাশ! এই বুঝি নিষ্ঠুর দুনিয়ার খেলা?
নিষ্ঠুর দুনিয়ার সাথে আরও অনেকেই নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছিল আদৃতাকে নিয়ে। রেহান নামের যে বন্ধুর সাথে তিনি ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনিও তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তার বন্ধুদের ভাষায়- আরেক মডেল রেহানের সাথে আদৃতার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মাস ছয়েক আগে তারা বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে নতুন থাকতেই পুরান বিষয় এসে হাজির। ঝগড়া। নতুন বধূর সাথে প্রায় ঝগড়া করতেন স্বামী রেহান। আদৃতা ছিলেন সিসায় আসক্ত। এছাড়া জেদি থাকার কারণে বিভিন্ন ফটোশুটে গিয়ে প্রায়ই আদৃতা-রেহান ঝগড়া এমনকি মারামারি পর্যন্ত করতেন।
এভাবে ভালোবাসা ও ভালোবাসার মানুষের নিষ্ঠুর প্রহসনের শিকার হন আদৃতা। যে কাজকে তিনি পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে পেশাগত সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেন

সেই পেশা ও পেশার মানুষেরাও তার সাথে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে। তার আরেক বন্ধু জানান, আদৃতার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। কোনো ভিজ্যুয়াল বিজ্ঞাপনে মডেলিংয়ের অফার পেলেই তিনি দৌঁড়ে যেতেন। হয়ত নিষ্ঠুর খেলোয়াড়েরা এটাকেই সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যে বাসার ছাদে তার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় সে বাসাতেই রয়েছে মডেলিং ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা ‘জেনেসিস ভিউ’-এর কার্যালয়। আদৃতা এই সংস্থার হয়ে কাজও করেছেন এক সময়। বন্ধুদের ধারণা, সেদিন জেনেসিস কর্তৃপক্ষের ডাকেই আদৃতা সেখানে গিয়েছিলেন।

এই বিজ্ঞাপনী সংস্থা শুধু আদৃতার জীবনকেই ধ্বংস করেনি। ধ্বংস করেছে আরও বহু মানুষের জীবন। ধ্বংস করেছে বিত্তশালীদের নৈতিকা। একাধিক র‍্যাম্প মডেলের বক্তব্য, জেনেসিস ভিউ বিজ্ঞাপনী সংস্থা হিসেবে কাজ করলেও তারা বিভিন্ন র‍্যাম্প মডেলকে বিজ্ঞাপনের মডেল বানানোর লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন উচ্চবিত্ত লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য পাঠাত। জেনেসিসের কর্ণধার ফজল হোসেন বরুণ (ছদ্মনাম) নিজে ‘সাপ্লায়ার’ হিসেবে কাজ করেন বলে মডেলিং জগতে প্রচলিত রয়েছে। হয়ত মোতালেবদের চাওয়ার শেষ দেখতে চেয়েছিলেন বলেই জান দিতে হলো আদৃতাকে। কারণ তিনি যে বাসায় খুন হন সেখানে যাওয়ার একমাত্র চাবি ছিল ওই জেনেসিস কর্তৃপক্ষের কাছেই। একারণে ওই বাসার অন্যান্য বাসিন্দারা ছাদে যেতে পারতেন না। ছাদের ওই অংশটুকুও অন্ধকার।

ফলে হত্যা করার পর চব্বিশ ঘণ্টা লাশ ফেলে রাখা হলেও কেউ তা দেখতে পায়নি। পরে জেনেসিস কর্তৃপক্ষই লাশের খবর দিয়েছে পুলিশকে। পুলিশ জেনেসিসের চারজন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞেসায় তারা আদৃতাকে চেনে না বলে জানায়। শুধু কি তাই? যাদের এক সময় সব দিয়েছেন আদৃতা তারাই তাকে পতিতা সাব্যস্ত করে ছেড়েছে। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বরুণ ওই বাসার একজন বাসিন্দাকে জানান, 'লাশটা টোকাই টাইপের কোনো পতিতার হবে!' [তথ্যসূত্র : দৈনিক সকালের খবর ০৫/১১/২০১১ ইং]

মহল্লাবাসীর বিশ্বাস, মোতালেব এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। নতুবা আদৃতাকে চেনার পরও তাকে টোকাই ও পতিতার পরিচয়ে পরিচিত করতে যাবে কেন? আসলে কথা কিন্তু এখানেই। মুক্তবাসের জীবনের দেনা শোধ করতে করতে মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাবে তবু তার দেনা শোধ হবে না। মৃত্যুর পরও দেনা চুকাবার পালা থেকে যাবে। মডেল আদৃতা বোধ হয় সেই পয়গামই দিয়ে গেলেন অনাগত ভবিষ্যতের কাছে।

প্রথম অবস্থায় বরুণকে দায়ী করা হলেও পরে আসল তথ্য বেরিয়ে এসেছে। রেহান নামের যে লোকটির সাথে তার বিয়ে হয়েছিল সে ছিল ছদ্মবেশী হিন্দু যুবক। আদৃতার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয়। একপর্যায়ে দৈহিক সম্পর্ক নিরাপদ করার জন্য বিবাহবন্ধনেরও আশ্রয় নেয়। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে দূরে সরে যেতে উদ্যত

হয় সে। বিশেষ করে তার ক্যারিয়ার হুমকির মুখে পড়ছে দেখে আদৃতাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়াকেই শ্রেয় বলে স্থির করে। এরই ধারাবাহিকতায় সে তাকে হত্যা করে।

আদৃতার পারিবারিক অবস্থার তথ্য নিয়ে জানা যায় তিনি এক প্রকার দরিদ্র পরিবার থেকেই এসেছেন। দারিদ্রের কারণেই হয়ত এসএসসি পাশের পর লেখাপড়া আর এগোয় নি। তাই ক্লাসমেট এক বান্ধবীর হাত ধরে পা রাখেন মডেলিং জগতে। সেখান থেকেই পথচলা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতের দিকে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, মানবজীবনের সাথে দারিদ্রের এই ঘনিষ্ঠতা তো সেই প্রাচীনকাল থেকেই। মানুষ আর দারিদ্র দুটো অকৃত্রিম বন্ধু। ইতিহাসের কোনো পাঠক কি এই তথ্য দিতে পারবে যে, মানবইতিহাসের বিশেষ কোনো কালে দারিদ্রের অস্তিত্ব ছিল না? মানবজাতির পথ চলা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে দারিদ্রেরও পথচলা শুরু হয়েছে। তাই দারিদ্রের সাথে মানুষের লড়াই, সংগ্রামও অনেক প্রাচীন। ইতিহাসের পাতায় কেবল বিখ্যাত লড়াই আর যুদ্ধ-বিগ্রহের কথাই লেখা হয় কিন্তু সে সব লড়াইয়ের বাইরেও যে আরও লড়াইয়ের ময়দান আছে এবং সে সব ময়দানের নিত্য লড়াই হচ্ছে অভাবী মানুষের, সে সব কথা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পায়না।

ফলে প্রকাশ পায় না হাজারও বীরত্বগাঁথা কাহিনী, মানসিক দৃঢ়তার শক্তি বলে অনৈতিকার বিরুদ্ধে জয়ী হবার প্রত্যায়ী কাহিনী। একারণে দুর্বলরা লড়বার সাহস পায় না, প্রেরণা পায়

না। তাই তারা সহজেই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হেরে যায়। পরাজিত সৈনিক হয়ে হারিয়ে যায় ইতিহাসের অতল গহবরে। আদৃতা সেই হারিয়ে যাওয়া পরাজিত সৈনিকদেরই একজন!

আদৃতার এই ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ তার বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল ও জৈবিক উন্মাদনার জীবন। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেও তিনি ইয়াবা সেবন করেছিলেন এবং ইয়াবার সন্ধানে বের হয়েই তিনি এই পরিণতির শিকার হন।

আদৃতার হারিয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ আছে বলে আমার মনে হয়। তার মামা আব্দুল গাফফার জানিয়েছেন, আদৃতা ছিল প্রচণ্ড জেদি ও রাগী। কখনও কখনও রাগ ও জেদ করে সে বান্ধবীদের বাসায় চলে যেত এবং সেখানে রাত কাটাতো। ঘটনার আগের দিন রবিবার যখন সে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং ফেরার নাম করে না, তখন বাসার মানুষেরা ভেবেছিলেন হয়ত কারো সাথে রাগ করেই আদৃতা বের হয়ে গেছে, সময় মতো আবার ফিরে আসবে। কিন্তু দুইদিন গত হওয়ার পর তাদের টনক নড়ে এবং পত্রিকায় লাশ ও লাশের পোশাক-আশাক দেখে তারা আদৃতাকে চিনতে পারেন।

রাগে, ক্ষোভেই মানুষ। মানুষের সত্তার মধ্যে ভালোমন্দ এসব গুণ থাকবেই। কিন্তু তার একটা পরিমাণ থাকা চাই। পরিমাণের অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। রাগ, জেদ বস্তুটা নারীদের জন্য একটু বেশি বেমানান। নারীর প্রকৃতি আর সামাজিক জীবনে যেখানে তার অবস্থান, সাংসারিক জীবনে তাকে যেখান থেকে

দায়িত্ব পালন করতে হয় সেখানে রাগ আর জেদের পরশ থাকা বেশ ঝুঁকিপূর্ণই বটে। একথা নারীকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে অভিভাবকদেরকেও।

একজন পিতা বা মাতা হিসেবে সন্তানকে অবশ্যই ভালোবাসবেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এই ভালোবাসা, স্নেহপ্রীতি শাশ্বত বাস্তবতা। তবে তা যেন কখনও মাত্রা ছেড়ে না যায় কিংবা উৎকট ভাবে তার প্রকাশ না ঘটে। আপনার ভালোবাসা যেন এভাবে প্রকাশ না পায় যে, পৃথিবীর সবকিছুর ঊর্দ্ধে আপনি আপনার সন্তানকে ভালোবাসেন। আপনার ভালোবাসার কাছে বাস্তবতার পাত্তা পায় না। এমন হওয়া কখনই কাম্য নয়। পিতা হিসেবে আপনি কন্যাকে একটু বেশি ভালোবাসেন।

আমাদের দেশে এরূপই দেখা যায়। বাবারা মেয়েকে এবং মায়েরা ছেলেকে বেশি ভালোবাসেন। সেটা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু বাবাদেরকে অনুরোধ করবো, আপনার কন্যাকে কিন্তু একদিন অন্যের ঘরে পাঠাতে হবে। যার ঘরে পাঠাবেন হয়ত সে আপনার মতো মমতা দিয়ে তাকে বরণ করতে নাও পারে। নিজেকে কেবল শাসক ভেবে সংসার চালানোর কর্মী হিসেবেও তাকে ঘরে তুলতে পারে। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি এ উদ্দেশ্যেই আপনার কন্যাকে শাদী করে নিয়ে যায় তখন যেন সে সেই ঝড়ঝাঁপটা ও প্রতিকূল পরিবেশেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, সংসার সমুদ্রে লড়ে যেতে পারে সে রকম দীক্ষা আপনি তাকে আগেই দিয়ে রাখুন।

কেবল ভালোবাসা আর স্নেহপ্রীতি দিয়ে গেলে এবং ভালোবাসার উৎকট মাত্রার প্রকাশ ঘটালে নতুন পরিবেশে গিয়ে আপনার কন্যা ভেঙে পড়তে পারে। এই সংসার আর ওই সংসারের প্রাপ্তির বিশাল ব্যবধান দেখে সমাজ-সংসার সম্পর্কে হতাশ হয়ে জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। তাই কন্যার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এখনই ভালো সিদ্ধান্ত নিন। তাকে যথাযথ দীক্ষা দিন। মানসিকভাবে শক্ত করে গড়ে তুলুন।

রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামের সেই অমূল্য বাণীর কথা স্মরণ করুন, যা তিনি কন্যা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। কন্যা স্বামী উসমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি বলেছিলেন, 'নারীরা স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক তা আমার একদম পছন্দ নয়। যাও, স্বামীর ঘরে চলে যাও।' [আওযাজুস সিয়ার (ইবন ফারিস রহ. প্রণীত)]

আপনিও আপনার কন্যাকে এভাবে দীক্ষা দিন। বিয়ের আগে এবং পরেও। আর সাবধান, কন্যার রাগ ও জেদকে কখনও প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার ভালোবাসার চেয়ে তার জন্য উপকারি হবে জেদকে প্রশ্রয় না দেয়া। যে ভালোবাসা ভবিষ্যত অকল্যাণ ডেকে আনে সে ভালোবাসার যৌক্তিকতা কোথায়?

আদৃতা আমাদেরকে যে সব বিষয়ে চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেল, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে অন্যের উপদেশের পাত্র হলো সে সব উপদেশ মানাই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কারও মৃত্যু

ও চলে যাওয়াটা অপ্রীতিকর হতে পারে। তাই বলে তা থেকে শিক্ষা নিতে তো দোষ নেই!

মানুষ আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যধারী এক অনন্য সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টিতে এমন কিছু উপাদান আছে, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। ভালোবাসাও স্নেহ-প্রীতি বস্তুটা পৃথিবীর সব মাখলূকের মধ্যে থাকলেও মানুষের ভালোবাসা ও স্নেহ-প্রীতির ধরন ও প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন। এই ভিন্নতাই মানুষকে অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। যখন এই ভিন্নতা থাকবে না তখন অন্য প্রাণী থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটাও বহাল থাকবে না।

সেই বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা হচ্ছে ভালোবাসা ও স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে প্রথমত বৈধতা-অবৈধতার বিষয় বিবেচনা করা। দ্বিতীয়ত ভালোবাসার মাত্রা ঠিক রাখা। এর গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন-

« أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا ».

‘তুমি তোমার বন্ধুকে পরিমিত মহব্বত করো। কেননা কখনও সে তোমার দুশমনে পরিণত হতে পারে। আর দুশমনের প্রতিও ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রোধপ্রকাশ করো**। কেননা কোনোদিন**

সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।’ [তিরমিযী : ২১২৮[1]]

আসলে বাণীটির তাৎপর্য এত বেশি যে, এর ওপর আমল করতে পারলে জীবনের অনেক কঠিন বিষয় খুব সহজে সমাধা হয়ে যাবে। এর তাৎপর্য অনুধাবন করি না বলেই আমাদের কারো কারো জীবন নেমে আসে চরম অন্ধকার। যেমন এসেছিল সুমার জীবনে। এই ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করার কারণে।

মানুষের প্রতীক্ষা বস্তুটা পৃথিবীর কঠিনতম ‘পদার্থের’ একটি। বিজ্ঞানীরা কঠিন ওজনবিশিষ্ট এক ধরনের পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করে থাকেন, যার ওজন এত বেশি যে, একদিকে ওই একটুকরো পদার্থ রেখে অন্যদিকে লোহা বা শিসার মতো বিরাট আকারের ধাতুখণ্ড রাখলেও তা শূন্যে ঝুলতে থাকবে। জানি না বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত সেই বস্তুটা কী। কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি, তারা সে সময় প্রতীক্ষা নামের বস্তুটাকে মাপার কথা চিন্তা করেন নি। অন্যথায় তারা এই প্রতীক্ষাকেই পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি বস্তু বলে অভিহিত করতেন।

সে যাকগে, প্রতীক্ষা মানুষকে বেকারার করে। আবার প্রতীক্ষার পরীক্ষায় কাউকে পাশ করতে দেখলে মানুষ অতিমাত্রায় অভিভূত, মুগ্ধ হয়। মুগ্ধতার আবহে নিজেকে প্রশ্নহীনভাবে তার কাছে সোপর্দ করে। জীবনবাজি রাখা এই সিদ্ধান্ত কখনও বা আত্মঘাতী বলে প্রমাণিত হয়।

---

[1] তবে এর সনদ দুর্বল। [যাকারিয়া]

দীর্ঘ ছয় মাস যাবত সেলফোন বন্ধ করে রেখেছেন সুমা। বেশ সংগ্রামমুখর জীবন। জীবনে প্রতিষ্ঠা হওয়ার দৃঢ় সংকল্পের চাদরে নিজের জীবনকে গুটিয়ে রেখেছেন। ঢাকায় বাসা নেই। মা বাবাও থাকেন না। তাই অনেক কষ্ট করেই ঢাকা থাকতে হয় সংকল্পকে বাস্তবতার লেবাসে অভিষিক্ত করতে। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি সাইফুরসে কোচিং করেন। কলেজের পড়াশোনার স্বীকৃত অনুষঙ্গ হচ্ছে ভালোবাসা, প্রেমপ্রীতি। হয়ত অভিভাবকরা এ ব্যাপারটি জেনেশুনেই সন্তানদেরকে কলেজে দেন। আর ছেলেমেয়েরাও ‘ফ্রেন্ডস’ নাম ব্যবহার করে পিতামাতার কাছ থেকে কৌশলে এভাবে ভালোবাসার স্বীকৃতি ও বৈধতা বাগিয়ে নেয়। এ কারণে আজ আর কোনো অভিভাবককে তার মেয়ের ‘ছেলেবন্ধু’ আছে কথাটা শুনে মুখ মলিন করতে দেখা যায় না। কিংবা বাসায় কোনো মেয়েসঙ্গী এনে বা মেয়েসঙ্গীর বাসায় গিয়ে আড্ডা দেয়াকেও এখন আর অভিভাবকের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বিষয় বলে ধরা পড়ে না।

এক শ্বাসরুদ্ধ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে এভাবেই এগিয়ে চলেছে আমাদের জীবন। এই জীবনের সাথে কেউ স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়লেও অনেকে চায় দূরে থাকতে। কিন্তু যুগের গড্ডালিকা কেবলই তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে। যুগের অশালীন বায়ুর প্রবলতা তাকে ধাক্কা দিয়ে সততার আঙিনা থেকে দূরে ফেলে দেয়। তাই কারো কারো জীবনের ঘটনা অতি নিদারুণ হলেও তা কেবলই অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত এবং অনিচ্ছাকৃত। সুমার

জীবনটাও সম্ভবত এই অনভিপ্রেত উপাখ্যানের পঙ্কে আটকে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

মুল কথায় আসি। কলেজে পড়ার সময় আতিকের নজরে পড়েন তিনি। প্রথম নজরেই তিনি আতিকের মনে ভালোবাসার জন্ম দেন। ভালোবাসার ডালি নিয়ে আতিক সুমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু সুমা সাড়া দেন না। নিজের একটা অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা ছিল, হাত ও পায়ে একটা অস্বাভাবিক দাগ ছিল তার। সেটা তিনি জানান তাকে। কিন্তু আতিক কোনো কিছু মানতে রাজি নয়। তার ভালোবাসা চাইই চাই। প্রথম দফায় ঘটনা ততদূর এগোয় না। সুমা কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর সংকোচের মধ্যে আবর্তিত হন। তাই ফোনটা বন্ধ রাখেন ঠিক ছয় মাস। ছয় মাস পর সিমটা চালু করা মাত্রই সেই আতিকের কল আসে। আশ্চর্য বিমুগ্ধতার ব্যাপার! তবে কি সে এই দীর্ঘ ছয় মাস অবিরাম ভাবে কল দিয়ে চেষ্টা করে গেছে? সম্ভবত তাই। মোহের সূচনা তো! যে কোনো কিছুর সূচনাতে কিছু উন্মাদনা থাকে। বিষয়টা যদি মোহের হয় তবে তার পরিমাণটা সন্দেহতীত ভাবেই বেশি।

সুমা সে সময় পান্থপথে সাইফোর্সে কোর্স করেন। এক রাতে মেসেজ পাঠিয়ে আতিক সুমার কাছে জানতে চায় আগামীকাল সে কোর্সে যাবে কিনা? সুমা বুঝতে পারলেন সে তার সাথে দেখা করার জন্যই প্রশ্ন করেছে। তাই তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললেন, না আগামীকাল ক্লাসে যাবো না। কিন্তু আতিক ফিরতি জবাবে জানালো, সুমা ক্লাসে যাক আর না যাক সে পান্থপথে

সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবে তার জন্য। সুমা তাকে বারণ করলেন কিন্তু আতিক বারণ শুনল না। শেষ পর্যন্ত সংকোচ আর ভয় নিয়েই কোর্সের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন সুমা।

গিয়ে দেখেন ঠিক ঠিক দাঁড়িয়ে আছে সে। তাকে দেখে ভয়ে হাত পা কাঁপতে শুরু হলো সুমার। ভয়ে না উত্তেজনায়? সেটা সুমা নিজেও বলতে পারবেন না! আতিক সুমার হাত ধরে টেনে রিক্সায় তুলল এবং বলল, এই একটু আমরা ফার্মগেটে দাঁড়াবো এবং সামান্য সময় গল্প করে চলে আসব। সুমা বললেন, আমি ক্লাস মিস করতে পারব না। কিন্তু সে বলল, আরে একদিন ক্লাস মিস্ করা কোনো ব্যাপার না। আমরাও তো ক্লাস করি এবং এখনও করছি।

যাহোক, সে জোর করে সুমাকে ফার্মগেটে নিয়ে এসে দাঁড়ালো এবং একই বক্তব্য পেশ করল- 'আমি তোমাকে বিয়ে করব।' সুমা বললেন, কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়। এরপর সে তার কাছ থেকে একটি প্যাড নিয়ে তাতে কবিতার দুটি লাইন লিখল- 'তোমার উঠোনে এনে দিব আমি সাতটি অমরাবতী।' অর্থাৎ শুধু এক স্বর্গ নয়, সাত সাতটি স্বর্গই তোমার উঠোনে এনে হাজির করে দেব! হায় মোহ! মোহের জালে ছটফট করা বিহঙ্গ বুঝি এভাবেই অন্যের জন্য স্বপ্নে জাল বোনে?

বিয়ের জন্য চাপাচাপি বাড়তেই থাকে তার। হাজার বার অস্বীকার করলেও সুমা তো মেয়ে মানুষ। মেয়েলী সরলতা তাকে আচ্ছন্ন করে। এদিকে আতিকও নিজেকে সুমার কাছে করুণার পাত্র করে

উপস্থাপন করে। তখন সে অসুস্থ। অসুস্থতাকেই সে হাতিয়ার বানায়। সুমাকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে খাবে না, চিকিৎসা গ্রহণ করবে না এবং পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করবে না। আতিকের এই বালখিল্যতায় ভড়কে যান সুমা। 'তুমি কথা না বললে আমি খাবো না' আতিকের এই কথাটি সুমার মনে মায়ার শক্ত বাঁধন তৈরি করে। তার কারণে একটা লোক যদি সুস্থ হয়ে যায় তবে তা কম কি?

অসুস্থ একটা লোককে ভালো করার পরিকল্পনা থেকে অসুস্থ একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় দুইজনের মধ্যে। তখন ডিজুসের ফ্রি অফারের যুগ! ফ্রির সুবাধে তারা দুইজনে সারাদিন মোবাইলে কথা বলতে থাকেন। কথায় কথায় কোন ফাঁকে যে সুমার মনে দুর্বলতা ঢুকে পড়ে তা তিনি নিজেও টের পান না। তাছাড়া আতিক তাকে একটি মধুর স্বপ্ন দেখিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করত। প্রলুব্ধ হতেন সুমা। আতিকের দেখানো সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতেন তিনি। সে বেশির ভাগ সময় স্বপ্ন দেখাতো একটা ফুটফুটে মেয়ে সন্তানের। সেই স্বপ্নের তাড়নায় আচ্ছন্ন হন সুমা।

এক পর্যায়ে আতিকের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান তিনি। আতিক ব্যক্তি উদ্যোগে বিয়ে করতে চাইলেও সুমা এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বলেন, এভাবে নয় অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ে হোক। তোমার অভিভাবককে আমার বাবা-মার কাছে পাঠাও। সে বলে ঠিক আছে আমি নিজেও যাচ্ছি তোমার মা

বাবার কাছে। সুমার মা বাবা তাকে আগে পড়ালেখা শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ মনোপুত না হওয়ায় বাইরে গিয়ে সে সুমাকে ফোন দিয়ে বলে, আমি বিয়ের যে দিন ঠিক করবো তাতে যদি তুমি সম্মত না হও তবে আমি আত্মহত্যা করব। সুমা তাকে সাধ্যমতো বোঝানোর চেষ্টা করেন। বলেন, দেখ এভাবে যদি বিয়ে করো, তাহলে কখনও আমাকে ছেড়ে যেত পারো। তখন তো আমি মা-বাবাও হারালাম, তোমাকে তো হারালমই।

সে বলল, দেখ, আমাদের পরিবারে বউ ছাড়ানোর রেকর্ড নেই। আমার বড় ভাইও ভালোবাসা করে বিয়ে করেছেন এবং প্রথমে বন্ধুসার্কেল নিয়ে বিয়ে করে পরে পারিবারিক ভাবে বিয়ে করেছেন। এভাবে তারা এক বিয়ে মোট তিনবার করেছেন! আর আমি তো তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করছি। তোমাকে ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। সে আরও বলে, তুমি যত রকমের গ্যারান্টি চাও তা দেব। এরই সূত্রে কাবিননামায় সে সাতলাখ টাকা নির্ধারণ করে।

বিফল হন সুমা। বাধ্য হন আতিকের বিয়ের ডাকে সাড়া দিতে। টাকার তো ব্যবস্থা নেই! আতিক বলল, তুমি টাকার ব্যবস্থা করো, পরে আমি শোধ করে দেব। কিন্তু সুমা কোথায় পাবেন বিয়ের টাকা? কোনো নারী কি নিজের বিয়ের পিঁড়ি রচনার টাকা নিজে সংগ্রহ করে রাখে? কিন্তু অভাগী সুমা তাই করলেন। নিজের যে গহনা ছিল তা গোপনে বিক্রি করে বিয়ের আয়োজন করলেন।

বিয়ে করলেন বোনের সহযোগিতায়। বোনের স্বামী ছিলেন একজন উকিল। তিনি তার ওকালতি জ্ঞান দিয়ে কীভাবে বাবা-মার অমতে বিয়ে করতে হয় তা তাকে শিখিয়ে দিলেন। তাই কোনো সমস্যায় পড়তে হলো না সুমাকে।

বিয়ের আগে আতিক জানতে চায় সুমার জন্য সে কী নিয়ে আসবে? সুমা জানান, কিছুই আনতে হবে না। শুধু পাঁচ টাকার একটা টিপ নিয়ে আসলেই হবে। পরের দিন হাজির হয় আতিক। তাকে দেখে বিয়ের পোশাক পরিধান করতে থাকেন সুমা। কাপড় পড়া শেষ হলে আতিকের কাছে টিপটা চান তিনি। কিন্তু আতিক দুঃখ প্রকাশ করে বলে, ওহ্হো, টিপটা তো আনা হয়নি! বন্ধুরা রাতে ওয়েইন খাওয়ার জন্য পাঁচশত করে চাঁদা ধরেছিল। সেখানে টাকা দেয়া হয়েছে। আর এনিয়ে ঝগড়া হওয়ায় টিপটা কেনার কথা মনে নেই!

থমকে যান সুমা। নিজের গহনা বিক্রির অর্থে বিয়ের আয়োজন করে মাত্র পাঁচ টাকার একটা টিপও স্বামীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া হলো না! অথচ পাঁচশ টাকা দিলো বন্ধুদেরকে ওয়েন খাওয়ার জন্য! বিয়ের বাকি পথ পরিক্রমার একটু ইশারা যেন এখানেই হয়ে যায় সুমার। যাহোক, মনোকষ্ট নিয়েই তারা বিয়ে করেন এবং বিয়ে করার পর বোন এবং একজন চাচীর মাধ্যমে বাড়িতে জানানো হয় যে, সুমা বিয়ে করেছেন।

দশ মাস পেটে ধারন করা মা, সংসারযুদ্ধে অবতীর্ণ রণক্লান্ত সন্তানের মুখ উজ্জ্বল করার প্রত্যাশায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে

যাওয়া পিতা নিজেদের অগোচরে সংঘটিত হওয়া সন্তানের বিয়ের সংবাদে কতটুকু মর্মাহত হন তা জানিনে, অনুমান করার বৃথা চেষ্টা করে মা বাবার কষ্টকে তাচ্ছিল্যও করতে চাই না।

সুমার মা বাবা সহজে না হলেও বিয়েটা মেনে নিলেন। এক অসংযত ও লজ্জিত পদক্ষেপে বাড়ির আঙিনায় পা রাখলেন সুমা এবং বাড়ির নতুন জামাই আতিক। সুমা অনুরোধ করে বললেন, আমাকে যা করার করো, বলার বলো কিন্তু আতিকের সাথে কিছু করো না। তাকে জামাইর মতোই স্বাভাবিকভাবে বরণ করে নাও। প্রথম থেকেই অমত ছিল সুমার বাবা-মার। শেষ পর্যন্ত তারা পীড়াপীড়ি করেছেন আতিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার। কিন্তু মা বাবা যতই বলেছেন আতিকের প্রতি সুমার মায়া ততই প্রগাঢ় হয়েছে। সুমা বড্ড আদরে আর আহ্লাদে লালিত পালিত হয়েছিলেন। বাবা-মা খুবই স্নেহ করতেন তাকে। জামা-কাপড়ে রাজকীয় জীবন-যাপন করতেন। তাই আতিককে স্বামী হিসেবে পাওয়ার পর তাকেও সাজান নিজের মনের মতো করে। নিজের গচ্ছিত টাকা দিয়ে তাকে নতুন নতুন জামা কিনে দিতে থাকেন। রাস্তা-ঘাটে, হাটে-মার্কেটে কারও গায়ে দেখা কোনো জামা পছন্দ হলেই তিনি তা পছন্দ করে আতিককে কিনে দিতেন। ভালোবাসার মানুষটিকে তিনি এভাবেই সাজাতেন মনের মতো করে। তখন তার মনে হতো আতিক তার আঙিনায় সত্যিই সাতটি অমরাবতী এনে দিয়েছে!

আতিক তখন লিভারের সমস্যা ও আলসারের মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত। কিন্তু দমে যান না সুমা। অসুস্থ স্বামীকে মনেপ্রাণে সেবা করেন তিনি। এক সাথে খেতে বসে নিজ হাতে গ্রাস তুলে দেন স্বামীকে। পেট পুরে খাইয়ে পরে নিজের জন্য মুখে খানা তুলতে গিয়েও থেমে যান। বলেন যদি এই লোকমা খাও তবে আমি খানা খাবো।

এভাবে ভালোবাসার সব উপহার পেশ করেন অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে তোলার প্রত্যাশায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ঔষধালয় থেকে স্বামীর সুস্বাস্থ্যের জন্য ঔষধ সংগ্রহ করেন। কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছিল না আতিক। স্কিনের দাগ উঠিয়ে ফেলার জন্য অনেক দিন থেকে টাকা সঞ্চয় করছিলেন সুমা। সাধ ছিল একদিন এই টাকা দিয়ে দেহ ও হাতে এই অবাঞ্ছিত দাগগুলো দূর করে দেবেন। সুন্দর ত্বকে মেহেদী লাগাবেন! আরও কত স্বপ্ন! কিন্তু ভালোবাসার স্বার্থে নিজের স্বপ্নটাকে চাদরেই মুড়িয়ে রাখতে হয় সুমাকে। স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি সেই টাকা স্বামীর চিকিৎসা সেবায় ব্যয় করেন। সুমার স্বপ্নের টাকায় ফার্মগেটের এক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সুস্থ হয়ে ওঠে আতিক। সেদিন সুমা কী খুশি!

কিন্তু সুস্থ হলেও বাড়িতে থেকে স্বামীর সেবাযত্ন করে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না সুমা। তাই আলাদা বাসা ভাড়া নেন তিনি। নয় হাজার টাকা মাহিনায় চাকরি নেন নুরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপের এক অফিসে। এক কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হন সুমা। অফিস,

রান্নাবান্না, স্বামীর সেবা এবং তার লেখাপড়াসহ ব্যক্তিগত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা!

শত কষ্টের মধ্যেও বেশ ভালোই কাটছিল সুমার এই সংগ্রামী জীবন। নিজের শরীরের ওপর দায়িত্বের এই বিশাল পাথর চাপা দিয়ে রাখলেও কখনও এর ভার অনুভব হয়নি। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনা হঠাৎ সবকিছু এলোমেলো করে দেয় তার। একটা মেয়ের কল আসে আতিকের নাম্বারে। আতিক প্রথমে স্বীকার করতে চায় না যে, এটা কোনো মেয়ের নাম্বার। পরে চাপাচাপিতে স্বীকার করে কিন্তু সুমাকে ধমকি দেয় সে। সে বলে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য বোধ হয় তুমিই মেয়েটাকে নাম্বার দিয়েছো। যদি তাই করো তাহলে অনেক সমস্যা হবে বলে দিচ্ছি- বলে আতিক সুমাকে হুমকি দেয়।

সুমার অস্বীকৃতিতে আতিক একটু অভিনয় করে। সে তার বন্ধুদেরকে নাম্বারটি দিয়ে মেয়েটিকে গালি দিতে বলে এমনকি সে তার ছোটভাইকে দিয়েও মেয়েটিকে বকা খাওয়ায়। এক পর্যায়ে অবস্থা শান্ত হয়ে আসে। সুমাও প্রশান্তির সাথে অফিস করেন, স্বামী সেবা করেন এবং একহাতে সংসারে সব কাজ সম্পাদন করেন। কিন্তু সুমার শান্ত মনে হঠাৎ ঝড় ওঠে। একদিন তিনি শুনতে পান যে, আতিক কুমিল্লায় গিয়ে মেয়েটির সাথে দেখা করে এসেছে। শোনার পরও নিশ্চুপ থাকেন সুমা। তবে নাম্বারটা খুব ভালো করে মনে রাখেন। দেখতে পান সেই নাম্বারে নিয়মিত কথা বলে আতিক।

একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন ভাত তরকারী সব আপন স্থানে পড়ে আছে। আতিক খায়নি। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়ত বাইরে ছিল, তাই হোটেলে খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু খুব অল্প সময়েই আতিক ধরা খেয়ে যায়। জামাটা খুলে রেখে গোসলখানায় ঢুকে আতিক। সে সময় তার নাম্বারে কল আসে। মোবাইলটা বের করতে গিয়ে কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বের হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। মোবাইলের সাথে বাসের একটা টিকিটও উঠে আসে। টিকিটটা কুমিল্লার একটা বাসের। কলটাও সেই মেয়ের, যার সাথে দেখা করার জন্য টিকিটটা কিনতে হয়েছিল আতিককে। তাই ভাত না খাওয়ার রহস্য আর অস্পষ্ট থাকে না সুমার।

কলদাতার পরিচয় জানতে চাইলে আতিক বলে এটা তার অফিসের এক পুরুষের নাম্বার। সুমা বলেন কই, সেতো মেয়ে মানুষের কল! তিনি নাছোড়বান্দা। বলেন, ঠিক আছে আমাকে নাম্বার দাও, আমি কল দেব। তার পীড়াপীড়িতে ক্ষিপ্ত হয় আতিক। ফলে সে বেদম প্রহার করে সুমাকে। সুমা বলেন, আমাকে মেরেও ফেললে আমি দেখব কার নাম্বার এটি। তবুও দিতে চায় না আতিক। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার হুমকি দেন সুমা। তখন আতিক বলে নাম্বারটি একটা মেয়ের। তবে আমি তার সাথে ব্যবসা করি। এরপর সুমা স্বামীর সামনেই নিজের মোবাইল থেকে মেয়েটির নাম্বারে কল দিয়ে বলেন, দেখো বোন! আমি আতিকের স্ত্রী, আমার মনে হয় তুমি খুব ভালো একটা মেয়ে। অনুগ্রহ করে তুমি আতিকের নাম্বারে আর কল দিওনা।

লাইনটা কেটে দেয়ামাত্রই আতিকের মোবাইলটা বেজে ওঠে। নাম্বারটা দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হয় আতিক। সুমার দৃষ্টি থেকে তা আড়াল থাকে না। তিনি তাকে লাউডস্পিকারে কথা বলতে বলেন। লাউডস্পিকারে শ্রুত স্পষ্ট বক্তব্য সুমার দিলে মারাত্মক চোট দেয়। মেয়েটি বলে, একটু আগে যে 'মেয়েটি' ফোন দিলো সে কে? আতিক তড়িঘড়ি করে বলে, তুমি ওসব ধরো না, ওটা কিছু না! এভাবে আতিক দু'কূলই রক্ষা করার প্রয়াস করলেন। কিন্তু এটা তো শাশ্বত বাস্তবতা যে, স্ত্রী আর পরকীয়ার দুটি বিপরীতমুখী স্রোত একসাথে চলতে পারে না। তাই দু'কূল রক্ষা করার প্রয়াসও সফল হয় না। হয় দু'কূলই হারাতে হয় নতুবা স্বামীত্বের মানহানী করে পরনারীর হাত ধরে পলায়ন করার কাপুরুষতা প্রদর্শন করতে হয়।

স্ত্রী পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও কলারের 'মেয়ে' কথাটা আর স্বামীর 'ওটা কিছু না' কথাটা সুমাকে নিদারুণ ব্যথিত করল। আরো কতক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। আতিক রাগে-ক্ষোভে আরও প্রহার করল সুমাকে। এরপর আতিক বাসা থেকে বের হয়ে যায় আর সুমা চলে যান অফিসে। অফিসে গিয়ে আতিকের নাম্বারে ফোন দিয়ে দেখেন নাম্বার ব্যস্ত। সাথে সাথে মেয়েটির নাম্বারে কল দিয়ে দেখেন সে নাম্বারটাও ব্যস্ত। এরপর তিনি অফিস থেকে বাসায় চলে আসেন। অসময়ে জায়নামাজ বিছিয়ে সালাত আদায় করেন। মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 'হে আল্লাহ!

আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু আমি যে আর পারছি না। তাই পাপের আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার এই মহাপাপ ক্ষমা করে দিও।'

অফিসের একটা লোক তাকে ছোট বোন মনে করতেন এবং তাকে খুব স্নেহ করতেন। সুমার ব্যাপারটি তিনি আগে থেকেই জানতেন। অফিসে তিনি সুমাকে না দেখে শঙ্কিত হলেন। কল দিলেন তার নাম্বারে। জায়নামাযে কান্নারত অবস্থাতেই কলটা আসে সুমার নাম্বারে। তিনি কল রিসিভ করে বলেন, আমি সালাতে আছি, একটু পরে কল দেন। একথা বলে লাইনটা কেটে দিয়ে মোবাইল অফ করে দেন সুমা। এরপর বিষ পান করেন।

বিষের প্রতিক্রিয়ায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছে তার। তখন তিনি শেষবারে মতো স্বামী ও অন্যান্য আপনজনদের কাছ থেকে চিরবিদায় নেয়ার জন্য ফোনটা অন করেন। প্রথমেই ফোন দেন ভালোবাসার মানুষটিকে। আতিককে বলেন, তোমার কষ্টের দিন শেষ হচ্ছে, তোমার আপদ দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে। নিরসকণ্ঠে আতিক বলে কী হয়েছে? সুমা বলেন, আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি তাই বিষ খেয়েছি। কথাটা শুনে চমকে ওঠে আতিক। সে কসম করে বলে বিশ্বাস করো, আমি আর কোনোদিন কোনো মেয়ের সাথে কথা বলব না। তুমি সুস্থ হয়ে যাও, ডাক্তারের কাছে যাও।

ইতিমধ্যে সেই ভাইটিও বাসায় চলে আসেন। কিন্তু দরজা বন্ধ করে রাখেন সুমা। লোকটি দরজা খুলতে বললে সুমা বলেন, আমি তো বাঁচার জন্য বিষ খাইনি। তিনি বলেন, যদি দরজা না খোলো

তাহলে আমি চিৎকার করতে বাধ্য হবো। শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে দরজা খোলাতে সক্ষম হন তিনি এবং তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। অনেকদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন সুমা। কিন্তু আতিক সেই যে প্রথম শুনল এরপর আর কোনোদিন কল দেয়নি এবং জানারও চেষ্টা করেনি যে, সুমা কী করে সুস্থ হয়ে উঠল।

এই কঠিন মুহূর্তে সুমার কথা মনে না পড়লেও এক কারণে ঠিকই মনে পড়ল। একবার সে ফোন করে জানালো, তার হাতে টাকা নেই। সে একবেলা খেয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। বুকটা কেঁপে উঠল সুমার। হাতে যে টাকা নেই সে কথাই ভাবলেন না তিনি। তৎক্ষণাৎ স্বামীকে ঢাকায় ডেকে নিলেন এবং সর্বশেষ স্মৃতি হাতের রিংটা আতিকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও বিক্রি করে তোমার প্রয়োজন মেটাও। সেই টাকা শেষ হলে আবার টাকা চায় সে সুমার কাছে। এর মধ্যে একদিন বাসাওয়ালা সুমাকে বললেন, আপনি যদি দুয়েকদিন বাসায় না থাকেন তাহলে আপনার স্বামীকে একটা মেয়ের সাথে ধরিয়ে দিতে পারব!

কথাটা শুনে আত্মার পানি শুকিয়ে যায় সুমার। আতিককে বললে, সে বলে বাড়িওয়ালা দুষ্টামি করে কথাটা বলেছে। এরপর থেকে নিয়মিত তিনি আতিকের পরিবর্তন দেখতে পেলেন। ভালোবাসার পাটটা ভয়ানকভাবে প্রহার আর নির্যাতনের দিকে গড়াতে লাগল। আতিক অসুস্থ দেখে সুমা তাকে চাকরি করতে দেননি। দুর্বল ঘাড়ে একাই টেনেছেন সংসার নামক ভারি জোয়াল।

আতিক থাকত চট্রগ্রামে। তাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন তিনি। কিন্তু আতিক স্ত্রীর এই অবদানের মূল্য দেয়নি। স্ত্রীর উপার্জন ঢেলেছে সে পরনারীর পেছনে। তার বন্ধুরাও তাকে ভর্ৎসনা করে বলত, স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা এনে পরনারীর পেছনে ব্যয় করতে লজ্জা করে না তোর? জানিনা এরচেয়ে বড় খেয়ানত আর স্ত্রীর ভালোবাসার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় নজির আছে কিনা?

নয়টার সময় অফিস সুমার। সারারাত আতিকের পা চেপে দিতে হয়। কখনও কখনও ভোরের আলো পড়ে আতিকের পায়ে লুটিয়ে পড়া সুমার ক্লান্ত ও ঘুমন্ত দেহের ওপর। দীর্ঘ রজনীতে ঝিঁ ঝিঁ পোকাও ডাকতে ডাকতে একসময় ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। হয়তবা আপন নীড়ে আশ্রয় নেয় বিশ্রামের কোলে। কিন্তু বিশ্রামের সুযোগ মেলে না সুমার। কিছুটা স্বামীর নির্দেশ পালন আর বাকিটা মনের টানেই তাকে মধ্য রজনী এবং কখনও কখনও সারারাত পা দাবাতে হয়। ভোরের আলো ফুটলে আবার হাতে নিতে হয় থালাবাসন, ডেকসি-পাতিল। কিন্তু স্বামীর কঠোর নির্দেশ এসময় সামান্য পরিমাণও শব্দ হতে পারবে না। এক পাতিলের সাথে অন্য পাতিলের সংঘর্ষ বা ঠোকাঠুকি হতে পারবে না! পাছে যদি তার ঘুমের-আরামের ব্যঘাত ঘটে!

সুমা চেষ্টা করেন স্বামীর নির্দেশ পালনের। কিন্তু ‘অবুঝ পাতিল’ বোঝে না সুমার কষ্টের কথা। তাই অজান্তেই তারা একে অপরের সাথে ঠোকাঠুকি করে। পরিণামে সুমার কপালে জোটে আতিকের তীব্র বক্র চাহনি, কঠিন গালমন্দ আর কখনও কখনও প্রহারের

হাত! সকালে আবার ডিম সিদ্ধ করে খাওয়াতে হয়। তাও আবার কাঁটায় কাঁটায় বিশুদ্ধ (?) সিদ্ধ হতে হবে! কম সিদ্ধ হলে কিংবা বেশি সিদ্ধ হলেই কপালে জুটবে গালমন্দ।

আতিক একদিন বলল, এত সিদ্ধ হলে হবে না। ভালোবাসায় অন্ধ সুমা বললেন, ঠিক আছে আজ খাও, আগামীকাল তোমার মনের মতো সিদ্ধ করে দেব। পরের দিন বলল, এত কম সিদ্ধ খাবো না। তো সুমা বললেন, ঠিক আছে তুমি ব্রাশ করতে যাও, আমি তোমার মতো করে সিদ্ধ করে নিয়ে আসছি। এভাবে মানসিক চাপের মধ্যে কাটতে লাগল সুমার জীবন। একদিন দেখলেন তার ব্রাশ, টিস্যু এবং ব্যবহারিক আসবাবপত্র সব খাটের নিচে। কারণ জিজ্ঞেস করলে আতিক বলল, এগুলো এখন থেকে এখানেই থাকবে। কোনো কারণ নেই, হেতু নেই কেবলই সুমাকে কষ্ট দেয়া! সুমা বললেন, অফিসে যেতে তাড়াহুড়া থাকে, রান্নাবান্না করে এমনিতেই সময় পাই না। আবার কাজের সময় যদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হাতের কাছে না পাই তাহলে চলবে কীভাবে? তাই তুমি জিনিসগুলো আগের জায়গা রেখে দাও।

আতিক এসব যৌক্তিক কথা শুনতে নারাজ। সুমা তাকে আদেশ দিলেন কেন, এই অপরাধে তৎক্ষণাৎ সে খাট থেকে নেমে তার চুল ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে বুকের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে। এক অনিঃশেষ বেদনায় কেঁদে উঠে সুমার আত্মা। আজ কী দেখছেন তিনি? এই সেই আতিক, যাকে তিনি নিজের গহনা বিক্রি করে সুস্থ করে তুলেছেন? নিজে না খাইয়ে তার চিকিৎসার

ব্যয়ভার বহন করেছেন? সারারাত জেগে পা দাবিয়ে দিয়েছেন? সারাদিন পরিশ্রম করে লেখাপড়ার খরচ জুটিয়েছেন? শেষ সম্বল হাতের রিংটা বিক্রি করে তিনবেলা খাবার নিশ্চিত করেছেন? সেই আতিক, যে তার আঙিনায় সাতটি বেহেশত (অমরাবতী) এনে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল? তবে এটাই কি আতিকের বেহেশত? পায়ের নিচের এই বেহেশতের কথাই কি তাহলে এনে দেয়ার পণ করেছিল সে?

পৃথিবীর সবচেয়ে আপন আর প্রিয় মানুষটির পদপিষ্টে দম বন্ধ হয়ে আসা সুমার চিন্তা শক্তি থমকে যায়। চোখ বন্ধ হয় আসে। নিশ্বাস তুলতে কষ্ট হয়। যেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি পাহাড়টি কেউ তার বুকে চেপে ধরেছে! তপ্ত বুক ফেড়ে কেবল একটি গরম নিশ্বাস বের হয়ে আসে সুমার। তা দেখে বুটের চাপ আলগা হয়ে আসে আতিকের। একরাশ দহন, বেদনা, পীড়া আর বুকভরা কষ্ট নিয়ে উঠে দাঁড়ান সুমা। স্বামীর প্রতি আজ অভিমানেরও ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন অফিসের সময় বয়ে যায়। নাহ্, দেরি করা যায় না! এই স্বামী, এই সংসারের জন্যই যে তাকে অফিসে ছুটে যেতে হবে! তাই দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা স্বপ্নদ্রষ্টার মতো হতবিহলতা নিয়ে অফিস পানে ছুটে চলেন সুমা। পেছনে ফেলে আসেন ভালোবাসার প্রতিদানের এক বিকৃত উপমা।

আরেকদিনের ঘটনা। অফিসের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। বাসা থেকে অফিসে যেতে গুণে দশ মিনিটই লাগে। রান্না করে

এনে খানা খেতে বসে আতিককে খাওয়ার জন্য ডাকলেন সুমা। কিন্তু আতিক এখন খাবে না বলে সুমাকে খেয়ে যেতে বলল। কিছুক্ষণ পর যখন অফিসের আর মাত্র দশমিনিট বাকি তখন সুমাকে খানা দিতে বলে আতিক। তার কথায় কিছুটা বিরক্ত হলেন সুমা। সম্ভবত দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম স্বামীর সাথে রাগ করার ঘটনা ঘটল সুমার। শ্লেষের সাথে বললেন, আমার তো অফিস সময় হয়ে যাচ্ছে, যখন সাধলাম তখন খেলে না। এবার একটু কষ্ট করে নিজেই বেড়ে খাও না!

পৃথিবীর কোনো অভিধানে কিংবা আইনে এটাকে মোটেই স্ত্রীর দায়িত্ব অবহেলা কিংবা স্বামীর প্রতি অবহেলা বুঝায় না। বরং স্বামীর হঠকারিতাই বুঝায়। সেই হঠকারিতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে আতিক কর্কশকণ্ঠে বলল, না, তুমিই খানা দিয়ে যাও। এবার আরেকটু শক্ত হলেন সুমা। স্বামীর সাথে বিরক্তি প্রকাশ না করতে পেরে পাশে থাকা বোতলটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। ফলে মেজাজে তিরিক্কি খেলে যায় আতিকের। সে শক্ত একটা ঝাড়-হাতে তুলে নেয় এবং সর্বশক্তি ব্যয় করে সুমার পিঠে আঘাত করে।

কৃশকায়, দুর্বল, রাতজাগা আর দিনেখাটা 'মেয়েটি' আঘাতের প্রচণ্ডতার কাছে হার মানতে বাধ্য হন। মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুমা। মা বাবা থেকে দূরে, একমাত্র ভালোবাসার মানুষের আশ্রয়ে একান্তই অসহায় সুমার দেহটি নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। কি জানি হয়ত আরো কষ্টের

বোঝা বহনের জন্য তখনও তার দেহে প্রাণবায়ুর যাতায়াত অব্যহত থাকে। অনেকক্ষণ এভাবে পড়ে থাকতে দেখে ভড়কে যায় আতিক। ভালোবাসা কিংবা মায়ায় নয়, ভয়ে সে তাকে বিছানায় নিয়ে যায় এবং সেবা করে সুস্থ করে তোলে। সদ্য মৃত্যুদুয়ার থেকে ফিরে আসা সুমা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আর লুকিয়ে রাখার সাহস পান না তিনি। তাই তিনি ঘটনা আতিকের ভাইকে জানাতে চান। কিন্তু সে তার কাছে আবারও ক্ষমা প্রার্থনা করে পার পেয়ে যায়।

আতিক চট্টগ্রামে থাকত আর মাঝেমধ্যেই সুমাকে ডেকে নিয়ে যেত সেখানে। একদিনের ঘটনা। সুমাকে চট্টগ্রামে ডেকেছে আতিক। স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই সুদূর চট্টগ্রামে হাজির হলেন সুমা। আতিক তাকে নিয়ে উঠল এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে কী এক কথা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে আতিক। সুমাকে বিশ্রী ভাষায় গালমন্দ করে, প্রহার করতেও বাদ রাখে না। ব্যথিত হৃদয়ে সুমা বলেন, তুমি তো আমাকে সবসময় মারই। মারার জন্য এখানে ডেকে নিয়ে আসলে কেন, তুমি আমাকে বলতে। টাকা দিতাম ঢাকায় গিয়ে মেরে আসতে!

জানা নেই, আতিকের আত্মাটা কোন পাথরে গড়া! কোনো পাথরকেও সামনে রেখে কোনো অসহায় নারী যদি এভাবে আকুতি জানায় তবু পাথরও বোধ হয় না গলে থাকতে পারবে না। কিন্তু তবু গলে না আতিকের মন। তার প্রতি সুমার সব করুণা, ত্যাগ, অবদান আর অনুকম্পার কথা এক মুহূর্তের জন্যও স্মরণে

আনতে চায় না সে। স্মরণের পুরো অংশ জুড়ে থাকে কেবল সেই অতিথি নারীটি।

সে আরও বলে, সামনে কোনো সময় যদি চট্রগ্রাম আসো তবে কাউকে তা জানাবে না। কথাটা শুনে অবাক হন সুমা। তিনি বলেন, আমি তোমার স্ত্রী। সবাই তা জানে, তাই লুকিয়ে আসতে হবে কেন? মেরেটেরে ফেলবে নাকি! সুমার বিদ্রুপে ক্ষীপ্ত হয় আতিক। এ কথাটিকে কেন্দ্র করেও সুমাকে প্রহার করে সে।

আতিক তখন বাড়িতে। একদিন সে ফোন দিয়ে সুমাকে জানায় সে আজ তার কাছে আসছে। শুনে মনের কোণে হিল্লোল বয়ে যায় সুমার। বহুদিন পর প্রিয় স্বামী কাছে আসছে! কার না ভালো লাগে? শিহরণে তাই চোখ বন্ধ হয়ে আসে সুমার। বিকেল তিনটার সময় রওয়ানা হয় আতিক। কিন্তু পাঁচটার সময় থেকে ফোনটা বন্ধ পান সুমা। চিন্তায় গলা শুকিয়ে আসে তার। তখন থেকে একটানা কল দিতে থাকেন স্বামীর নাম্বারে। কিন্তু কল ঢোকে না। রাত দশটার দিকে তার অন্য খেয়াল হয়। সেই মেয়েটার নাম্বারে কল দেন তিনি। দেখেন মেয়েটি রাস্তায়। সে বলে অফিস থেকে বের হলাম বাবা আমাকে নিতে এসেছে। ঘটনা বুঝতে বাকি থাকে না সুমার।

তিনি কথা না বাড়িয়ে আবার ফোন দেন আতিকের নাম্বারে। সেটা তো বন্ধই কিছুক্ষণ পর সেই মেয়েটির নাম্বারও বন্ধ পাওয়া যায়। আতিকের অবৈধ অভিসারে বিচলিত হতে থাকে একজন প্রতিপরায়ণ নারীর নিরাপরাধ অন্তর। তিনি সারারাত স্বামীর জন্য

টেনশন করেন আর একটানা কল দিতে থাকেন। ভোর পাঁচটার দিকে আতিকের নাম্বারে কল ঢোকে। অভিমানের সাথে আতিকের কাছে জানতে চান তোমার না আমার কাছে আসার কথা ছিল? তুমি এখন কোথায়? আতিক বলে সে চট্টগ্রামে এসেছে এবং মোবাইলে চার্জ না থাকায় তা বন্ধ ছিল! সামান্য প্রতিবাদ করে থেমে যান সুমা। জানেন প্রতিবাদের ভাষা এখানে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে!

এভাবে বহুবার সুমাকে প্রতারিত করেছে আতিক। রাতের কিছুক্ষণ কথা বলেই সে বলত, ফোন রাখো, এখন ঘুমাব। রাতে আর কল দেবে না। কিন্তু মন মানত না সুমার। তিনি মাঝ রজনীতে স্বামীর নাম্বারে কল দিতেন। ঘুমের ব্যাখ্যা পেতে দেরি হতো না। মোবাইলের স্কিনে ভেসে ওঠা busy শব্দটিই বলে দিতো আতিক কোন ঘুমের জন্য স্ত্রীকে ফোন দিতে বারণ করেছে! আতিক বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্ত্রী সুমা এব্যাপারে একেবারে অন্ধকারে। একদিন সে ঠিক ঠিক বিদেশ চলে গেল। কিন্তু স্ত্রীকে সে কথাটুকুও জানালো না। এদিকে স্বামীর নাম্বারে কল দিয়ে না পেয়ে ব্যাকুল আর অস্থির হয়ে ওঠেন সুমা। দীর্ঘ দুই মাস পর জানতে পারেন আতিক বিদেশ গেছে!

সে সময় সুমা কঠিন মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। দুই দুইবার বিষ খাওয়ার কারণে শরীরটা এমনিতেই নিষ্ক্রিয় হতে চলেছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনমাস অফিস করতে পারেননি। কর্তৃপক্ষ এই তিন মাসের বেতন দিতে চাইলেও

কোনো এক সমস্যার কারণে দিতে পারছিল না। এই কঠিন সময়ে তিনি বারবার স্বামীর কাছে কিছু সাহায্য চেয়ে ফোন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার আতিক জানিয়েছে কোম্পানি থেকে বেতন পাচ্ছে না। তাই তার পক্ষে টাকা পাঠানো সম্ভব না। সাহায্য করা তো দূরের কথা এই সময় সে সুমাকে নিজ থেকে কলও দিত না।
মিসড কল দিয়ে সুমার সাথে কথা বলত সে। চারতলার বাসা থেকে নিচে নামতে অসুস্থ সুমার প্রায় আধা ঘণ্টা সময় লেগে যেত। তিনি নেমে মোবাইলে টাকা তুলে তবেই আতিকের সাথে কথা বলতেন। আতিক বলত, সে যে অফিসে আছে সেখান থেকে কল রিসিভ করা যায় কিন্তু কল দেয়া যায় না! মিথ্যাচারিতা আর কাকে বলে? এই বিধান সুমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সুমীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সুমাকে আতিকের বন্ধুরা জানিয়েছে, সে সুমাকে কল না দিলেও সুমীর সাথে নিয়মিত কথা বলে!
দুর্দশার এই সময়ে খুব করে মনে পড়তো আতিকের অসুস্থ সময়ের কথা। তখন তাকে এক লোকমা ভাত বেশি খাওয়ার জন্য কত চেষ্টাই না করেছেন সুমা! শিশু বাচ্চার মতো স্বামীর সাথে ঢংঢাঙ করেছেন, সে না খেলে নিজে খাবেন না বলে বেশি করে খাইয়েছেন। আর আজ? আজ যখন তরে ঘরে খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই, কয়েকমুঠো চাল সম্বল ভেবে সুমা তা দেখে দেখে রাখেন আর অফিসের লাঞ্চ দিয়ে পুরো দিন কাটিয়ে দেন, পরের দিন আবার লাঞ্চের সময় হলেই কেবলমাত্র কিছু মুখে দেন তখন আতিকের একবারের জন্যও ভাবোদয় হয়নি। মনে হয়নি যে, মা

বাবা থেকে বিচ্ছিন, অসুস্থ স্ত্রীটির মুখে কয়েক মুঠো ভাত তুলে দেয়ার জন্য তার কিছু টাকা পাঠানো দরকার!

কিছুদিন পর আতিক ফোনে সুমাকে জানালো যে সে দেশে ফিরে আসছে। তবে কবে আসছে সে কথা জানালো না সুমাকে। তবু সুমার মনে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। কতদিন পর স্বামীকে দেখবেন তিনি! আদর করে নিজ হাতের রান্না খাওয়াবেন! হাতের একমাত্র সম্বল পাঁচশত টাকা দিয়ে বাজার থেকে আম কিনে আনলেন স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য। কবে নিজ হাতে কেটে স্বামীর সামনে তা তুলে ধরবেন- সেই প্রতীক্ষায় দিনগণনার পালা। দিন যেন শেষই হতে চায় না। দিন শেষ হলো বটে কিন্তু সুমা তা জানতে পারলেন না। একদিন আতিকের বিদেশের নাম্বারে কল দিলেন। বন্ধ! দেশের নাম্বারে কল দিলেন। বন্ধ! বেকারার হবেন না? হলেন।

দুশ্চিন্তায় কল দিলেন শ্বশুর তথা আতিকের বাবার কাছে। বাবা জানালেন সে তো দেশে চলে এসেছে! এর কিছুক্ষণ পর সুমার নাম্বারে একটি অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসল। রিসিভ করে আতিকের কণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি। ভালোমন্দ জিজ্ঞেস না করে বাজখাই গলায় সে বলল, বাবার নাম্বারে কল দিয়েছো কেন? আতিককে কে বুঝাবে যে, এই কলটা তো পতিপরায়ণ, পতিকল্যাণব্রতে অস্থির নারীর স্বামীর অনুসন্ধানের কল্যাণকামী কল? কিন্তু সে বোঝে না।

ঝাঝালো কণ্ঠে তাকে শাসন করে এবং তার বাসায় যাবে না বলে জানিয়ে দেয়। অসুস্থ সময়ে বহু কষ্ট করে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করে আতিকের পছন্দের খাবার যোগাড় করেছিলেন সুমা। শিশু মেলা থেকে পাঁচ কেজি আমও সংগ্রহ করেছিলেন আতিকের জন্য। কিন্তু আতিকের এই প্রত্যাখ্যানে বুক ভেঙে যায় সুমার। তিনি বেদনার একরাশি জল তার বুকটাকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

এর কয়েকদিন পর আরও তিক্ত সংবাদ শোনায় আতিক। সুমাকে সে ফোন দিয়ে বলে তার সাথে সংসার করা তার পক্ষে সম্ভব না! কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়েন সুমা। ওই মেয়েটির সাথে ঘর বাঁধার জন্য তাকে ছাড়তে চাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে আতিক তা সরাসরী অস্বীকার করে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে বলে, ঠিক আছে যদি দশ লাখ টাকা দাও তবে আমি তোমার সাথে সংসার করতে রাজি আছি। আসলে এটা ছিল আতিকের বাহানা।

একবার সুমার অর্থ দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে, এবার চাচ্ছে তার টাকা দিয়ে সেই সুস্থ শরীরে আরেকজনকে বিয়ে করার! কিন্তু ব্যথা, বেদনায় জর্জরিত আর বিপর্যস্ত ভাঙাচোরা হাড্ডিসার শরীর ছাড়া সুমার দেবার আর কিছুই বাকি ছিল না। তাই তিনি মহিলা পরিষদের দ্বারস্থ হলেন। মহিলা পরিষদ থেকে আতিক বরাবর উকিল নোটিশ দেয়া হলে সে সেখানে উপস্থিত হলো। সেখানে সে পরিষ্কার অস্বীকার করে বসল অন্য মেয়ের সাথে সম্পর্কের কথা। অথচ সে যখন সবার সাথে কথা বলছিল তখনও সুমী নামের

সেই মেয়েটি তাকে কল দিচ্ছিল আর সে মেসেজ লেখে তার ব্যস্ততার কথা জানাচ্ছিল তাকে।

এক পর্যায়ে সুমা তাকে কুরআন শরীফ ছুঁয়ে শপথ করার কথা বলেন। কিন্তু নির্বিকচিত্তে কুরআন শরীফ ছুঁয়েই আতিক অন্য নারীর সাথে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে! যখন সে একহাতে কুরআন ছুঁয়ে শপথ করছিল তখন তার অন্য হাত ছিল ফোনের বাটনে সুমী নামের সেই মেয়েটির নাম্বার কেটে দেয়ার কাজে! কাবিনের টাকা ও ভরণপোষণ বাবদ আতিককে দশলাখ টাকা দেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু সে এক ফাঁকে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইলে সে সুমাকে তালাক দেবে বলে জানায়। কিন্তু সুমা তখনও আশাবাদী ছিলেন।

সামনে ঈদ আসছে। বেশকিছু টাকা যোগাড় করেছেন এবার ঈদে আতিককে নিজ হাতে কাপড়চোপড় কিনে দেবেন বলে। স্বপ্ন বুনছেন আতিককে সাথে নিয়েই মার্কেট করবেন এবং তার পছন্দ মতো কাপড় কিনবেন। কিন্তু আতিকের সাড়া নেই। ঈদের মাত্র একদিন বাকি। এই সময়ে সুমার নামে একটা চিঠি আসল। আতিক আসছে জানিয়ে চিঠিটা লিখছে মনে করে মনে মনে দারুণ উৎফুল্ল হলেন সুমা। উত্তেজনায় হাত কম্পন করায় ঠিক মতো চিঠিটা খুলতেও পারছেন না তিনি! এক পর্যায়ে চিঠিটা খুলতে সক্ষম হলেন। পড়ামাত্রই বেদনায় নীল হয়ে গেল তার গোটা অস্তিত্ব। ঘরে গিয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে আতিককে ফোন দিলেন তিনি। বললেন, আতিক! তোমার ঈদের উপহার আমি

পেয়েছি! একজন নারীর জন্য এরচেয়ে সেরা কোনো উপহার হয় না! তার কথা শুনে আতিক শুধু একবার মুচকি হাসল।
কান্নায় দম বন্ধ হয়ে আসে সুমার। চিনচিনে ব্যথায় বুক চেপে ধরেন তিনি। ঈদের আগের দিন স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের চিঠির চেয়ে নারীর জন্য 'বড় ঈদ উপহার' আর কীইবা হতে পারে!!!
মুক্তবাসের জীবন আমাদের নারীদেরকে এই উপহারই দিয়ে চলেছে অহর্নিশ। তবু আমরা থামছি না, থামাটাকে দরকার বলে মনে করছি না! সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন-

جبلت القلوب على حب من أحسن اليه

'ইহসানকারীর প্রতি ইহসানগ্রহীতার দিল বাঁধা থাকে।'
চিরবাস্তব কথা। কিন্তু আতিকদের সেই কৃতজ্ঞতাবোধ কোথায় গেল? যে মেয়েটি তাকে এত ভালোবাসল, বাবা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, নিজের সখের বস্তু বিক্রি করে তাকে সুস্থ করে তুলল, দুর্বল শরীরে চাকরি করে স্বামীর লেখাপড়া ও তার জীবিকার আয়োজন করল, স্বামীর যাবতীয় খরচ নিজে বহন করল সে কি এই প্রতিদান পাওয়ারই যোগ্য ছিল? পরনারীর পেছনে ঢালার জন্যই কি সে কৃশকায় দেহ নিয়ে অর্থোপার্জন করত আর তা স্বামীর হাতে তুলে দিত?
যে নারী তার জন্য এতকিছু করল, তাকে এভাবে অসম্মান করা, এত কষ্ট দেয়া ঠিক হলো? হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী কি এগুলো

ভদ্রতার আওতায় পড়ে? যে তোমার জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ফুল বিছিয়ে দিলো তুমি তার জীবনপথে এভাবে কাঁটা ছড়িয়ে দিতে পারলে? স্ত্রীর জীবনকে এভাবে দুর্বিষহ করে তোলা মানুষের কাজ?

এর চেয়ে অকৃতজ্ঞতা, নেমকহারামীর জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? মুক্তবাস আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন আমাদের অভিধান থেকে এভাবে একে একে মুছে দেবে সততা, কৃতজ্ঞতাবোধ ও শালীনতা! সুমা! জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাও। এসব ধূর্তলোকের স্মৃতি মন থেকে যত দ্রুত সম্ভব দূর করে দাও। যে একবার তোমার সুখ কেড়ে নিয়েছে দ্বিতীয়বার সে তোমাকে সুখ দিতে আসবে না। আসলে আবার আসবে তোমাকে লুট করার জন্য। কমিনাদের চরিত্র কখনও বদলায় না। বলা হয়ে থাকে-

وَلَوْ سَمِعْتُمْ أَنَّ جَبَلًا زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ ، وَإِنْ سَمِعْتُمْ أَنَّ رَجُلًا تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ أَيْ الْأَصْلِيِّ فَلَا تُصَدِّقُوهُ .

'পাহাড় স্থানচ্যুত হওয়ার সংবাদ বিশ্বাস করো কিন্তু মানুষ তার আসল চরিত্র বদলিয়েছে এরূপ সংবাদ বিশ্বাস করো না।' [মিরকাতুল মাফাতিহ : ১৫/২৫]

সুতরাং এদের আর বিশ্বাস করতে যাবে কেন এবং এদের প্রতি ভালোবাসা দীর্ঘায়িত করে নিজেকে আক্ষেপ আর অনুশোচনার চিতায় প্রজ্জ্বলিত করবে কেন? আর মন ভেঙো না।

وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ.

‘একবার ইবন ‘উমর (রা) কা‘বা গৃহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে কা‘বা! তোমার মর্যাদা আর সম্মান কত উঁচুতে! কিন্তু মুমিনের দাম তোমার চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহ তা‘আলার কাছে। [জামে তিরমিযী : ২১৬৪]

অতএব, যারা মুমিনের কলব ভাঙবে তারা আবরাহার পরিণতির শিকার হবে। আসমানী গজবই ‘তায়রে আবাবীল’ হয়ে তাদের ওপর ধ্বংসের পাথর নিক্ষেপ করবে।

সুমা! অনেক হয়েছে। এবার আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গ নিয়ে জীবনপথে এগিয়ে চলো। তবে আগের মতো নয়-জীবনটার মোড় ঘুরিয়ে, আখেরাত আর আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসাকে সাথে নিয়ে। দেখবে অতীতের গ্লানী ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে তোমার জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।

ভালোবাসা দিবসের পাপ

ভালোবাসা দিবসের আবিষ্কারকরা পিছু হটতে শুরু করেছেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি যারা বিশ্বভালোবাসা দিবস পালন করার জন্য মুখিয়ে ছিলেন তাদেরকেও আশাহত হতে হয়েছে। আসলে ফেব্রুয়ারির এই সপ্তাহটি ছিল ঘটনাবহুল, হৃদয়বিদারক এবং কষ্টের সপ্তাহ। ১১ই ফেব্রুয়ারি নিমর্মভাবে নিহত হন দুই সাংবাদিক, সাগর এবং রুনি। তারা স্বামী-স্ত্রী। মাত্র পাঁচ বছরের একটি শিশু মেঘ। তার সামনেই সন্ত্রাসীরা পিতামাতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মা-বাবার রক্তভেজা মোবাইল থেকে পরের দিন মেঘ তার নানুর কাছে ফোন দিয়ে বলে 'আব্বু আম্মু মারা গেছে।'

এমন একটি নির্মম দুঃসংবাদ শোনার প্রস্তুতি ছিল না তার মা-বাবার। ছিল না গোটা দেশবাসীরও। তাই শোকে কাতর হয়েছে সবাই। সেদিন শোকে সবাই মেঘ হয়ে গিয়েছিল। সাগর-রুনি যেন শুধু মেঘেরই মা-বাবা নন গোটা দেশবাসীর মা-বাবা। তারা শুধু তার মা-বাবারই সন্তান নন গোটা দেশবাসীর সন্তান। এই ঘটনায় 'বহিরাগতদের' মধ্যে সবচেয়ে বেশি চটেছিলেন সাংবাদিক শ্রেণী। কারণ, সাগর-রুনি দুইজনই ছিলেন তাদের সহকর্মী-সাংবাদিক। সাংবাদিকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আর উত্তেজনা দেখে আমাদের হস্বতস্বী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুনীদের বের করার আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন।

মন্ত্রী হম্বিতম্বী করতে ভালোবাসেন। যে কোনো সময়ের চেয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভালো বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন। জনগণ কতটুকু আশ্বস্ত হয় জানি না, কিন্তু আশ্বস্তাবোধ সৃষ্টির চেষ্টায় ত্রুটি থাকে না তার। সেই চেষ্টার ধারাতেই ৪৮ঘণ্টার মধ্যে খুনীদের খুঁজে বের করার চরম আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে কয়েক 'শত ৪৮ঘণ্টা' গত হওয়ার পর হার মেনেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তার ভুলে হয়েছে। সাংবাদিকদের চাপে পড়ে ৪৮ঘণ্টার সময় বেঁধে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। যাহোক, তার বেঁধে দেয়া এই সময়ের মধ্যে খুনের রহস্য উদঘাটিত করা সম্ভব হয় নি।

আইনের হাত আর চিন্তা নির্দিষ্ট গন্তব্য তথা ঘটনার ক্লু পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না হলেও মানুষের কল্পনা শক্তি অনেক ক্ষেত্র থেকে বিচরণ করে এসেছে। কেউ কেউ এখানে অবৈধ সম্পর্কের গন্ধ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ১৩ তারিখের বিডিনিউজ টুয়েন্টফোর ডটকম সে রকম একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। ঘটনাপ্রবাহে মনে হয় হত্যাকাণ্ডের মোড় ঘুরানোর জন্যই এধরনের তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। আসলে কথা হচ্ছে, প্রেম-পরকীয়ার বিষয়টা এত ব্যাপকতা পেয়েছে যে, মানুষ এখন এটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পার পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এটাও কিন্তু কম খারাপ ব্যাপার নয়!

ঘটনা যাই হোক, হয়ত ভালোবাসা দিবসের আয়োজকরা এতে ভড়কে গেছেন। প্রেম-ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে যেখানে আবির্ভূত

হচ্ছে নিত্য হৃদয়বিদারক ঘটনা সেখানে এই শোকের মধ্যে আর দিবসটি পালন করার সাহস করেন নি। 'বিশ্ব ভালোবাসা পালন কমিটি' ১৪ তারিখে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের বুদ্ধির শুভোদয় হোক। আগত প্রতিটি ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে যেন তাদের এই শুভবুদ্ধি সক্রিয় থাকে।

কিন্তু যে পাপের দরজা তারা একবার জাতির জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সেই দরজা দিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে পাপ প্রবেশ করছে। চিনি কলের মতো। বছরে একবার চালু করে দিলে একগতিতে ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকে! নিত্য চালু করতে হয় না। ঠিক এভাবেই ভালোবাসা দিবস, উন্মুক্ত প্রেমচর্চা ইত্যাদিতে একবার গতি সঞ্চার করে দিয়ে পাপের যে যাত্রা চালু করে দেয়া হয়েছে ভালোবাসা দিবস মাত্র একবছর বন্ধ রাখলেই কি সে ধারা শেষ হয়ে যাবে?

এত সহজে যে তা শেষ হবার নয় তার প্রমাণ গত বছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারির একটি অতি মর্মান্তিক ঘটনা। সাংবাদিক দম্পতির মর্মান্তিক ঘটনার রেশ না কাটতেই দেশবাসী জানতে পারল আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনার ইতিকথা। আসলে ভালোবাসা বা ভ্যালেন্টাইন দিবসটা এসেছিল পাপের হাত ধরেই। তাই পাপ আর মর্মান্তিক উপাখ্যানের সাথে এর এত গলাগলি। গত বছরও এই দিবসকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল একটি মর্মান্তিক ঘটনা। 'ভালোবাসার নীলগোলাপ' শিরোনামে যা মুক্তবাসিনী-১ এ উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু এবারও যে এই দিনকে কেন্দ্র করে

লিখতে হবে এবং আগের চেয়েও অনেক করুণ স্বরে তা ভাবিনি কখনও।

মাত্র নবম আর দশম শ্রেণী পড়ুয়া কিশোর-কিশোরী এমন মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দিতে পারে তা ভাবার জন্য যতটুকু কল্পনাশক্তি থাকা দরকার সম্ভবত তা আমাদের অনেকেরই নেই। তাই এসব ঘটনার কথা কখনও কল্পনা করি না আমরা এমনকি সংঘটিত হওয়ার পরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আত্মহত্যার রকমফের আছে। মানুষ বহু উপায়ে আত্মহত্যা করে আল্লাহ তা'আলার দেয়া জীবনের আমানত নষ্ট করে নিজেকে অকল্যাণের পথে দ্রুত অগ্রসর করে। আত্মহত্যার যতগুলো উপায় মানুষ অবলম্বন করে সেগুলোর প্রত্যেকটির কথা হাদীসে উল্লেখ করে এরজন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

« مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِى يَدِهِ فِى جَهَنَّمَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

'যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে সেই অস্ত্র তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে সেই অস্ত্র দ্বারা চিরকাল নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। যে বিষপানে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে চিরদিন সেই বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি

পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে (-র আগুনের পাহাড় থেকে) এভাবে লাফিয়ে পড়ে পড়ে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।' [বুখারী : ৫৭৭৮; মুসলিম : ৩১৩]

আত্মহত্যার সব সংজ্ঞা ভুল প্রমাণ করে বেনযীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল দুটো পুচকে ছেলেমেয়ে। আর তা শুধুই ভালোবাসা নামের ভণ্ডামির কারণে।

ঘটনাটি গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কাঠিবাজারের। ঘটনার নায়ক-নায়িকা মিতু খানম ও সাউথ শেখ। কাঠি গ্রামের আলহাজ এনজেল শেখের ছেলে মিরপুর বাংলা এন্ড স্কুল কলেজের দশম শ্রেণীর ছাত্র সাউথ শেখের সাথে খেলনা গ্রামের মৃত জাহিদ হোসেনের মেয়ে মিতু খানমের 'দীর্ঘদিনের' প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

আচ্ছা পাঠক! আপনিই ইনসাফের সাথে বলুন তো, এই দশম শ্রেণীর দুজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 'দীর্ঘদিন' ধরে যদি প্রেমেরই সম্পর্ক থাকে তাহলে ওরা লেখাপড়ার কাজটা করেছে কখন? এ যুগে তো ছেলেমেয়েরা 'আন্ডাবাচ্চা' থাকতেই স্কুলে ছোটে। ১৪/১৫ বছরে পৌঁছে যায় নবম-দশম শ্রেণীতে। তাহলে এই শ্রেণীর এই বয়সীর দুটো ছেলেমেয়ের 'দীর্ঘদিন' যদি কাটে প্রেমের সম্পর্কে তাহলে প্রেম ছাড়া অবশিষ্ট কাটল কতদিন?

তা যাহোক, বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর কোনো পরিবারেই এটাকে পাত্তা দেয়া হয়নি এবং তাদের 'প্রেম-ভালোবাসাকে' স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। ছেলেবয়সী ছেলেমেয়েদের ছেলেখেলা বন্ধ ও তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির জন্য এক বছর আগে সাউথকে

কাঠি স্কুল থেকে সরিয়ে ঢাকার মিরপুরে ভর্তি করে দেয়া হয়। এদিকে গত ১৪ই জানুয়ারি ঢাকায় মিতুর মামা মুজিবুর রহমান শেখের বাসায় মোমেনশাহীর এক ছেলের সাথে মিতুকে বিয়ে দেয়া হয়।

এখানেই পূর্বের সম্পর্কের ছেদ পড়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রেম-ভালোবাসা উচিত-অনুচিত মানে? বিশেষ করে এই 'নাবালেগ' বয়সে? ফলে অনুচিত কাজের হাত ধরেই বিয়ের পরও বিপুল উদ্যমে চলতে থাকে তাদের ভালোবাসা। এজন্য তারা আশ্রয় নিয়েছিল মোবাইলের। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তায় ঢাকার মামার বাড়ি থেকে খেলনা গ্রামের বাবার বাড়িতে চলে আসে মিতু। এদিকে ঘটনার আগের দিন রাতে নাইট কোচ যোগে রাত দুইটার সময় কাঠিবাজারে এসে নামে সাউথ।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ভোর ৫টায় মিতু ও সাউথ স্কুলসংলগ্ন গ্রামীণফোনের টাওয়ারে ওঠে। মোবাইলে সাউথ বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলে টাওয়ারে চড়ার কথা জানায় এবং তাদের প্রেম মেনে নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে। অন্যথায় সে টাওয়ার থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলে না। সাড়া দেয়ার কথাও না। যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, অন্যের ঘর করছে তাকে নিজ স্বামীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আরেকজনের হাতে তুলে দেয়ার মতো বেইনসাফ ও নিকৃষ্ট কাজ কেউ করতেও যাবেন না।

পারিবারের তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে মিতুর পরনের ওড়না দিয়ে পরস্পরে দুইজনের হাত বেঁধে ২৮০ ফুট উঁচু টাওয়ার থেকে একসাথে লাফিয়ে পড়ে তারা। এত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে ও ফেটে যায়। স্রোতের আকারে রক্ত প্রবাহিত থাকে। বিকট শব্দে তারা মাটিতে আছড়ে পড়ে। ২৮০ ফুট উঁচু থেকে তাদের যুগল দেহ যখন মাটিতে এসে পৌঁছায় তখন পতনের বিকট শব্দ হয়। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু সহমর্মিতা দেখানো, চিকিৎসা দেয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বড্ড অসময়ে থেমে যায় দুটি স্বপ্নের উচ্ছল পথচলা। ভাঙাচোরা দেহের প্রবাহিত রক্তে গড়াগড়ি করতে থাকে দুটি কিশোরপ্রাণ। [আমার দেশ ১৫/০২/১২]

আমরা ভালোবাসার মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করি। ২৮০ ফুট উঁচু টাওয়ার থেকে হাত ধরাধরি করে লাফ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে পারি। অস্থায়ী মোহের কিঞ্চিত উম্মাদনায় কত কিছুই না করে দেখাচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা, নিখাঁদ প্রেম যেখানে করা যায়, যাদের সাথে করা যায় সেখানে কি নূন্যতম প্রেম-ভালোবাসা আমার প্রদর্শন করতে পারছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের ভালোবাসার গভীরতা কতটুকু? সাহাবায়ে কেরামের সাথে আমাদের ভালোবাসার তফাৎটা একটু পরিমাপ করে নেবো? সাহাবী আনাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ ». فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « مَا أَعْدَدْتَ لَهَا » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ إِلاَّ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ». فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحَهُمْ بِهَذَا.

জনৈক বেদুইন এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং সালাত শেষ করে বললেন, কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বললেন, এই যে আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললনে, তুমি কেয়ামত দিবসের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর জন্য দীর্ঘ সময় সালাত পড়িনি এবং তেমন রোযাও পালন করিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষ তার ভালোবাসার লোকের সাথে থাকবে। আর তুমিও যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে। আনাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথা শোনার পর মুসলিমগণ সেদিন যে পরিমাণ খুশি হয়েছিলেন, তাদেরকে আমি এর চেয়ে বেশি খুশি হতে দেখিনি কখনও। [তিরমিযী : ২৫৬০]

সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা, আবেগ-অনুভূতি আবর্তিত হতো আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ভালোবাসা-মহব্বতকে কেন্দ্র করে। আমাদের বেলায় কি তাই হয়? আমরা একই নবীর একই উম্মত নই? তাদের ভালোবাসার অন্তত দশভাগের এক ভাগ তো থাকা চাই। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

« إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا ».

‘তোমরা যে যমানায় অবস্থান করছো সে যমানায় আদিষ্ট বিষয়ের নয় ভাগ পালন করে একভাগ তরক করলেও ধ্বংস হবে। আর এমন একটি যমানা আসবে যখন মানুষ আদিষ্ট বিধানের দশ ভাগের মাত্র একভাগ পালন করলেও নাজাত পাবে।’ [জামে তিরমিযী : ২৪৩৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘গরীব’ এবং শায়খ আলবানী ‘যঈফ’ বলেছেন।]

তাহলে বলুন, অন্তত যে একভাগ পালন করলে নাজাতের ঘাটে পৌঁছতে পারব সেই পরিমাণ নবীপ্রেম দ্বারা আমরা হৃদয়কে সিক্ত করতে পারছি? নবীর ভালোবাসা কি ফরয নয়? নবীর ভালোবাসা ছাড়া আখেরাতের পরীক্ষায় উৎরানো যাবে? ভালোবাসার সবটুকু মানুষের পেছনে উজাড় করে দিয়ে রিক্তহস্তে মরুসম তৃষ্ণা নিয়ে যদি হাউজে কাউসারের সামনে হাজির হই তবে সেখানে কীসের নযরানা পেশ করব? ভালোবাসার শূন্য পেয়ালায় যে সেদিন পানি উঠবে না!

লেখাটি যেদিন লিখছিলাম সেদিনই শুনলাম আরেক লোকের ঘটনা। আকৃতি খর্ব, মুখে দুর্গন্ধ, বর্ণে কৃষ্ণ এক মহিলার প্রেমে পড়ে মুসা নামের এক যুবক দিওয়ানা হয়ে গেলো। বেশ কিছুদিন গড়ালো এই সম্পর্ক। তবে চূড়ান্ত সম্পর্ক গড়ানোর আগেই মেয়েটি পিছুটান দিলো। সে সম্পর্ককে দীর্ঘায়িত করতে নারাজ। মুসা বহুদিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে রোনাজারি করল। চাইল তাকে তার কাছে মন খুলে। তবু তার চাওয়া পূর্ণ হলো না। মেয়েটি তার কাছে ফিরে এলো না। ফলে মুসার সব রাগ গিয়ে পতিত হলো সৃষ্টিকর্তার ওপর! তিনি কেন তাকে ফিরিয়ে দিলেন না সেই রাগে তাকে অস্বীকার করে বসল সে! যাকে বলে মুরতাদ হয়ে যাওয়া। যে বুবক এক সময় তাহাজ্জুদ পড়ত সেই যুবক এখন নাকি আল্লাহ তা'আলার নামও আর কোনোদিন মুখে নিবে না!

মুসা! তুমি তোমার তাহাজ্জুদের জায়নামাজকে কেন 'তুর পাহাড়ে' পরিণত করতে পারলে না? হৃদয়ে আল্লাহর ভাষার ঝড় তুলতে পারলে না? এত কষ্ট করে যেহেতু তাহাজ্জুদের জায়নামাযে দাঁড়িয়েছই, তখন মনটাকে 'মুসার আল্লাহদর্শন'র ব্যগ্রতায় আকুল করতে পারলে না? তবে অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে, যাকে তুমি চাও আর তিনি যাকে তোমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তার মধ্যে ব্যবধান কত? আমরা হয়ত জায়নামাযে দাঁড়াই নির্দেশ পালন করে কোনো মতে দায়মুক্ত হতে, কিন্তু ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য- আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা- আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

তাই আমরা হৃদয়টাকে মানবপ্রেম দিয়ে ভরাট করে রেখে যখন জায়নামাযে দাঁড়াই তখনও দৃষ্টি থাকে বাইরে। প্রেমাস্পদের হৃদয়গলিতে চক্কর খেতে থাকে আমার মন! সালাত শেষ করে যখন উঠি তখন আমলনামায় হয়ত নিরস কয়েকটি রুকু-সিজদা ছাড়া আর কিছু লিপিবদ্ধ হয় না।

ভালোবাসাশূন্য এই ইবাদত করে যখন আমরা কাঙ্ক্ষিত জাগতিক ফল পেতে ব্যর্থ হই তখনই আল্লাহর বিরুদ্ধে খেপে যাই! কেউ বা তাকে আর ডাকবেই না বলে দাম্ভিক ঘোষণা দেয়! এই দাম্ভিক ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ইতিহাসের ব্যর্থ বণিকে পরিণিত করে। বঞ্চিত হয় প্রভুর ভালোবাসা থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ٥٤ ﴾ [المائدة: ٥٤]

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দ্বীন থেকে সরে যায় তাহলে অতিসত্ত্বর আল্লাহ তা'আলা এমন একদল সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে।' {সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৫৪}

আমরা কি তবে নারীর ভালোবাসায় পড়ে এমন সৌভাগ্যবানদের কাতার থেকে বাদ পড়ব, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন? এত বড় ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা আমরা দেখাবো?

যুগে যুগে এমন বণিক বহু এসেছে আর জীবন উপসংহারে আক্ষেপের হাত কামড়াতে কামড়াতে রিক্তহস্তে বিদায় গ্রহণ করেছে। এমনি এক ব্যর্থ বণিক হলেন জাবাল্লা ইবন আয়হাম গাস্সানী। ইসলাম গ্রহণ করার পর হজ্বের তাওয়াফ করার সময় ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার চাদর পদধূলিত করায় তিনি তাকে একটা থাপ্পড় দিয়ে নাক ফাটিয়েছিলেন এবং দুটি দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক এলাকার গভর্নর। তাই আইনের হাত থেকে ফসকে যাবেন বলে ভেবেছিলেন।

কিন্তু খেলাফতের মসনদে তখন ন্যায়-ইনসাফের জীবন্ত প্রতীক সাহাবী ‘উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু সমাসীন। তিনি মজলুম ব্যক্তিকে মাফ অথবা প্রতিশোধ নেয়ার ইখতিয়ার দিলেন। কিন্তু লোকটি দ্বিতীয়টি বেছে নেয়ায় জাবাল্লা বললেন, আমি একজন শাসক, আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ! মনে মনে একথা ভেবে একদিনের জন্য সময় চেয়ে নিলেন তিনি। এরপর চোক্ষুলজ্জার ভয়ে রাতের আঁধারে হারিয়ে গেলেন আল্লাহদ্রোহিতার চোরাবালিতে। পালিয়ে নাক আর দাঁত বাঁচাতে পারলেন বটে, কিন্তু ঈমান বাঁচাতে পারলেন না। জীবনের শেষ বেলায় এর জন্য আক্ষেপ কম করেন নি তিনি। আক্ষেপের কাব্যে কেটেছে তার অবশিষ্ট জীবন। তিনি বলেছিলেন-

تنصرت بعد الحق عاراً للطمة ... وما كان فيها لو صبرت لها ضرر

وأدركني فيها لجاج حمية ... فسيقت لها العين الصحيحة بالعور

فيالت أمى لم تلدنى وليتنى ... صبرت على القول الذى قاله عمر

‘হক (ইসলাম) গ্রহণ করার পর ঘুষি খাওয়ার ভয়ে খ্রিস্টান হলাম,

যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করতাম, তবে তাতে কীইবা ক্ষতি হতো!
কিন্তু আত্মগরিমার হঠকারিতা পেয়ে বসল আমায়
ফলে সুস্থচোখের বদলায় বক্র-কানা চোখ গ্রহণ করলাম।
হায় আক্ষেপ! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন!
কিংবা 'উমর যা বলেছিলেন তা মনেপ্রাণে মেনে নিতাম!

রক্তমাংসের ভালোবাসার টানে কি তবে আমরা আল্লাহর শাশ্বত ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবো? বঞ্চিত হবো ইলাহী 'পণ্য' থেকে?

« أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ».

'শুনে রেখো, আল্লাহ তা'আলার পণ্য অনেক মূল্যবান। শুনে রেখো, আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত। [জামে তিরমিযী : ২৬৩৮]

মুসা! প্রণয়ভঙ্গ করে ফিরে এসো আপন নীড়ে! আসমানী শামিয়ানার নিচে ভালোবাসার যে প্রস্রবণ আছে তাতে অবগাহন করো। জাবাল্লাদের খাতায় নাম লিখিয়েদের সংখ্যা আর বাড়িও না। পাছে আক্ষেপে পুড়তে হবে কিন্তু!

মানুষের স্বভাবে ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতির উপাদান আছে একথা সত্য। তাই হৃদয় ফুঁড়ে ভালোবাসার উদ্গীরণ ঘটবেই। কিন্তু তা যেন কোনো অপাত্রে না পতিত না হয় এজন্য দয়াময় আল্লাহ তা'আলা উত্তম ব্যবস্থাও প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসো, তার রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসো। মা-বাবা ও আত্মীস্বজনকে ভালোবাসো। ভাবছো এঁদের ভালোবাসায় তো আবেগ, উচ্ছায় প্রকাশ করা যায় না? শ্রদ্ধার ভাগটা বেশি থাকে। তাহলে হৃদয়ে জমাটবাধা আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে কোথায়?

কোনো চিন্তা নেই। এর জন্য আছে তোমার অর্ধাঙ্গিনী। পৃথিবীর হেন কোনো আবেগ, উচ্ছ্বাস নেই, যা তার কাছে ব্যক্ত করা যায় না। শুধু ব্যক্তই নয় বরং তাতে সওয়াবও আছে অনেক। তার সাথে হাসি-মশকরা করবে? তাতেও সওয়াব। মুখে গ্রাস তুলে দেবে? তাতেও সওয়াব। উদ্বেলিত হৃদয়ে, উচ্ছ্বসিত মনে দাম্পত্যাচারণ করবে? কপালে চুম্বন করবে? তার ত্বকে তোমার চুম্বনের স্পর্শ পৌঁছার আগেই আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে! অবাক হচ্ছো বুঝি! সত্যিই তাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দাম্পত্য সম্পর্কের মাধুর্য্য শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর পবিত্র আমলের মাধ্যমে। মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো একজন স্ত্রীকে চুম্বন করে সালাত পড়তে গেছেন। মাঝখানে অযু করেননি।’ [নাসাঈ : ১৭০, সহীহ]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আম্মাজান আয়িশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহ তা‘আলা আনহা বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ أَزْوَاجَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাওম অবস্থায় তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করলেন। এরপর (আয়িশা রাদিআল্লাহ তা‘আলা আনহা স্ত্রীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া-মমতা ইত্যাদির কথা ভেবে

এবং তিনি যে তাঁকেই চুম্বন করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে) মুচকি হাসলেন। [বুখারী : ১৯২৮]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এই পবিত্র বন্ধনকে মাধুর্য্য দান করেছিলেন। সালাতের আগেও, সাওম রেখেও স্ত্রীর সাথে যে মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক বিনিময় করা যায় তিনি সেই আদর্শই শিক্ষা দিয়েছেন এসব ঘটনায়। কে না বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এসব আমলে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ? আমরা সেই আদর্শ গ্রহণে আদিষ্ট?

তুমি নারীর সাথে খুনসুটি করতে চাও? হাসি-মশকরা করে সময়টাকে রাঙিয়ে তুলতে চাও? তবে এখানেও ইসলামের আদর্শের আশ্রয় নাও। করো এসব বিবাহিত স্ত্রী, বৈধ নারীর সাথে। প্রতি মুহূর্তে সওয়াব। কথায় কথায় সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

'তিনটি ছাড়া মানুষের সব রকমের ক্রিয়া-কৌতুক, খেল-তামাশা অবৈধ। তীর নিক্ষেপ করা, যুদ্ধের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করা এবং স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা, হাসি-মশকরা করা। কেননা এগুলো সত্য ও সওয়াবযোগ্য।' [মুসনাদ আহমাদ : ১৭৩০০]

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের মধ্যে যে ভালোবাসা দান করেছেন তা নিখাঁদ, বাস্তব ও যুক্তিনির্ভর। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم: ٢١]

'আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পাও। এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।' {সূরা আর-রূম, আয়াত : ২১}

সত্যি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা নিখাদ, অপূর্ব এবং লৌকিকতামুক্ত। আর হবেই না কেন? এই ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা! যে ভালোবাসার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সেই ভালোবাসায় রহমত থাকবে না কেন? পক্ষান্তরে মানবরচিত কৃত্রিম ভালোবাসা দেখো। অবিবাহিত একজন নারী পুরুষকে কিংবা পুরুষ নারীকে ভালোবাসার অনেক গল্প শোনাবে, স্বপ্নের তুলিতে জীবনরুমালটাকে রাঙিয়ে তুলবে। কিন্তু যখন 'চাইনিজ খাওয়ার' সময় হবে তখন কিন্তু তোমার পকেটের স্ফীতি-অস্ফীতি দেখবে না! তোমার সামর্থের বিচারও সে করবে না। এদের ভালোবাসার শুরু রূপ দিয়ে আর শেষ পকেট দিয়ে! কিন্তু তোমার স্ত্রী? সে কখনও সাধ্যের বাইরে তোমার ওপর কিছু চাপাবে না। আগে দেখবে তোমার সামর্থ্য, তারপরে তার বায়না। কয়টা বলব? প্রকৃত ও কৃত্রিম ভালোবাসার পার্থক্যের এমন হাজারও নযীর বিদ্যমান। জ্ঞানীরা তো এত নযীর তালাশ

করে না সেটা আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের শেষেই বলে দিয়েছেন-

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

‘এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন।’ {রূম : ২১}

মনে রেখো, ইসলামে কোনো সংকীর্ণতা নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ۝١٨٥ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, এবং যা কঠিন তা চান না। {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫}

তো আল্লাহ তা‘আলার বিধান যেখানে এত সহনীয়, তার বিধানের আওতায় থেকে বিনোদনেও রয়েছে প্রতিদান সেখানে আমাদের বক্রপথে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

মনে রেখো, সর্বাগ্রে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলুল্লাহকে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি শুয়ে আছেন মদীনার পবিত্র মাটিতে। কিন্তু আছেন আমাদের হৃদয়কন্দরে, যদি আমরা তা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। মুআযকে উদ্দেশ্য করে বলা তার একটি কথায় সে তথ্যই ফুটে উঠেছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি-

সাহাবী মুআয ইবন জাবাল রাদিআল্লাহু ‘আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের শাসক করে পাঠালেন এবং তাকে বিদায় জানাতে নিজে উপস্থিত হলেন। সে সময় তাকে স্বীয় উটনীর ওপর আরোহণ করালেন। দূর ইয়ামানের

উদ্দেশ্যে উটনী চলা শুরু করলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি তার সাথে চললেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন এটা হচ্ছে প্রিয় সাহাবীর সাথে তার জীবনের শেষ দেখা এবং তার এই প্রিয় শিষ্য বহুদূরে চলে যাচ্ছেন। সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের খুব কম স্থানেই আবেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাহাবী মুআয ইবন জাবাল রাদিআল্লাহু 'আনহুর সাথে তার বিশেষ মহব্বতের সম্পর্কের কারিশমা এই যে, ওই সময় তার যবান মোবারক থেকে এমন কিছু কথা প্রকাশ পেল, যাকে প্রিয় মানুষকে দূরে যেতে দেখে, উদ্বেলিত দিলের আবেগাশ্রিত দর্পণের সাথে তুলনা করা যায়। তিনি বললেন-

يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِى هَذَا، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِى هَذَا، أَوْ قَبْرِى هَذَا فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا.

'হে মুআয! আমার মনে হচ্ছে এ বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাত ঘটবে না। এরপর হয়ত তুমি আমার কবর কিংবা মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে।' সাহাবী মুআয রাদিআল্লাহু 'আনহু এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক কষ্টে নিজের আবেগ ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মোবারকে কথাটি শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। বেদনায় জারজার হলেন। তার ধারণা ছিল, এটা হয়ত এক-দেড় বছরের বিচ্ছেদ। কিন্তু সরকারে দো-আলম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথাগুলো বললেন তখন তিনি বুঝলেন, জীবিত অবস্থায় আর কখনও এমন মধুর জলওয়া (মিলনদৃশ্য) সংঘটিত হবে না। তাই তার মুখ থেকে আহ্ শব্দ নির্গত হলো। চোখ ফেটে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু করল।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখে বললেন, মুআয! কেঁদো না। এবং এ কথা বলে হয়ত আবেগ দমনের জন্য তিনি নিজেও দ্রুত মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মদীনার উদ্দেশে রোখ করার সময় বললেন- 'মুত্তাকীরাই আমার সবচেয়ে আপনজন। চাই সে যেই হোক এবং যেখানেই হোক।' [মুসনাদ আহমাদ : ২২০৫২, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৪৪৮]
অতএব, বহুদূরে থেকেও, বহু পরের মানুষ হয়েও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় হতে পারি, স্নেহভাজন হতে পারি, ভালোবাসা লাভ করতে পারি। আপন হতে পারি। আল্লাহ- আল্লাহর রাসূলের আপন হতে নির্দিষ্ট দিন লাগে না, সময় লাগে না। বছরে একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। প্রতি নিয়ত, প্রতি মুহূর্ত ভালোবাসার সময়, প্রতিটি স্থানে ভালোবাসার সময়। যদি আমরা এই ভালোবাসা মনে জন্ম দিতে পারি, বুকে লালন করতে পারি তবে আর কাউকে ২৮০ ফুট উঁচু থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে না। কোনো মুসাকে খর্বাকায় একটা মেয়ে না পেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসবে না। তখন আমার ঘর হবে ভালোবাসার মিনার,

আমার হৃদয় হবে ভালোবাসার স্তম্ভচূড়া। এসো, হৃদয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ভালোবাসার মিনার গড়ি।

বিবর্তনে বিপর্যয়

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র মাখলুক 'মানুষ' হিসেবেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই মানুষ কোনো ভিন্ন শ্রেণী বা প্রাণী থেকে বিবর্তন হয়ে এই পর্যায়ে পৌঁছেনি। অতএব, আজকে যারা মানুষ আগেও তারা মানুষ ছিল, তাদের পূর্বপুরুষ কখনও বাঁদর ছিল না। এমনকি যারা নিজেদের পূর্বপুরুষ বাঁদর ছিল বলে দাবি করে তাদের পূর্বপুরুষরাও 'স্বভাবগতভাবে' বাঁদর থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে বাঁদর ছিল না।

কথাটি এজন্য বললাম যে, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একজন ইহুদী এবং সবাই জানেন যে, পৃথিবীতে ইহুদীদের মতো এমন বাঁদরামো স্বভাবের কোনো জাতি আসেনি। আইনস্টাইন হয়ত পূর্বপুরুষদের এমন স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন এবং মানুষের মধ্যে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বপুরুষদের অনেককে বাঁদর, শূকর ও গুঁইসাপ ইত্যাদি প্রাণীতে বিকৃত করলেও তাদের বংশ বিস্তৃত হয়নি। কেননা, বিকৃত হওয়া কোনো জীব থেকে বংশ বিস্তার হয়নি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَمَّنْ مُسِخَ أَيَكُونُ لَهُ نَسْلٌ ؟ قَالَ : مَا مُسِخَ أَحَدٌ قَطُّ فَكَانَ لَهُ نَسلٌ ، وَلاَ عَقِبَ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ

‘উম্মে সালামা রাদিআল্লাহ তা‘আলা আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, যে সব প্রাণীর চেহারা বিকৃতি ঘটেছে তাদের কি বংশ বিস্তার ঘটেছে? জবাবে তিনি বললেন, যারা বিকৃতির শিকার হয়েছে তাদের বংশ বিস্তার ঘটেনি এবং তাদের কোনো উত্তরসূরীও নেই।’ [মুসনাদ আবী ইয়ালা : ৬৯৬৭, যঈফ।]

কিন্তু মানুষ নির্বোধের মতো তার এই তত্ত্বকে পৃথিবীর সুন্দরতম তত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করেছে! অবশ্য সৃষ্টিগতভাবে মানুষের দেহাবয়বের বিবর্তন ঘটে না বটে কিন্তু মানসিকতায় বিবতর্ন ঘটে অতি অবশ্যই। সেই বিবর্তন থেকেই বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটে, বিপ্লব ঘটে, ইতিহাস রচিত হয়, ট্রাজেডি ঘটে, মর্মান্তিক আখ্যান রচিত হয়, স্বাধীনতা অর্জিত হয়, স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, জাতির অগ্রগতি সাধিত হয়, জাতি পশ্চাদপদতার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

মোটকথা, মানসিক বিবর্তন ও চিন্তাগত পার্থক্যের কারণেই জাতির সফলতা ও ব্যর্থতার গতিপথ নিরূপিত হয়। ইতিহাসের বড় বড় ট্রাজেডি আর মর্মান্তিক ঘটনার জনক কিন্তু এই মানসিক বিবর্তন। বিবর্তিত মানসিকতাই ঠিক করে এই জাতি কোন পথে চলবে এবং জাতির মানসিকতায় যখন স্বাধীনতার মর্যাদা সমুন্নত থাকে, স্বাধীনভাবে বাঁচতে পছন্দ করে তখন তারা স্বাধীন জাতি হিসেবেই বাঁচতে পারে। আর যখন গোলাম জিঞ্জির থোরাই কেয়ার করে তখন পরাধীনতা তার ভাগ্যলিখন হয়ে যায়।

মানসিক বিকৃতির কারণেই আমরা আমাদের অনেক সম্পদ হারিয়েছি, পৃথিবীর জান্নাত বহু দেশ হারিয়েছি, ঐতিহ্যমণ্ডিত অনেক জনপদ হাতছাড়া করেছি। যে স্পেন মুসলিমদের রত্ম আর গৌরবের প্রাণকেন্দ্র ছিল আজ তা কেবলই স্মৃতি। স্পেনের আজকের পরিস্থিতি দেখে মনেই হয় না যে এই দেশটি দীর্ঘ আটশত বছর মুসলিমরা শাসন করেছিলেন। এখানে জন্ম নিয়েছিলেন ইমাম কুরতুবী, ইমাম ইবন আব্দুল বার রহ., ইমাম ইবন হাযম রহ., বিখ্যাত কবি মুহাম্মাদ ইবন কিন্দী প্রমুখের মতো ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিবর্গ।

আলহামরা রাজপ্রাসাদ আজ হাজার ক্রুসের মধ্যেও ইসলামী কারুকার্য ও স্থাপত্যশিল্পের ভূবন মাতানো নিদর্শনের রাজসাক্ষী হয়ে সমহিমায় দণ্ডায়মান। কিন্তু এর এই নিরহ ও নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কারণ বৈকি। আজ সেখানকর মিনারগুলো থেকে আযানের মধুর ধ্বনি উচ্চকিত হয় না, মসজিদগুলো মুখরিত হয় না মুসল্লিদের আনাগোনায়। এক সময় এখানে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ এবং হাজার রকমের ইলম ও দ্বীনচর্চার মেলা বসত। ইলমী নববীর বাজার গরম থাকত। কিন্তু আজ! আজ সেখানে বসে জুয়ার মেলা, খেল-তামাশার মেলা!

শুধু স্পেন নয় এবং স্পেনের দুয়েকটি উপমা নয়। এরূপ আরো অনেক রাষ্ট্র হাতছাড়া হওয়ার এবং বহু ইসলামী ঐতিহ্য ম্লান হওয়ার দুঃখজনক ইতিহাস আছে। সেগুলো স্মরণ করতে চাই না, স্মরণ করতে গেলে বুক ফেটে কান্না আসে।

এই বিপর্যয় কিন্তু মানুষ বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়নি। বরং মানসিকতার বিলুপ্তির কারণে সংঘটিত হয়েছে। মানসিকতায় যখন পরিবর্তন এসেছে, মানসিকতার বিকৃতি ঘটেছে, সুন্দর মানসিকতায় কুৎসিতরূপ বাসা বেঁধেছে তখন একে একে বিপর্যয় নেমে এসেছে। আজ আমরা সেই মানসিক বিকৃতির শিকার। বিভিন্ন স্থান থেকে ভয়ানক সব তথ্য আসছে আমাদের কাছে। বিস্মিত হচ্ছি আর ভয়ে শিউরে উঠছি।

আচ্ছা বলুন তো, আজকাল কি আমাদের এই মুসলিম দেশটিতে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার লোকের অভাব আছে? নাস্তিক-মুরতাদ আর পশ্চিমাদের দালালরা জাহান্নামটাকে বলতে গেলে পুরোটাই বুকিং দিয়ে রেখেছে! জাহান্নামে জায়গারও অভাব নেই, যাওয়ার লোকেরও অভাব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾ [هود: ١١٩]

'আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। জাহান্নাম পূর্ণ হবে জিন এবং ইনসান দ্বারা।' {সূরা হূদ, আয়াত : ১১৯}

কিন্তু একজন নামাযী ব্যক্তি হয়ে, 'ইসলামী মাইন্ডের' লোক হয়ে জোর করে সেখানে যাওয়ার এত গরজ কেন? কেন আমাদের তৎপরতা থেমে নেই? আল্লাহর সাথে, আল্লাহর বিধানের সাথে নাফরমানী করে, ধৃষ্টতা দেখিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত জাহান্নামে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করছি! তবে আমরাও কি আমাদের প্রিয়ভূমি বাংলাদেশটাকে হারানো ঐতিহ্যের দেশে পরিণত করতে চলেছি?

আমাদের মানসিক বিকৃতি ও পরিবর্তন কি তবে আমাদের স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য ধ্বংস করে দেবে? নাস্তিক-মুরতাদদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরাও আমাদের দেশটাকে ইসলাম শূন্য করতে মরিয়া হয়ে উঠেছি?

ঘটনাটা উত্তরা মডেল কলেজের। এটি ঢাকার নামকরা কলেজের একটি। আমেরিকানরা সেই ১৯৪২ সালে জাপানের ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু জাপানীরা আজও তার দায় চুকাচ্ছে। এখনও অনেক শিশু বোমার প্রভাবে বিকলাঙ্গ কিংবা প্রতিবন্ধি হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এতদিন পরেও আমেরিকানদের ছোঁড়া বোমার বিষক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কিন্তু আমেরিকা জাপানের যে ক্ষতি না করতে পেরেছে বৃটিশরা ভারত উপমহাদেশ থেকে বিদায় নেয়ার সময় তার চেয়েও বড় ক্ষতি করে গেছে আমাদের।

সহশিক্ষা নামের যে বিষবৃক্ষ তারা এখানে রোপণ করে গেছে হয়ত কেয়ামত পর্যন্তও তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে না। এই একটিমাত্র বিষের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হবে আমাদের দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্য, নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং হাজারও অনাচার। একে কেন্দ্র করে ভেঙে চূরমার হয়ে যাবে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য, বাড়তে থাকবে যেনা-ব্যভিচার, সংঘটিত হবে নারীঘটিত নানা রকম অপরাধ। এই বাস্তবতা আমাদের সামনে, নিজ চোখে আমরা দেখতি পাচ্ছি এসবের আলামত।

তো সহশিক্ষার বিষে এমনিতেই যেখানে আমাদের ঐতিহ্য বেদনায় নীল হয়ে আছে সেখানে কাঁটা গায়ের ওপর নূনের ছিঁটার মতো কাজ করছে পর্দাবিরোধী নানা তৎপরতা। এই কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব বোরকা পরিহিত ছাত্রীদেরকে কলেজে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ২৯ ফেব্রুয়ারির। কয়েকজন ছাত্রী বোরকা পরে কলেজে যাওয়ায় তিনি তাদেরকে ডেকে বোরকা পরতে বারণ করেছেন এবং কলেজের দারোয়ানদের আদেশ দিয়েছেন যাতে বোরকা পরিহিত কোনো ছাত্রী কলেজে ঢুকতে না পারে।

এ বিষয়ে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে অধ্যক্ষ বিগ্রেডিয়ার গোলাম হোসেন বলেন, স্কুলের একটা ড্রেসকোড আছে। এটা সবাইকে মানতে হবে। এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বোরকা অ্যালাউ করা সম্ভব নয়।' তিনি লম্বা বোরকাকে 'অড' বা দৃষ্টিকটু ড্রেস হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একটি মেয়ে এ বিষয়ে জোরালো আপত্তি করেছে। সে পায়ের নখ পর্যন্ত বোরকা পরে এসেছে। এটা দৃষ্টিকটু। তার বোন এসেছিল সঙ্গে, সে খুব গোঁড়া। সে বলছে তার বোন এই বোরকা পরেই পরে আসবে। আমরা এটা অ্যালাউ করতে পারি না। তাই তাকে ক্লাসে ঢুকতে দেয়া হয় নি।' শুধু এখানেই থামেন নি তিনি। সামনের ভর্তির মৌসুমে বোরকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নির্দেশনা জারি করবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন! কী ভয়ানক ব্যাপার! একটি মুসলিম দেশের একজন

মুসলিম নারী বোরকা পরে কলেজে আসবে সেই সুযোগও নাকি তাকে দেয়া হবে না! বোরকা নাকি দেখতে দৃষ্টিকটু!

অধ্যক্ষ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই স্কুলের অন্য একছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তো যে ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ছেড়ে তার সম্ভ্রমহানী করা হয়েছে তার সম্ভ্রম রক্ষায় আপনি কী করেছিলেন? নাকি সেটা খুব দৃষ্টিমধুর ছিল? পর্দা করা দৃষ্টিকটু, আর পর্দা না করার কারণে সম্ভ্রমহানী হওয়া দৃষ্টিমধুর! একটি ছাত্রীর ইজ্জত আর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেন না, কিন্তু কেউ নিজ থেকে সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করলে তাতে বাধ সাধেন? বুঝি একেই বলে 'ভাত দেয়ার মুরোদ নেই, কিলের বেলায় গোঁসাই!

আপনি বলেছেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরকা দৃষ্টিকটু লাগে তাই কোটের মতো বোরকা পরার অনুমতি দিয়েছি! নারীরা কোন ধরনের বোরকা পরবে সেটা নিরূপণ করার আপনি কে? স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তো সেটা কুরআনে বাতলে দিয়েছেন! তিনি আদেশ দিয়েছেন-

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّۚ ٥٩ ﴾ [الاحزاب: ٥٩]

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন চাদর তাদের ওপরে টানিয়ে দেয়।' {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৯}

চাদর বা বোরকায় দেহের কতটুকু আবৃত করতে হবে তা মুফাসসির, ফকীহ ও ইসলামী মনীষাগণ স্পষ্টাকারে উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন-

أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِنَّ بِالْجَلاَبِيبِ ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً.

'আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে চাদর বা বোরকার মাধ্যমে সারা শরীর এবং মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর দেখার জন্য একটিমাত্র চোখ খোলা রাখার অবকাশ আছে।' [তাফসীরে তাবারী : ১৯/১৮১]

তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মোটা একটি চাদর নিয়ে বাম চোখ ছাড়া সারা শরীর আবৃত করে বললেন, কুরআনে এভাবে চাদর টেনে দেয়ার কথ বলা হয়েছে। আবূ বকর ইবনুল আরাবী রহ. বলেন-

تُغَطِّي بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إِلَّا عَيْنُهَا الْيُسْرَى

অর্থাৎ সারাশরীর তো আছেই, বাম চোখ ছাড়া গোটা মুখও ঢেকে রাখতে হবে। [আহকামুল কুরআন ইবন আরাবী : ৬/৪৪৪]

অধ্যক্ষ সাহেব মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বোরকাবৃত করাকে দৃষ্টিকটু বলেন, অথচ কুরআনের বিধানই হচ্ছে এরূপ-

ومن الأدلّة القرءانيّة على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}، فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى: {يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}: أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها، وممن قال به: ابن مسعود، وابن عباس، وعبيدة السلماني وغيرهم

'নারীদের সমস্ত শরীর এবং মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ফরজ হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আলোচ্য আয়াত। আহলে ইলম বলেন, নারীরা চাদর টেনে দেবে কথাটির অর্থ হচ্ছে তারা সমস্ত দেহ এবং পুরো মুখ আবৃত করবে এবং দেখার জন্য একটিমাত্র চোখ ছাড়া আর কোনো অংশ উন্মুক্ত রাখবে না। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, উবায়দা সালমানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমূখ বিখ্যাত সাহাবী ও ফকীহগণ এরূপ বলেছেন। [আজওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআন : ৬/২৪৩]

আয়ছারুত তাফাসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে-

الغَايَةُ مِنْ ذَلِكَ التَّسَتُّرُ

'এই নির্দেশের আসল কথা হচ্ছে, পূর্ণরূপে পর্দা করা।'

তো কুরআন যেখানে সারা শরীর আবৃত করার আদেশ দিয়েছে সেখানে অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে তা দৃষ্টিকটু লাগে! তিনি কোটের মতো বোরকা পরার অনুমতি দেন? আল্লাহর ওপর খোদকারী করে তিনি এখন পর্দার মাপকাঠি বাতলাচ্ছেন? এই কোটের মতো বোরকা পরে লাভ কী? তাতে তো নারীদেহ আরও স্ফীত দেখায়, পুরুষদের লালসা তীব্র করে! তিনি কি তবে নিজের অগোচরেই নারীদেহকে পুরুষদের লালসা বৃদ্ধিতে উস্কে দিতে চান?

এ পর্যন্ত এসে সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে অধ্যক্ষ সাহেব যে কথাটা বলেছেন তা শুনে হোঁচট খাওয়া নয়, যেন ভিমরিই খেলাম! তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘পর্দার বিরুদ্ধে যাবো কেন? আমি হাজী সাহেব মানুষ, পাঁচওয়াক্ত সালাত পড়ি, বাড়িতে নারীরা বোরকা পরিধান করে।’

হাজী সাহেব! হজ্ব করতে গিয়ে ইহরামের যে সাদা কাপড় পরিধান করেছিলেন সেটা কার নির্দেশে পরেছিলেন? যিনি ইহরামের কাপড় পরিধান করার আদেশ দিয়েছেন তিনিই কি পর্দা করার আদেশ দেননি? ওই নির্দেশ পালন করতে পারলে এই নির্দেশের অসম্মানী করলেন কেন? আল্লাহ তা‘আলার সব বিধান মনেপ্রাণে সম্মান ও পালন না করা ছাড়া কি কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে?

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ۝٢٠٨ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০৮}

একজন নামাযী ব্যক্তি আর হাজী সাহেবের মানসিক এই বিবর্তন কিন্তু আমাদের জন্য কম আতংকের কারণ নয়। লেবাস-পোশাকে ঠিক থেকে মানসিকতায় পরিবর্তন হওয়াই কিন্তু বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। বাইরে ইসলামের রূপ ধারণ করে ভেতরে ভেতরে ইসলামের প্রতি অসম্মান আর অশ্রদ্ধা করার কারণেই

অতীত যুগে মুসলিম বিশ্বে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আমাদের শিক্ষামহল থেকেই কি তবে সেই ধারার সূচনা হতে যাচ্ছে?
একজন নারী আল্লাহর বিধান পালন করলেই সে গোঁড়া আর আপনার চোখে ধিকৃত হয়ে গেল? একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলাম ছাড়াও পৃথিবীতে আরও বহু ধর্মের অস্তিত্ব আছে এবং প্রায় প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব রীতিনীতি আছে। সে সব ধর্মাবালম্বীরা তাদের নিজস্ব রীতিনীতি পালন করে থাকে। কই, কেউ তো সেসব রীতিনীতি পালনের কারণে তাদেরকে গোঁড়া বলে না? শিখরা যে কোনো অনুষ্ঠানে তাদের ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ি পরে হাজির হয়, এমনকি ভারতের শিখ ক্রিকেট খেলোয়াড় হরভজন সিং মাঠে ইয়া বড় পাগড়ি নিয়ে হাজির হয়, তাকে তো বলা হয় না যে, মাঠের পরিবেশের সাথে এই পোশাক মানানসই নয়, তাই তোমাকে মাঠে ঢুকতে দেয়া হবে না!
বৌদ্ধরা লালচাদর পরে সব জায়গায় চলাফেরা করে, তাদের তো তাদের ধর্মীয় পোশাক পরিধানের কারণে গোঁড়া বলা হয় না এবং তাদেরকে এই পোশাক পরিহিত অবস্থায় কোথাও ঢুকতে বাধা দেয়া হয় না! যত বাধা আর আপত্তি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জন্যই? তবে কি নিজদেশে মুসলিমরা পরদেশী হতে চলেছে? মাননীয় আদালত! স্বপ্রণোদিত হয়ে রায় দিয়েছিলেন কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না বলে। কিন্তু এর সাথে আরেকটু যোগ করেন না কেন যে, কেউ বোরকা পরতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া যাবে না?

কিছুদিনের জন্য ফয়সালা আর রায় দেয়ার ক্ষমতা পেলেন বলে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে গেলেন। কিন্তু যেদিন আল্লাহ তা'আলার আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালত থাকবে না এবং অপরাধ করে কেউ পার পাবে না সেদিন তার কাছ থেকে কীরূপ ফয়সালা আর রায় প্রত্যাশা করবেন আপনি? ভুলে যাবেন না যে, আর সব করা যায় কিন্তু আল্লাহর ওপর খোদকারী করে কখনও রেহাই পাওয়া যায় না!

বদলে দেয়ার স্লোগানের অন্তরালে

বেশ কয়েক বছর ধরে দেশে সুশীল সমাজ নামের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে কোন্ সংজ্ঞার ভিত্তিতে এবং কোন দৃষ্টিকোণে এই গোষ্ঠী নিজেদেরকে সুশীল হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করেন, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে উপাধিটা যে শ্রদ্ধার পর্যায়ে থাকেনি সেটা বলাই বাহুল্য। অনেকেই এখন শব্দটার কথা শুনে মুখ টিপে হাসেন এবং বিদ্রূপ করেন।

তবে দেশের একটি শক্তিশালী মিডিয়াগোষ্ঠী যে সুশীল উপাধিটা ধারণ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে সেটা কারও অজানা নয়। এই গোষ্ঠী বেশকিছু দিন ধরে বদলে দাও বদলে যাও-এর স্লোগান দিয়ে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার তৎপরতা দেখিয়ে যাচ্ছে। আসলে তারা কী বদলে দিতে বলে এবং বদলে গিয়ে কীসের রূপ ধারণ করতে হবে সেটা কখনও স্পষ্ট করে বলেনি। শ্লোগানের চাণক্যে তারা অনেক দিনই নিজেদের আসল চেহারাটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু শিয়াল যেমন অপর শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক শুনলে আর স্থির থাকতে পারে না, গুহা থেকে বের হয়ে আসে, ঠিক তদ্রূপ এই গোষ্ঠীও বেশিদিন নিজেদের মুখোশটা আড়াল করে রাখতে পারেনি। কথায়, কর্মে তাদের উদ্দেশ্য ও আসল চরিত্র প্রকাশিত হয়েই গেছে। এই গোষ্ঠীর পথিকৃত মতিউর রহমান বিভিন্নভাবে

ডিগবাজি খেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রথম আলোতে এসে থিতু হয়েছেন। প্রথম আলো পত্রিকাটির প্রথম কৌশল ছিল প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা।

তারা বোধ হয় দেশের মানুষকে ঝালিয়ে নেয়ার জন্য জেনেশুনেই এই কৌশল অবলম্বন করে থাকবে। কিন্তু এদেশের ইসলামপ্রিয় মানুষ তাদের সেই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলতে সময় নেয়নি। তাদের অপকৌশলেকে ধিক্কার জানিয়েছে, থুথু নিক্ষেপ করেছে। এরা সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেয়েছিল ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। জরুরী অবস্থার এই সময়ে লগি-বৈঠার বাহকরা যখন তাদের নেত্রীকে জেলখানায় যেতে দেখেও আর্মির রাইফেলের বাটের ভয়ে টু শব্দটিও করেনি সে সময় ইসলামের বাহকরা নবীর ভালোবাসায় কীভাবে উৎসর্গিত হতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছে।

তারা নবীর সম্মান রক্ষা এবং বেয়াদবদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে নিষিদ্ধ রাজপথে নবীপ্রেমের নযরানা পেশ করেছে। আর তা ঘটেছে এই মতিউর রহমান তথা সুশীল সমাজের লোকদেরকে কেন্দ্র করেই। সে সময় প্রথম আলোর ফান ম্যাগাজিন আলপিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রদর্শিত একটি ধৃষ্টতায় এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ জরুরী অবস্থা থোরাই কেয়ার করে রাজপথে নেমে আসে এবং নবীপ্রেমের উত্তাল বিক্ষোভে রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রথম আলোরা ভাবতেই পারে নি যে, জরুরী অবস্থার এই নাযুক এবং ভীতিকর পরিস্থিতিতে মানুষ

এভাবে রাজপথে নেমে আসতে পারে। কিন্তু ওরা তো আর জানে না, এটি নবীপ্রেমিকদের খুব সামান্যই নজরানা। তারা প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহপ্রেমে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। ঘামে নয়, রক্তে রাজপথ সিক্ত করতে পারে।

নবীপ্রেমিকদের সেই অকুতোভয় দৃঢ়তা দেখে প্রথম আলো গোষ্ঠী ভড়কে যায় এবং প্রকাশ্যে বায়তুল মুকাররামের তৎকালীন খতীব মাওলানা উবায়দুল হক রহ.-এর হাতে ক্ষমা ভিক্ষা নিয়ে কোনো মতে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়। সে সময় তারা প্রকাশ্যে এবং পত্রিকায় একথা ঘোষণা দেয় যে, ভবিষ্যতে আর কখনও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু লিখবে না। কিন্তু যাদের লক্ষ্যই হচ্ছে এদেশ থেকে ইসলামী আদর্শের বিচ্যুতি ঘটানো তারা বসে থাকে কী করে? তাই সদর দরজা ছেড়ে এবার খিড়কী পথে অগ্রসর হয় তারা। সতর্ক হয়ে তারা ভিন্ন একটা কৌশল অবলম্বন করে।

বলতে গেলে তখন থেকেই 'বদলে যাও, বদলে দাও-এর স্লোগানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে সময় এর অন্তর্নিহিত অর্থ ততটা স্পষ্ট না হলেও ক্রমেই আজ তা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

মিডিয়ার প্রভাব একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা। একটি অসত্য তথ্যকেও মিডিয়ার অব্যাহত প্রচারণায় সত্য হিসেবে গিলানো সম্ভব এবং বিশ্বজুড়ে এভাবেই মিডিয়ার অপব্যবহার দেখে আসছি আমরা। বিশ্বের ইহুদী-খ্রিস্টান গোষ্ঠী নিজেদের আদর্শ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গলধঃকরণ করাতে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে কাজ করা যাচ্ছে। আর এটা করতে গিয়ে মিডিয়ায় সত্যকে মিথ্যা এবং

মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিচ্ছে তারা। প্রথম আলোদের গোড়া ঠিক কোথায়, সেই তথ্য উদ্ধার করতে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, স্বয়ং মিডিয়ার ঘাঘুজনেরাও হিমশিম খান।

কিন্তু গোড়াটা যে অনেক গভীরে প্রোথিত এবং সেখানকর রসে সিক্ত হয়েই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে তাতে কারো সন্দেহ নেই। ফলে বায়তুল মুকাররামে সেই ঘোষণার পর তাদের প্রতিশোধপরায়ণতা এবং জিঘাংসা বেড়ে যায়। এই স্লোগানের অন্তরালে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং ইসলামের শাশ্বত আদর্শে ফাটল ধরানোর কাজ শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে ইসলামের স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে সুক্ষ্মভাষায় তীর্যক মন্তব্য করতে থাকে। বিশেষ করে ফাতাওয়ার বিরুদ্ধে।

দেশের কোথাও গ্রাম্য মোড়ল বা সাধারণ মাতব্বরদের দ্বারা বিচার-আচার হলে সেটাকে ফাতাওয়াবাজি বলে প্রচারণা চালায় এবং এভাবে মানুষের মধ্যে ইসলামী বিধান ও ফাতাওয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে ইসলামী আদর্শের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। অথচ ফাতাওয়া হচ্ছে ইসলামী আইন। আর ইসলামী আইনের প্রতি যদি মানুষের বীতশ্রদ্ধ ভাব সৃষ্টি হয় তবে এমনিতেই এক সময় ইসলামের প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি হবে।

শুধু এখানেই থেমে থাকেনি তারা। আমাদের দেশের মানুষের ইসলামী আদর্শ ও সামাজিক সাংস্কৃতির বিরুদ্ধে অতি সুক্ষ্মভাবে লড়াই শুরু করেছে তারা। ঘটনাটা হচ্ছে, দেশে হরহামেশা

নারীঘটিত বিষয় নিয়ে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং গ্রাম্য মাতব্বর বা এলাকার গণমান্য বক্তিরা তাদের নিজস্ব বুঝ মোতাবেক এর বিচার-আচার করে থাকে। এমনি একটি ঘটনা। নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার মিরাট উত্তরপাড়া গ্রামে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে একই গ্রামের মেছের আলীর ছেলে আব্দুল মতীন (২৫) প্রতিবেশি ভ্যানচালক খোরশেদ আলমের অনুপস্থিতিতে তাদের শয়নকক্ষে ঢুকে খোরশেদের স্ত্রী আকলিমা (২৭) এর সাথে গল্পগুজবে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে তাকে নির্জনে একা পেয়ে ধর্ষণের প্রয়াস চালায়। এ সময় গৃহবধূ চিৎকার দিলে বাড়ির আশেপাশের লোকজন আব্দুল মতীনকে আটক করে এবং রাতভর তাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখে।’

এরূপ একটি ঘটনায় ওই নারীপুরুষের জন্য প্রথম আলোর দরদ উপচে ওঠে। কেন আব্দুল মতীন আকলিমার সাথে অবাধে মিলিত হতে পারবে না, গ্রাম্য লোকেরা তাদের বাধা দেবে এই প্রশ্নে তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। বিবাহিত নারীর সাথে একজন পুরুষ কেন অবাধে মিলতে পারবে না- এই প্রশ্নে এদেশের মানুষের প্রতি, মানুষের ইসলামী ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তারা উষ্মা প্রকাশ করে। আর অতি সুক্ষ্মভাবে তারা ব্যভিচার ও পরকীয়াকে উৎসাহিত করে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে ‘ফতোয়াবাজি অব্যাহত, পুলিশকে সংবেদনশীল হতে হবে’ শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে

তারা এই ঘটনার জের ধরে লেখে-‘এই ঘটনা এই বাস্তবতা সামনে আনে যে, বিবাহিত নারীদের সঙ্গে পরপুরুষের মেলামেশা সহজভাবে দেখা হয় না। এর মূলে রয়েছে কুসংস্কার, সামাজিক অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরায়িত বিদ্বেষ।

নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মানের চোখে না দেখতে পারার যে সীমাবদ্ধতা, সেখান থেকেই এ ধরনের অনাচারের উদ্ভব ঘটেছে। অসামাজিকতার সংজ্ঞা অভিযুক্তরা ব্যক্তিরা নিজেরাই তাদের উর্বর মস্তিষ্ক দিয়ে নির্ধারণ করেন। ভদ্র মহিলার স্বামী যেখানে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় আপত্তি তোলেননি, সেখানে তথাকথিত মাতবরেরা গায়ে পড়ে ঝামেলা পাকিয়েছেন, আইন হাতে তুলে নিয়েছেন।’ [সম্পাদকীয় দৈনিক প্রথম আলো ২৫/০২/১২ইং ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ০৭/০৩/১২ইং]

অর্থাৎ একজন পরপুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে মেলামেশার কারণে গ্রামের মুরুব্বীরা কেন সেটার বিচার করল, তাদেরকে সতর্ক ও শাসন করল সেটা মতিউর রহমানরা মেনে নিতে পারছেন না। এজন্য রীতিমতো ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করে সম্পাদকীয়র মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেই ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন!

এই সম্পাদকীয়র মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মতিউর রহমানরা ঘোষণা দিয়েই ব্যভিচারকে জাতীয়করণ করার কাজে নেমে গেল! এভাবে ইসলামের বিধানকে কুসংস্কার, সামাজিক অনগ্রসরতা, অশিক্ষা

এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরায়িত বিদ্বেষ বলে জঘন্যতম মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। প্রথম আলোর এই মন্তব্য পরকীয়াকে বৈধতা দেয়ার স্পষ্ট সাজেশন। নিজের স্ত্রীকে আরেক পুরুষের বাহুডোরে এগিয়ে দেয়ার উদাত্ত আহবান বৈ কিছু নয়।

বস্তুত ওরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অন্যের বাহুডোরে আবদ্ধ হতে দেখেও হয়ত চোখ বন্ধ করে থাকবে, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করবে না। কিন্তু একজন মুসলিম এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনই তা মেনে নিতে পারে না। তবে কি একেই বলে সুশীল সমাজ? এই কাপুরুষতা আমদানীর জন্যই তারা সুশীল তকমা গায়ে এঁটেছেন!

নির্লজ্জতা আর বেহায়াপনার সব স্তর অতিক্রম করে প্রথম আলো গোষ্ঠী। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে লিখেছে- 'ভদ্র মহিলার স্বামী যেখানে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় আপত্তি তোলেননি...' বলে যে লোকটির পক্ষে সাফাই গেয়েছে তারা সেই লোকটিই কিন্তু সুযোগ বুঝে আকলিমাকে ধর্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছে। নির্জনতার পরে ধর্ষণের প্রয়াস আসুক বা নাই আসুক সেটাকেই এভাবে প্রশ্রয় দিতে হবে! বন্ধুর আপত্তি না থাকলেই সেখানে এরূপ নির্জন অভিসার জায়েয হয়ে যায়? তবে কি তাদের ভিতরের পৃষ্ঠাগুলো এমনই। তারা তাদের নিজস্ব আচারকে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়?

কী অদ্ভুত ও ভূতুড়ে ব্যাপার! একজন বিবাহিত নারীর সাথে পরপুরুষ অবাধে মেলামেশা করবে আর সেটা বাধা দেয়া যাবে না, শাসন করা যাবে না? শাসন করলে সেটা অসামাজিক কাজ হয়ে যায়? মানুষ এই অসামাজিকতা নির্ণয় করেছে নিজেদের মস্তিষ্ক দিয়ে? অথচ অশ্লীলতা আর পাপাচারের বিরুদ্ধে এ সমাজের এই অবস্থান কারো বিকল মস্তিষ্ক দিয়ে সৃষ্টি হয়নি। আবহমানকাল ধরে চলে আসা ইসলামী ঐতিহ্যে লালিত সভ্যসমাজেরই অপরিহার্য অংশ এই নৈতিকতা। এই আদর্শ এসেছে মানবতার মুক্তিরদূত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনিই স্পষ্ট ভাষায় বিবাহিত নারীদের সাথে এভাবে মেলামেশাকে চরম গর্হিত অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেছেন-

عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

সাহাবী আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু স্বীয় ভৃত্যকে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুর কাছে পাঠালেন তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহার নিকট প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য। ভৃত্য প্রয়োজন পূর্ণ করে মুনিব আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার স্ত্রীর নিকট যেতে বারণ

করেছেন।' [জামে তিরমিযী : ২/১০৬; মুসনাদে আহমাদ : ১৭৮৩৮; সুনানে কুবরা : ১৩৯০৩]

পরনারীর সাথে মেলামেশার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান স্পষ্ট। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'দুইজন গায়রে মাহরাম নারীপুরুষ যখন একত্রিত হয় তখন তাদের তৃতীয়জন থাকে শয়তান।' অর্থাৎ শয়তান সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে পাপকর্মে উৎসাহিত করে। আর এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অধিকাংশ নারী মুখরা ও প্রগলভ স্বভাবের হয়ে যায়। একান্ত ব্যক্তিগত ও দাম্পত্যসুলভ কথাও অন্যের কাছে অনায়াসে ব্যক্ত করে। ফলে এমন এক দুর্বলতম সময়ে দুইজন বেগানা নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশা কখনই মেনে নেয়া যায় না। এর পরিণতি কখনই শুভ হয় না।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরুষরা সাধারণত নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। আর খুব সাধারণভাবেই তখন পুরুষরা উক্ত নারীকে কৌশলে স্বামীর ব্যাপারে একটা নেতিবাচক ধারণা ঢুকিয়ে দেয়। কখনও স্বামীর কোনো দুর্বলতা থাকলে তা তার সামনে তুলে ধরে। এটা অত্যন্ত জঘন্য একটা প্রয়াস। এভাবে বহু সংসার ভাঙে, সমাজে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। ফেতনা-ফাসাদের সয়লাব হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে এধরনের লোক তার উম্মত নয় বলে কঠোর ধমকি দিয়েছেন।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

'যে ব্যক্তি অপরের স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিগড়ে দেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।' [সহীহ ইবন হিব্বান : ৪৩৬৩]

যদি ধরেও নেয়া হয় যে, একজন বিবাহিত নারীর সাথে একজন পরপুরুষের অবাধ ও নিরিবিলিতে মেলামেশাতে খারাপ নিয়ত থাকে না (কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়), তথাপি শরীয়ত তাদেরকে এভাবে মিলিত হওয়ার অধিকার দেয় নি। ইসলামী ইতিহাসের সর্বোচ্চ সুন্দর যুগের একটি ঘটনা বলি। ঘটনাটি মুসলিম জাতির মা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দুই স্ত্রী এবং একজন অন্ধ সাহাবীর। ঘটনাটির ভাষা নিম্নরূপ :

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى ، لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا ؟ قَالَ : أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟.

আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন সাহাবী উম্মে সালামা ও মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহ তা'আলা

আনহু সেখানে আগমন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পর্দা করার আদেশ দিলেন। জবাবে উম্মে সালামা রাদিআল্লাহ তা‘আলা আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কি অন্ধ নন? আমাদেরকে চেনেনও না দেখেনও না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না? [মুসনাদ আহমাদ : ২৭০৭২; সুনানে আবূ দাউদ : ৪১১৪]

দেখুন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, উম্মতের মা জননী। যাদের মনে বিন্দু পরিমাণ পাপচিন্তার উদয় হওয়া এবং যাদের ব্যাপারে অণু পরিমাণ পাপচিন্তার উদ্রেক হওয়া সাহাবীর পক্ষে অসম্ভব এবং সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত আর সাহাবীটিও অন্ধ, সেই পরিস্থিতিতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর নারীপুরুষের পারস্পরিক একত্রিত হওয়াকে কত কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন! কিন্তু মতিউর রহমানদের মুখে আজ এ কী শুনছি? তাদের দৃষ্টিতে অবাধে, নিরিবিলিতে পর নারী-পুরুষের মিলিত হওয়া অপরাধ নয়! বরং বাধা দেয়া অপরাধ! অনগ্রসরতা, অসামাজিকতা?

স্বীয় স্ত্রীর ব্যাপারে একজন পুরুষের কী পরিমাণ গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ থাকা দরকার তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করি। ঘটনাটি আজ থেকে বহুদিন আগের। ৮৬ হিজরীর ঘটনা। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ রহ. বলেন, আমি রায় এলাকায়

কাজী মুসা ইবন ইসহাকের নিকট উপস্থিত হলাম। সে সময় জনৈক মহিলা আদালতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মহরের পরিমাণ নিয়ে মামলা দায়ের করল। মহিলার অভিভাবকরা স্বামীর কাছে পাঁচশত দিনার দাবি করছে আর স্বামী তা অস্বীকার করছে। বিচারক স্বাক্ষী হাজির করার আদেশ দিলেন। স্বাক্ষী হাজির হলে তিনি বাদী মহিলার চেহারা দেখে নেয়ার আদেশ দিলেন। স্বাক্ষীদাতা মহিলাকে দাঁড়াতে বললেন।

এসব দেখে স্বামী বললেন, কী হচ্ছে এসব? আদালতের উকিল বললেন, আপনার স্ত্রীর চেহারা খুলতে হবে, যাতে সাক্ষী তাকে যথাযথভাবে চিনে সাক্ষী দিতে পারে। স্বামী বললেন, অসম্ভব তা হতে পারে না। এই বলে তিনি কাজীর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, আমি কাজীকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার স্ত্রী যে পাঁচশত দিনার দাবি করেছে আমি তা তাকে পরিশোধ করব! তবু আমার স্ত্রীর চেহারা ভিন্ন পুরুষের সামনে প্রদর্শন করতে দেব না। মজলিসের সবাই স্বামীর এই দ্বীনি মর্যাদাবোধ দেখে অভিভূত হলেন। স্ত্রীও স্বামীর এই মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার মহর মাপ করে দিলেন। বিচারক এই ঘটনাটিকে উত্তম আদর্শে অম্লান ও স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করে মজলিস শেষ করলেন।’ [আল-মুনতাজাম ফী তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম : ৬/১৮]

কিন্তু আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি? আসলে আমরা সময়ের বিচারে তাদের থেকে যত দূরে সরে গেছি আদর্শের বিচারে দূরে চলে গিয়েছি তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

স্ত্রীদেরকে যারা এভাবে পরপুরুষের সামনে পেশ করে তাদেরকে দায়ূস বলা হয়। এধরনের লোকের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ بِيَدِهِ: خَلَقَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: وَعِزَّتِي، لَا يَسْكُنُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا دَيُّوثٌ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَرَفْنَا مُدْمِنَ الْخَمْرِ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ قَالَ: «مَنْ يُقِرُّ السُّوءَ لِأَهْلِهِ»

আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস নিজ হাতে তৈরি করেছেন। আদম আলাইহিস সালামকে নিজ হাতে বানিয়েছেন। তাওরাত নিজ হাতে লিখেছেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে নিজ হাতে গাছ রোপণ করেছেন। এরপর তিনি বললেন- আমার ইজ্জতের কসম! মদপানকারী এবং দায়ূসরা জান্নাতে বসবাস করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলালাল্লাহ! দায়ূস কারা? তিনি বললেন, যারা নিজ স্ত্রীদেরকে খারাপ কাজ করার পরামর্শ দেয়।' [বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত : ৬৯২; কানযুল উম্মাল : ১৫১৩৭; আদ-দুররুল মানছূর, ইমাম সিয়ূতী রহ. : ১১/৩৭২]

অন্য বর্ণনায় দায়ুছের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে-

قيل ما الديوث يا رسول الله قال : الذى يرضى الفواحش لاهله

দায়ূস ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর অশ্লীল কাজে সন্তুষ্ট থাকে।' [তাফসীরে হাক্কী ৭/৪৫৯, রুহুল বয়ান : ৫/২৩৫]

আরেক বর্ণনায় এসেছে-

والديوث : الذى يقر السوء فى أهله

দায়ূছ ওই ব্যক্তি, যে নিজ স্ত্রীতে পাপাচার (বেপর্দা, অবাধ মেলামেশা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি) জিইয়ে রাখে।

বোন! মনে করো না মতিউররা এই দাবি জানিয়ে তোমার বিরাট উপকার করে ফেলেছে। বরং এজাতীয় কথা বলে তারা তোমার প্রতি করুণা প্রদর্শনের অন্তরালে অন্য কিছ হাসিল করতে চায়। কথাটি আল্লামা ইবন তায়মিয়া রহ.-এর ভাষাতেই ব্যক্ত করি। তিনি বলেন-

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ فِي نُفُوسِ بَنِي آدَمَ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ فَيَسْتَعْظِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَعْظَمَ مِنْ غَيْرَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَزْنِيَ فَإِذَا لَمْ يَكْرَهْ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ بَغِيًّا وَهُوَ دَيُّوثٌ كَيْفَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ زَانٍ وَلِهَذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ دَيُّوثٌ أَوْ قَوَّادٌ يَعِفُّ عَنْ الزِّنَا

'আল্লাহ তা'আলা বনী আদমকে বিশেষ আত্মমর্যাবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একারণেই পুরুষেরা নিজেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে যতটা না দোষের চোখে দেখে স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে তার চেয়ে ঢের বেশি দোষের চোখে দেখে। কিন্তু যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই এবং সে স্বীয় স্ত্রীকে অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখেও কিছু বলে না বা বলতে পছন্দ করে না তারা দায়ূছ। সে বাধা দেবে কেন? নিজেই তো ব্যভিচারি! একারণে দায়ূছরা ব্যভিচার থেকে হেফাযতে থাকে না।' [ইবন তাইমিয়া, মাজমু' ফাতাওয়া : ১৫/৩২০]

আল্লামা ইবন তাইমিয়ার কথার সারমর্ম হচ্ছে, দায়ূছরা এভাবে নিজ স্ত্রীকে অন্যের বাহুলগ্না হওয়ার সুযোগ দিয়ে নিজেরা অন্য নারীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে। আর এতে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এজন্য নির্লজ্জভাবে নিজ স্ত্রীকে ব্যবহৃত হতে দেয়!

মতিউর রহমান! সামান্য রুটি-রোজগারের বিনিময়ে অদৃশ্য চক্রের যে এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করতে যাও না কেন, একটু ভেবে দেখো অতীতের কথা, ভবিষ্যতের কথা এবং পরকালেরও কথা। বহুকালের অতীত আমাদের সামনে। এভাবে সামান্য রুটি-রোজগারের জন্য যারা স্বদেশ, মাতৃভূমি, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছিল তারা হয়ত সামান্য কয়েক গ্রাস রুটি-গোশত যোগাড় করে নিতে পেরেছিল, কিন্তু ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করেনি। যুগ পরম্পরায় মানুষ তাদের ওপর থুথু নিক্ষেপ করেছে, অভিসম্পাত দিয়েছে এবং ঘৃণার চোখে দেখে আসছে।

ইতিহাসের কালি তোমাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে, ইতিহাসের পাতার ঠিক কোন জায়গাটায় তোমার ঠিকানা হবে সেটাও ভুলে যাওয়া কিন্তু সমীচীন হবে না। আর মনে রেখো, একদিন অবশ্যই মহা প্রতাপশালী প্রভুর সামনে তোমাকে আমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। সেদিন তোমার কী জবাব থাকবে সেটা একটু ভেবে তবেই মনে চাইলে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরো। মনে রেখো, পাপ ঠিক ততটুকুই করা উচিত, যতটুকুর শাস্তি ভোগ করা সম্ভব! এর

বাইরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদেরকে সুশীল বলা যায় না। সুশীল তো সেই :

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

'সুশীল সেই, যে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে।' [তিরমিযী : ২৪৫৯; তাবরানী, মু'জামুল কাবীর : ৬৯৯৫; মুসতাদরাক আলাস-সাহীহ : ৭৬৩৯; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটিকে হাসান সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি সংকলন করেন নি। মুস্তাদরাকের তালখীসে ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]